“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

তীয় বর্ষ
সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৮০

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত টাকা।**

শৈবভারতীতে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ শ্রীকৃষ্ণনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৩৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৯০

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

শ্রীশ্রীশিবগীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শিবভক্ত্যৈশ্বর্যনিরূপণম্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এবং ভক্তিশ্চ সর্বেষাং সর্বদা সর্বতোমুখী।
তস্যাং তু বিদ্যমানায়াং যস্তু মর্ত্যো ন মুচ্যতে ॥ ২২
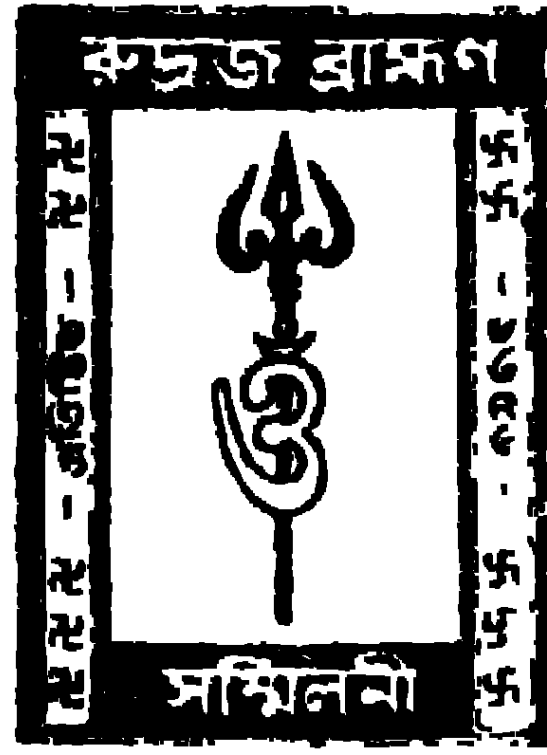
স সারবন্ধনাত্তস্মাদন্যঃ কো নাস্তি মূঢধীঃ
নিয়মাদ্‌ যস্তু কুর্বীত ভক্তিং বা দ্রোহমেব বা ॥ ২৩

তস্যাপি চেৎ প্রসন্নোঽস্মি ফলং যচ্ছামি বাঞ্ছিতম্
পত্রং কিঞ্চিৎ সমাদায় ক্ষুল্লকং জলমেব বা ॥ ২৪

যো দত্তে নিয়মেনাসৌ তস্মৈ দত্তে জগত্রয়ম্ ;
তত্রাপ্যশক্তো নিয়মান্নমস্কারং প্রদক্ষিণম্ ॥ ২৫

যঃ করোতি মহেশস্য তস্মৈ তুষ্টো ভবেচ্ছিবঃ।
প্রদক্ষিণাস্বশক্তোঽপি যঃ স্বান্তে চিন্তয়েচ্ছিবম্ ॥ ২৬

গচ্ছন্ সমুপবিষ্টো বা তস্যাভীষ্টং প্রযচ্ছতি।
চন্দনং বিল্বকাষ্ঠস্য পত্রং পুষ্পং বনোদ্ভবম্ ॥ ১৭

ফলানি বনজান্যেব যস্য প্রীতিকারীণি বৈ।
দুষ্করং তস্য সেবায়াং কিমস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ১৮

অনুবাদঃ—এইরূপ সর্বতোমুখী শিবভক্তি সকলের হৃদয়েই থাকা উচিত। এমন শিবভক্তি থাকতে যে ব্যক্তি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না তার মত মূঢ়বুদ্ধি আর কে আছে? যথাবিধানে শিবের প্রতি ভক্তিযুক্ত হলে, এমন কি তাঁর দ্রোহাচরণ করলেও দেবাদিদেব প্রসন্ন হন এবং বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে থাকেন। যে ব্যক্তি সামান্য বেলপাতা ও গণ্ডুষমাত্র জল নিয়ম মেনে মহেশ্বরকে প্রদান করে মহাদেব তাকে ত্রিভুবন দান করেন। যে ব্যক্তি বেলপাতা ও জলদানে অক্ষম, সেই ব্যক্তি যথানিয়মে মহেশকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করলেই মহেশ্বর তার প্রতি প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি প্রদক্ষিণ করতেও পারে না, সেই ব্যক্তি চলতে চলতে অথবা বসে বসে যে ভাবেই হোক শিবকে চিন্তা করলেই শিব তার অভীষ্ট পূরণ করেন। বেল-চন্দন, বেলপাতা, বনফুল, বনফল প্রভৃতিতে যিনি প্রীত হন, তাঁর সেবায় ত্রিভুবনে দুষ্কর কিছু আছে কি? ২২-২৮ ॥

[ক্রমশঃ]

অনুবাদক—সু. নাথ

সম্পাদকীয়

আজ নীলপূজা, কাল বর্ষশেষ এবং পরশু বর্ষারম্ভ। নীলপূজা অর্থাৎ নীলকণ্ঠের পূজা। মহেশ্বর শিবই নীলকণ্ঠ।

অমৃত-লাভের আশায় দেবতারা দানবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্র-মন্থন করেছিলেন। দীর্ঘ-মন্থনের পর উঠেছিল অমৃত। কিন্তু অমৃত-লাভের পরও অধিক অমৃতের আশায় অতি-মন্থন চালানো হয়েছিল। অতি-মন্থনে উঠেছিল কালকূট গরল। ফলে ত্রিলোক ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। মহেশ্বর শিব সমস্ত গরল পান করে সৃষ্টিকে করেছিলেন রক্ষা, হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ।

জগৎ-সংসারেও সারা বছর ধরে দেব ও দানব উভয় প্রকৃতির মানবেরা সংসার-সমুদ্র মন্থন করে চলেন অমৃতের আশায়। এখানেও অতি-মন্থনে অমৃতের সঙ্গে ওঠে প্রচুর হলাহল। একমাত্র নীলকণ্ঠই পারেন জগৎ-সংসারকে হলাহল-মুক্ত করে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে। তাই বর্ষশেষের আগের দিন নীলপূজার বিধান।

মানবের ভোগের স্পৃহা বেড়েই চলে। সুখ-সমৃদ্ধি রূপ অমৃতের আশায় মানব মত্ত হয়। মাত্রাতিরিক্ত মন্থনে রত সেই মত্ত-মানবের অগ্র-পশ্চাৎ ভাবার অবসর থাকে না। ফলও হয় মারাত্মক। উত্থিত হাজারো-সমস্যা রূপ কালকূটে মানবের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়।

১৩৮৯ সালেও অতি-মন্থন হয়েছে, উত্থিত হয়েছে বিষরাশি। সেই বিষরাশির প্রকোপে জগদ্বাসী মৃতপ্রায়, জগৎ ধ্বংসোন্মুখ। তাই বছরের শেষভাগে নীলপূজার মহালগ্নে আর্তের একমাত্র আর্তি জানাই —হে মহেশ্বর! হে নীলকণ্ঠ! তুমি ছাড়া গত্যন্তর নেই। তুমি বর্ষশেষে পুঞ্জীভূত বিষরাশি পান করে জগৎকে রক্ষা কর, বর্ষারম্ভে জগদ্বাসীকে দান কর নবজীবনের মহামন্ত্র।

সংশয়

শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, এ্যাড্‌ভোকেট

কবিগুরু, তব শুভ জন্মতিথি পঁচিশে বৈশাখ,
বার বার চির-নূতনেরে জানি দিয়ে গেছে ডাক ;
শুনায়েছে ধরণীরে উদাত্ত আহ্বান,
শুনায়েছে নিপীড়িতে আনন্দের গান।

আজি এল পুনঃ তব পঁচিশে বৈশাখ,
তব কণ্ঠ নাহি আজি মোরা হতবাক্ :
সবলের অত্যাচার দেখি বিশ্বময়,
তোমার কল্পনা শুধু স্বপ্ন মনে হয়।

অহিংসা-মুখোস পরি হিংসারূপী কুৎসিৎ দানবে
কুপথে ঠেলিছে আজি শান্তিকামী এ বিশ্ব মানবে .
রাজনীতি-কূটচক্র স্বার্থান্বেষী মুনাফা-শিকারী
আনদ্রোপভ-হুয়া-রেগন, নীতি মার্গারেট থ্যাচারী
বিষিয়েছে পৃথিবীরে, হিংসার অনলে
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা পুড়িছে ভূতলে।

শান্তির ললিতবাণী ব্যর্থ কি হবে কবিগুরু ?
বিশ্বজোড়া দানবের সাথে রণ কবে হবে সুরু

—(৯০)—

শৈবভারতী

শ্রীনরেশচন্দ্র নাথ, বি-কম্

রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ সভা জ্ঞান-যজ্ঞ-হোমানলজ্বালি
তোমারে করিল যবে আহ্বান, তুমি এলে
এবঙ্গভূমে—নবরূপে নবমহিমায়,
হে 'শৈব-ভারতী' !

গুণীজন লেখনীপ্রসূত শ্রুতি-স্মৃতি-দর্শনাদি
রচনাসম্ভারে নিত্য তারা করিতেছে
তোমারে আরতি ॥

জ্ঞানদাত্রী বাণীরূপা তুমি। মূলাধারে তোমার বসতি :
ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞান-পরা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-আদি
মহাশক্তি তুমি।

লজ্জা-ক্ষমা-ধৃতি-মেধা-স্মৃতি-ক্ষুধা-তৃষ্ণা খ্যাতা
নানাশক্তিরূপে আছো তুমি সর্ব্বকালে সর্ব্বঘটে
সর্ব্বব্যাপী অন্তরে-বাহিরে ॥

কৈবল্য দায়িনী তুমি। ওগো মাতঃ! ত্রিপুরা-সুন্দরি!
জ্বালো জ্ঞান-যোগ-বহ্নিশিখা অন্তরে অন্তরে,
ছিন্নকরি মোহময় অবিদ্যার আবরণ।
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ করি দেহমনপ্রাণ, জাগাও সবারে ;
জাগো তুমি মাতা কুণ্ডলিনী ॥

জ্ঞানোদ্দীপ্ত বাণীরূপা হে শৈব-ভারতী !
ছন্দের নৈবেদ্য দিলাম তোমারে প্রণতি ॥

———

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী
কী এবং কেন

ধীরেন দেবনাথ, এম. এস-সি., বি. এড্.

ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদির মতে বিশেষ কারণে ব্রহ্মা বা বিরাট পুরুষের প্রজ্জলিত ললাট থেকে রুদ্র তেজে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি। রুদ্রগণ ছিলেন শিবতুল্য ও মহাযোগী। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর ষাট কন্যার একাদশ কন্যাকে একাদশ রুদ্রকে সম্প্রদান করেন। একাদশ রুদ্র ও একাদশ রুদ্রপত্নীর মিলনে অসংখ্য শিবভক্ত ও যোগপরায়ণ রুদ্র সন্তানের জন্ম হয়। রুদ্র সন্তানগণ প্রথমে গৃহী ছিলেন এবং নামান্তে 'নাথ' পদবী ব্যবহার করতেন পরবর্তীকালে এঁদের একটি অংশ সন্ন্যাস অবলম্বন করে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণও 'নাথ' পদবী ব্যবহার করতেন। এইভাবে 'নাথ' পদবীধারিগণ দুটি বংশে—(১) বিন্দু ও (২) নাদ বংশে বিভক্ত হয়ে পড়েন। বিন্দু বংশে পিতা-পুত্র ক্রম ও নাদবংশে গুরু-শিষ্য ক্রম বজায় থাকে। যেহেতু একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার মুখমণ্ডলের সর্বোচ্চস্থান ললাট থেকে জাত সেহেতু একাদশ রুদ্র ব্রাহ্মণ। বর্তমান হিন্দু সমাজের গৃহী নাথগণ এই একাদশ রুদ্রেরই বংশধর।* তাই গৃহী নাথেরা ব্রাহ্মণ। গৃহী নাথদের আদি পিতা যেহেতু

---

* বর্তমান হিন্দু সমাজে কায়স্থ, কংসবণিক, স্বর্ণবণিক, তিলি, কর্মকার, তন্তুবায়, নমঃশূদ্র প্রভৃতি অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'নাথ' পদবী দেখা যায়। প্রথমে রুদ্রজ ব্রাহ্মন ছাড়া অন্য কোন গৃহস্থ 'নাথ' পদবী ব্যবহার করতে পারতেন না। সন্ন্যাসী নাথ গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করে সন্ন্যাসী হবার পর অবশ্য সকলেই 'নাথ' পদবী ব্যবহার করতেন। হিন্দু-গৃহস্থদের ক্ষেত্রে 'নাথ' পদবী ব্যবহারের উপরোক্ত বিধি-নিষেধ শিথিল হয়ে যায় পরবর্তীকালে। সেই সময় রুদ্রজ ব্রাহ্মন ভিন্ন অন্য অনেক হিন্দু-গৃহস্থই সন্ন্যাসী নাথ গুরুর কাছ থেকে সাধারণ দীক্ষা গ্রহণ করেই 'নাথ' পদবী ব্যবহার করেছিলেন। এই ভাবেই উপরোক্ত কায়স্থাদি জাতির মধ্যে 'নাথ' পদবী এসেছে। তাই বর্তমান হিন্দু সমাজের গৃহস্থ নাথগণের সকলেই কিন্তু রুদ্রগণের বংশধর নন; একমাত্র রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ নাথগণই একাদশ রুদ্রের বংশধর। —সম্পাদক

একাদশ রুদ্র সেহেতু তাঁরা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ। এঁদের উপাস্য দেবতা শিব তাই এঁরা শৈব। রুদ্রগণ ছিলেন যোগী তাই বংশ পরম্পরায় গৃহী নাথেরাও যোগী। গৃহী নাথেরা অংশু শৈব ব্রাহ্মণ বা যোগী-ব্রাহ্মণ রূপেও সুপরিচিত।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ নাথদের ইতিহাস ছিল গৌরবোজ্জ্বল। বঙ্গাধিপতি স্বেচ্ছাচারী বল্লাল সেন কর্তৃক নাথেরা পতিত হবার পর প্রায় সাড়ে সাতশ' বছর কেটে যায়। এই সাড়ে সাতশ' বছর নাথদের ইতিহাসের এক 'অন্ধকার যুগ'। এই অন্ধকার যুগে নাথদের অধিকাংশই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকার হারিয়ে একটা আত্মবিস্মৃত শ্রেণীতে পরিণত হন। জনমানস থেকে এঁদের গৌরবময় ইতিহাস মুছে যেতে থাকে এবং সমাজে এঁরা নিম্নবর্ণের জীবিকা গ্রহণের জন্য হয়ে পড়েন অবহেলিত, অপাংক্তেয়। নাথদের একটা ক্ষুদ্র অংশ আত্মগোপন পূবক নিজেদের সমস্ত সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য অধিকার রক্ষা করে বেঁচে থাকেন।

অন্ধকার যুগের শেষ দিকে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় আসাম-বঙ্গের নাথদের মধ্যে পুনর্জাগরণের আন্দোলন শুরু হয়। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ ৺ভরতচন্দ্র শিরোমনি ভট্টাচার্য মহোদয় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র সর্বপ্রথম নাথদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলে ঐ আন্দোলন দুর্বার রূপ পরিগ্রহ করে। বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত ও জমিদারগণও নাথদেরকে বর্ণ শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন। প্রায়শ্চিত্ত পূর্বক ব্রাত্য নাথদের অনেকে উপনয়ন সংস্কারও গ্রহণ করতে থাকেন। নাথদের খবরাখবর প্রচারের নিমিত্ত নাথবন্ধু অরবিন্দ বন্ধু নাথ মহাশয় ১৩১১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে প্রকাশ করেন—'যোগিসখা' পত্রিকা। এরপর ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৬ই কার্তিক মহর্ষি রাধাগোবিন্দ নাথ, এম. এ., বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় আসাম-বঙ্গের নাথদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন— "আসাম-বঙ্গ যোগি সম্মিলনী"। সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ও সখার প্রকাশক সম্মিলনী ও সখার নামকরণ সর্বকালের জন্য করলেও কালের পরিবর্তনে ও অর্থগত দিক থেকে তা' অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ, আজ সেই আসামও নেই আর বঙ্গও নেই। তা'ছাড়া যোগি সম্মিলনী বলতে তো বিভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতি থেকে আগত যোগিদের সম্মিলনীকেই বোঝায়। যোগিসখার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা.

প্রযোজ্য। এই নামকরণে রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ নাথদের স্বকীয়তা বা নিজস্বতা বজায় থাকে কোথায় ? যাই হোক, রাধাগোবিন্দ বাবু ও অরবিন্দ বাবুর উদ্দেশ্য যে সাধু ছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে আসাম ও বঙ্গীয় সরকার নাথদের যথাক্রমে হিন্দু বহির্ভূত জাতি ও অনুন্নত শ্রেণী বলে ঘোষণা করলে পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সহায়তা ও সহযোগিতায় নাথেরা সম্মিলিতভাবে উভয় সরকারের ঘোষণার বিরুদ্ধে এক দুর্নিবার আন্দোলন শুরু করলে উভয় সরকারই স্ব স্ব ঘোষণা বাতিল করে নাথদেরকে বর্ণহিন্দুর মর্যাদা দিতে বাধ্য হন। আজ পর্যন্ত ঐ মর্যাদাই বজায় আছে। পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের তিরোধানের পরে যাঁরা সম্মিলনীর কর্ণধার হন তাঁদের অনেকেই কিন্তু সম্মিলনীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে পড়েন এবং সম্মিলনীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কেও ভুল ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। নাথদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উন্নতি বিধানের নিমিত্ত নেতৃবৃন্দ যে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ ও ব্রাহ্মণ পরিচিতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এই সব নেতৃবৃন্দ সেগুলিকে গৌণ মনে করে যোগি পরিচিতিকেই প্রাধান্য দিতে প্রয়াসী হন। এঁদের কেউ কেউ আবার নাথেরা জাতিতে যে ব্রাহ্মণ তা' মানতেই রাজী ছিলেন না। নেতৃবৃন্দের এইরূপ অযৌক্তিক মনোভাবের বিরোধিতার জন্যই শ্রীমুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ১৩৫৬ সালের কার্তিক মাসে সমমনোভাবাপন্ন কিছু সমর্থককে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে—'পশ্চিম-বঙ্গ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী'। যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, নাথদের ব্রাহ্মণ পরিচয়ে পরিচিত করানো। মুক্তারাম বাবুদের বক্তব্য ছিল—নাথেরা যদি ব্রাহ্মণই না হবেন তা' হলে পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কেন উপনয়ন সংস্কারের উপর জোর দিয়েছিলেন ? নাথেরা যদি ব্রাহ্মণই না হবেন তাহলে উপনয়ন, পৌরোহিত্য, দশাশৌচ, সামবেদ, অন্নভোগ, পাচিত অন্নপিণ্ডের অধিকার থাকে কী করে ? ব্রাহ্মণের অধিকারগুলি পালন করব অথচ নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় না দিয়ে যোগী বলে পরিচয় দেব, এটা কী ধরনের যুক্তি ? যোগী হতে হলেও যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। কিন্তু নাথদের ক'জন যোগাভ্যাস করছেন ? শুধু যোগপরায়ণ আদি পিতৃ-পুরুষদের নাম ভাঙিয়ে খাওয়ার প্রচেষ্টা এই যা। আর যোগীতো কোন জাতীয় পরিচয় হতে পারে না। হিন্দুরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,

সঙ্কর এবং অন্ত্যজ-সঙ্কর জাতিতে বিভক্ত। নাথ বা যোগিকে জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলে সেই জাতি বেদ বহির্ভূত আধুনিক জাতি বলে পরিগণিত হতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গৃহী নাথেরা তা নয়। তাঁরা যে জন্মগত ভাবেই ব্রাহ্মণজাতি তা' শাস্ত্র স্বীকৃত ও প্রমাণিত সত্য।

পশ্চিমবঙ্গ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী গঠিত হবার পর আসাম-বঙ্গ যোগি সম্মিলনীর অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ একে ভাল চোখে তো দেখেনই নি বরং বিভিন্নভাবে এর উদ্দেশ্য ও আদর্শের বিরোধিতা করতঃ সমালোচনায় মুখর হন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আসাম-বঙ্গ যোগি সম্মিলনীর ৪৯তম বার্ষিক অধিবেশনের সম্মিলনী সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ নাথ মহাশয় সম্পাদকীয় বিবরণে পশ্চিম-বঙ্গ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সৃষ্টিকে তো 'সংস্থা' বলেই অভিহিত করেন। প্রমথ বাবুদের বক্তব্য ছিল—নাথেরা জাতিতে যোগি এবং সমাজে নাথেরা যোগি নামেই পরিচিত হবেন, অন্য কোন পরিচয় নয়। অন্য কোন পরিচয়ে (ব্রাহ্মণ) পরিচিতি লাভ করলে সমাজে নাথ বা যোগিদের নাকি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং জাতির প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বিপদ ও অকল্যাণ দেখা দেবে। এঁদের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, নাথেরা জাতিতে যোগী কিন্তু ব্রাহ্মণ নন। ব্রাহ্মণ বলতে এঁরা অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরই বুঝে থাকেন। যুক্তি মন্দ নয়। তাইতো এখনো 'যোগিসম্প্রদায়' নাথ জাতি/যোগী জাতির সংজ্ঞা দেখি। অর্থাৎ আসাম-বঙ্গ যোগি সম্মিলনীর বর্তমান নেতৃবৃন্দ পূর্বসূরীদের মত নাথদের বেদ বহির্ভূত আধুনিক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। এটা সমগ্র নাথদের কাছে কষ্ট ও অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিমবঙ্গ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সমর্থকরা আসাম-বঙ্গ যোগি সম্মিলনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করেও যোগি সম্মিলনীর ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতঃ ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু পরস্পর বিরোধী মনোভাব থেকেই যায়।

সম্মিলনীর নেতৃবৃন্দের পরস্পর বিরোধী মনোভাব চরমরূপ পরিগ্রহ করে তখন, যখন নেতৃবৃন্দের একটা অংশ নাথদেরকে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্তির জন্য চাপ দেন। অন্য অংশ নাথদেরকে চরম অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং এতদিনের সঞ্চিত গৌরব অম্লান রাখার নিমিত্ত এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। অনেক আলাপ আলোচনা হয় কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হয় না। কোন পক্ষই

নিজ নিজ মনোভাব পরিবর্তনে রাজী নন। পরে ভোটাভুটিতে উভয় পক্ষেই সমান সমান ভোট পড়ে। সম্মিলনীর সভাপতি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতির উপর ভিত্তি করে ভোটদানে বিরত থেকে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্তির সমর্থকদেরই পরোক্ষভাবে সমর্থন করেন। (সভাপতি মহাশয়ের অনগ্রসর শ্রেণীভুক্তিতে যে পরোক্ষ সমর্থন আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হ'ল, পান্থহাটে আসাম-বঙ্গযোগি সম্মিলনীর ৭২তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে অধিবেশন সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ সমর্থন এবং স্মারক-পুস্তিকা ও যোগি সখায় তা' প্রকাশ করা।) এরফলে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্তির বিরুদ্ধ বাদীরা আসাম-বঙ্গের স্বর্গীয় নেতৃবৃন্দের পবিত্র আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য ও আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের নিমিত্ত রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের একটি মঞ্চে সম্মিলিত করার উদ্দেশ্যে শ্রীমুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্যকে সভাপতি করে লুপ্ত প্রায় পশ্চিমবঙ্গ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীকে পুনর্জীবিত করে প্রতিষ্ঠা করেন—'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী'। এই সংগঠন কারো মনগড়া বা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংগঠন নয়। এ সংগঠনের সৃষ্টি অন্য কোন সংগঠনের বিরোধিতা করার জন্যও নয়। সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কারণে, মতাদর্শের পার্থক্য হেতু, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উন্নতি বিধানের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং এঁদের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেই প্রতিষ্ঠা করা হয় এ সম্মিলনী। রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, গৃহী নাথদের পূর্বপুরুষগণ যে যোগমার্গের সাধক যোগী ছিলেন তা' অস্বীকার না করেও গৃহী নাথদের জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে পরিচিত করানো (জাতিগত পরিচয় নাথ বা যোগী নয়), ব্যাপকভাবে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে তাঁদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা, তাদের সম্পর্কে কুৎসা রটনার প্রতিবাদ করা, গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দান করা, সেবামূলক কাজের মাধ্যমে সমাজ তথা দেশ-সেবায় ব্রতী হওয়া, সম্মিলনীর মুখপত্র 'শৈবভারতী'-তে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলীসহ সমাজ সংস্কার মূলক রচনা এবং প্রতিভাবান কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের লেখা প্রকাশ করে বিশ্বদরবারে নাথদের মুখ উজ্জ্বল করা ইত্যাদি। রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর স্বপ্ন-দ্রষ্টা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের চির কালের বন্ধু, অশীতিপর সুপণ্ডিত শ্রী মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর পূর্বের এক অমৃতক্ষণে নাথদের গৌরব রক্ষার্থে

পঙ্কিল সমাজের মাটিতে সম্মিলনীর যে বীজটি বপন করেছিলেন তা' একদিন মহীরুহ রূপ পরিগ্রহ করে ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে সুরভিত ও সৌন্দর্য-মণ্ডিত করে তুলবে, সন্দেহ নেই। তাই রুদ্রজ ব্রাহ্মণ ভাইবোনদের কাছে আবেদন,—আসুন, সকল বিভেদ-সংকীর্ণতাকে ভুলে গিয়ে উঁচু শিরে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর পতাকাতলে সম্মিলিত হই। পরমপিতা দেবাদিদেব মহাদেব নিশ্চয়ই আমাদের পথ চলার শক্তি যোগাবেন: আমাদের মাথায় বর্ষণ করবেন শুভাশীবাদের বৃষ্টি ধারা।

—॰ × ॰—

সনাতন-হিন্দুধর্ম

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পৌরাণিক মহেশ্বরকে শিব ও রুদ্র নামেও অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু যেদিক থেকে রুদ্র ও শিব অভিন্ন সেদিক থেকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সাথেও শিব অভিন্ন-সত্তা। অবশ্য বিষ্ণু ও শিব যে প্রায় অভিন্ন তা প্রকারান্তরে স্বীকারও করা হয়েছে—বিষ্ণু ও শিবের অতি নিকট সম্পর্ক বোঝাতে বলা হয়েছে 'হরিহরআত্মা'।

এবারে শিবের সাথে বিষ্ণু ও রুদ্রের কোথায় পার্থক্য এবং কোথায় এঁরা অভিন্ন তা প্রদর্শনের চেষ্টা করি।

বেদের জ্ঞানকাণ্ডে পরব্রহ্মকে অব্যক্ত নির্বিকল্প স্বয়ম্ভূ বলা হয়েছে। এই পরব্রহ্মই আদি অবস্থা। এই আদি অবস্থা পরব্রহ্ম থেকেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর সৃষ্টি। আবার শিবের ধ্যান মন্ত্রে বলা হয়েছে—"বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং" অর্থাৎ শিব হচ্ছেন বিশ্বের আদি, বিশ্বের বীজ। এ দুটোকে মেলালে এসে যায়,—পরব্রহ্মই শিব। 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদে সৃষ্টির প্রাক্কালে বর্তমান অব্যক্ত নির্বিকল্প পরব্রহ্মকেই স্পষ্টভাবে 'শিব' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,—

"যদাহতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ ন সন্ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥"

অর্থাৎ, (সৃষ্টির প্রাক্কালে) যে সময়ে অজ্ঞান ও অবিদ্যা ছিল না, সে সময় দিনও ছিল না রাত্রিও ছিল না, সৎও ছিল না অসৎও ছিল না; তখন কেবল মাত্র শিবই বর্তমান ছিলেন। তিনিই অক্ষর-পুরুষ, তিনিই আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষেরও (অর্থাৎ বিষ্ণুরও) আরাধ্য; তাঁর থেকেই সেই প্রাচীন প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছে।

কাজেই পরব্রহ্ম বা ব্রহ্মের যে অব্যক্ত নির্বিকল্প-স্বয়ম্ভূসত্তা তাই শিব নামে অভিহিত।

এই পরব্রহ্ম বা শিব হচ্ছেন অব্যক্ত-নিষ্ক্রিয়-সত্তা, আপনাতে আপনি সমাহিত। সমাধি ভগ্ন হলে শিব চৈতন্যস্বরূপ হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর মধ্যে কামনা জাগ্রত হয়। কামনা জাগ্রত হলে, সেই কামনা অনুযায়ী ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য শিব থেকে শক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং সেই শক্তির ক্রিয়াশীলতায় শিবের কামনা সকল পূর্ণ হয়। শিবের মধ্যে তিনপ্রকার কামনা ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হয়—(১) বহুহবার, উৎপন্ন হবার, (২) উৎপন্ন বহু যাতে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে স্থিতিশীল থাকে তার ব্যবস্থা করার এবং (৩) স্থিতিশীল বহু যাতে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তাদের বহুত্ব ঘুচিয়ে পরম একে লয়প্রাপ্ত হয় তার ব্যবস্থা করার। শিব থেকে উৎপন্ন শক্তি তিনপ্রকার ক্রিয়ার দ্বারা শিবে জাগ্রত কামনাত্রয়ের পূরণ করেন। শিবের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কামনা জাগ্রত হয়; আর শিব থেকে উৎপন্ন শক্তি ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করার মধ্য দিয়ে শিব সেবা করে থাকেন। বহু-সৃষ্টির ভাবে ভাবিত শিব হচ্ছেন ব্রহ্মা; আর সৃষ্টি-ক্রিয়া-রতা শক্তি হচ্ছেন সরস্বতী। উৎপন্ন বহুকে স্থিতিশীল রাখার ভাবে ভাবিত শিব হচ্ছেন বিষ্ণু; আর পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান পূর্বক উৎপন্ন বহুকে স্থিতিশীল রাখার ক্রিয়ায় নিরতা শক্তি হচ্ছেন লক্ষ্মী। বহুকে ধ্বংস করে পরম একে বিলীন করার ভাবে ভাবিত শিব হচ্ছেন রুদ্র; আর বহুকে ধ্বংস করে পরম একে বিলীন করার ক্রিয়ায় নিরতা শক্তি হচ্ছেন রুদ্রাণী।

একই পরব্রহ্ম বা শিব যখন সৃষ্টির ভাবে ভাবিত তখন তিনি ব্রহ্মা, যখন স্থিতির ভাবে ভাবিত তখন তিনি বিষ্ণু এবং যখন ধ্বংসের ভাবে ভাবিত তখন তিনি রুদ্র। একই শক্তি যখন সৃষ্টি-ক্রিয়ায় রতা তখন

তিনি সরস্বতী, যখন পালন-ক্রিয়ায় তখন তিনি লক্ষ্মী এবং যখন ধ্বংস-ক্রিয়ায় নিরতা তখন তিনি রুদ্রাণী।

পৌরাণিক-যুগে শিবের উপাসনাকে কেন্দ্র করে শৈব-শাখার, শক্তির উপাসনাকে কেন্দ্র করে শাক্ত-শাখার এবং বিষ্ণুর উপাসনাকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব-শাখার উদ্ভব হ'ল।[১] এই যুগেই গণপতি প্রভৃতি আরো কয়েকজন দেবতার উপাসনাকে কেন্দ্র করে আরো কয়েকটি শাখার উদ্ভব হলেও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিনটি শাখাই ছিল প্রধান।

পৌরাণিক-যুগে প্রথমে শৈব-ধর্মের আবির্ভাব ঘটলো। এই ধর্মে সাধারণ গৃহস্থদের জন্য শিব-পূজা, সাধক-গৃহস্থদের জন্য শিব-পূজা ও শৈব-যোগ-সাধনা এবং সন্ন্যাসীদের জন্য শৈব-যোগ-সাধনার ব্যবস্থা হ'ল। সাধারণ গৃহস্থগণ কর্মকে প্রাধান্য দিলেন, সাধক-গৃহস্থগণ কর্ম ও জ্ঞান উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিলেন এবং সন্ন্যাসিগণ প্রাধান্য দিলেন জ্ঞানকে।

শৈব-ধর্মের শৈব-সাধনার সূত্র ধরেই শক্তি-সাধনার সৃষ্টি হ'ল। এই শক্তি-সাধনাকে অবলম্বন করে শাক্ত-ধর্মের আবির্ভাব ঘটলো। এই শাক্ত-ধর্মেও শৈব-ধর্মের মতোই সাধারণ-গৃহস্থদের জন্য শক্তি-পূজা সাধক-গৃহস্থদের জন্য শক্তি-পূজা ও যোগমূলক-তন্ত্র সাধনা এবং সন্ন্যাসীদের জন্য যোগমূলক-তন্ত্র সাধনার ব্যবস্থা হ'ল। এই ধর্মেও সাধারণ-গৃহস্থগণ কর্মকে প্রাধান্য দিলেন, সাধক-গৃহস্থগণ কর্ম ও জ্ঞান উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিলেন এবং সন্ন্যাসীগণ প্রাধান্য দিলেন জ্ঞানকে।

কালক্রমে বৈষ্ণব-ধর্মের আবির্ভাব ঘটলো। এই বৈষ্ণব-ধর্মেও শৈব ও শাক্ত ধর্মের মতোই সাধারণ-গৃহস্থদের জন্য বিষ্ণু-পূজা, সাধক-

১। পৌরাণিক-যুগের শৈব ও শাক্ত ধর্মকে প্রাক-বৈদিক-যুগের শৈব ও শাক্ত ধর্মের নবায়ন বলা যেতে পারে।

গৃহস্থদের জন্য বিষ্ণু-পূজা ও যোগমূলক-বৈষ্ণব সাধনা এবং সন্ন্যাসীদের জন্য যোগমূলক-বৈষ্ণবসাধনার ব্যবস্থা হ'ল। এখানেও সাধারণ-গৃহস্থগণ কর্মকে প্রাধান্য দিলেন, সাধক-গৃহস্থগণ কর্ম ও জ্ঞান উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিলেন এবং সন্ন্যাসীগণ প্রাধান্য দিলেন জ্ঞানকে।

পৌরাণিক-যুগের হিন্দুধর্মের সকল শাখাতেই সাধারণ গৃহস্থদের ক্ষেত্রে ভোগের সাথে সাথে পূজা উপলক্ষে দান-দক্ষিণার মধ্য দিয়ে সাময়িক ত্যাগ, সাধক-গৃহস্থদের ক্ষেত্রে ত্যাগের সাথে ভোগ এবং সন্ন্যাসী-সাধকদের ক্ষেত্রে সার্বিক-ত্যাগ ধর্ম সাধনার ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পৌরাণিক-যুগে-সৃষ্ট-পূজাপদ্ধতির মধ্যে বৈদিক-যুগের ঋষি-ধারার যজ্ঞ এবং মুনিধারার যোগ উভয়কেই স্থান দিয়ে দুটি ধারার সমন্বয় সাধন করা হ'ল।

পূজা করতে গিয়ে পূজাঙ্গ-হোম করতে হয়। এই হোম বৈদিক-যুগের ঋষি-ধারার যজ্ঞের রূপান্তর মাত্র। আবার পূজাকার্যে নিযুক্ত পুরোহিতকে মূল-পূজার আগে প্রাণায়াম প্রভৃতি করতে হয়, মূল-পূজার প্রারম্ভে ধ্যান, মানসপূজা ইত্যাদি করতে হয়। প্রাণায়াম, ধ্যান, মানসপূজা ইত্যাদি বৈদিক-যুগের মুনিধারার যোগের রূপান্তর মাত্র।

পৌরাণিক-যুগের শেষের দিকে বিভিন্ন শাখা ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হ'ল। হিন্দু-ধর্মের প্রত্যেকটি শাখায় অপর শাখাগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা ঘোষিত হ'ল। বিশেষত সাধারণ গৃহস্থদের জন্য পূজা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে কার্যকর হ'ল। যেমন শৈব-শাখার শিব-পূজার, শাক্ত-শাখার শক্তি-পূজা, বৈষ্ণব-শাখার বিষ্ণুপূজা প্রভৃতি সকল শাখার সকল পূজার ক্ষেত্রেই আগে গণেশ, শিব, দুর্গা, সূর্য ও বিষ্ণু এই প্রধান পঞ্চদেবতা এবং সকল দেবীর পূজা অবশ্য কর্তব্য বলে বলা হ'ল। বিভিন্ন শাখাধর্মের মধ্যে সমন্বয়-প্রয়াসের

ফলে সকল-শাখাতেই কর্ম ও জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে অন্য শাখাগুলোর পদ্ধতি অল্পবিস্তর গ্রহণ করা হ'ল।

কাজেই, পৌরাণিক-যুগের হিন্দু-ধর্ম-সাধনার ভিত্তি সম্পর্কে বলতে হয়—এই যুগেব ধর্ম-সাধনাও ছিল ত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ-গৃহস্থদের জন্য ভোগের সাথে সাময়িক ত্যাগ, সাধক-গৃহস্থদের জন্য ত্যাগের সাথে ভোগ এবং সন্ন্যাসী-সাধকদের জন্য সার্বিক-ত্যাগ এই যুগের সাধনার জন্যও নির্দেশিত ছিল। [ক্রমশঃ]

ঈশ্বর ভাবনা ও মানব সেবা

ডাঃ ভবনাথ সরকার, বি. এ. (অনার্স) বি. টি, ডি. এম. এস

ন্যায় শাস্ত্রে বলা হয় মানুষ বুদ্ধি সম্পন্ন পশু। মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে মানুষ চিন্তা করতে পারে, অন্যেরা পারে না। অন্য প্রাণীরা চলে আবেগের দ্বারা আর মানুষ কাজ করে বুদ্ধির দ্বারা। এই উন্নত বুদ্ধির দ্বারাই সে প্রাণীজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। ঈশ্বর ভাবনা ও সেই উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের চিন্তার ফল। আদিম যুগে মানুষ আত্মরক্ষার তাগিতে অন্য কোন চিন্তা করবার সময় পেত না। কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে জনবল ও হাতিয়ারের উৎকর্ষের ফলে মানুষ যখন জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বনির্ভর ও নিশ্চিন্ত হ'ল, তখন সে জগৎ ও জীবনের, সৃষ্টির ও স্রষ্টার রহস্য অনুধাবনে নিরত হ'ল। প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ধর্মগুরুগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন। ভারতবর্ষেও প্রাচীন যুগ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। বৈদিক যুগে ঋষিগণ যদিও ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, উষা প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেছেন তবুও তাঁরা জানতেন যে বিশ্ব একটি মাত্র নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাকে পুরুষ, আত্মা এবং সৎ বলা হযেছে।

ঈশ্বর চিন্তার প্রকৃষ্ট রূপ লাভ করেছে উপনিষদের যুগে। নানা উপনিষদে ঋষিরা ঈশ্বর বা স্রষ্টাকে আত্মা বা ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেছেন। এঁদের মতে বিশ্ব সৃষ্টি এবং ব্রহ্ম স্রষ্টা। উভয়ের মধ্যে উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সত্য, তপস্যা, সম্যক্‌জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়। সেই জ্যোতির্ময় নিরঞ্জন পরমেশ্বর অন্তঃশরীরে বিরাজ করছেন। নিষ্পাপ যোগিগণ তাকে দর্শন করে থাকেন। (মুণ্ডক)। এই চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা সর্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থান করছেন। মানুষ তাঁকে জেনে মৃত্যুমুখ থেকে প্রমুক্ত হয়। (কঠ)। সুতরাং জ্ঞানী বলেন, 'এই জগতে পঞ্চভূতাত্মক যা কিছু

রয়েছে, সবই ঈশ্বর বুদ্ধির দ্বারা আচ্ছাদন করতে হবে; বিষয় ত্যাগের দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতে হবে; কারো ধনে লোভ করবে না।' (ঈশ)।

এই উপনিষদের যুগটাকে প্রধানত জ্ঞানমার্গের যুগ বলা যেতে পারে। তবে এই যুগের উপনিষদ সমূহের মধ্যে সংহিতা-যুগের ভক্তিমার্গও অনেকক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে।

দর্শনের যুগে এই ব্রহ্মকে লাভ করবার মার্গ বা পথ হিসেবে জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গ উভয়কেই নির্দেশ করা হয়েছে। মানুষের ধারণা হয়েছে মানুষ নিজকর্মফলেই পৃথিবীতে সুখ বা দুঃখ লাভ করে। দুঃখ তিন প্রকার—আধি ভৌতিক, আধি দৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। দেহধারী মাত্রেরই এই ত্রিভাগ জ্বালা ভোগ করতে হবে। এই জ্বালা থেকে মুক্তিলাভের উপায় হচ্ছে ঈশ্বরকে জানা। এই চিন্তার ফলেই বিভিন্ন দর্শনের উদ্ভব হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ। জ্ঞানবাদের মূল প্রবক্তা আচার্য শঙ্কর। তাঁর জ্ঞানবাদ মায়াবাদ নামেও প্রসিদ্ধ। তাঁর মতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম নির্বিশেষ নির্গুণ, চিন্মাত্র। মায়াদ্বারা উপহিত হলে ব্রহ্ম ঈশ্বর হন এবং জগতের সৃষ্টি পালন ও সংহার করেন। মায়া উপহিত ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। কিন্তু এই মায়া বা তার কার্য—এই জগৎ সত্য নয় এক ব্রহ্মই সত্য। জীব ও ব্রহ্ম এক। জীব অজ্ঞানের জন্য নিজেকে পৃথক সত্তা মনে করে। জীবের অজ্ঞান দূর হলে জীবই ব্রহ্ম হবে। শংকরের এই মতকে অদ্বৈতবাদ বলে। মোক্ষলাভই এখানে কাম্য।

আচার্য রামানুজ বলেন—ব্রহ্ম নির্গুণ বা নির্বিশেষ নন। তিনি অশেষ কল্যাণ গুণের আধার। ঈশ্বর ব্রহ্ম, ব্রহ্মই ঈশ্বর। জগৎ মিথ্যা নয় পরিবর্তনশীল ও নশ্বর। ব্রহ্ম সর্বভূতে সর্বজীবে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান। জ্ঞানাত্মক ভক্তিদ্বারা আমরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারি। এই মতকে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বলে।

বল্লভাচার্যের মতে—জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ আবার ব্রহ্মের সঙ্গে ইহাদের অভেদ সম্পর্ক রয়েছে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। জড় জগৎ ও জীব তাঁহারই অংশ।

উল্লিখিত ভাষ্যকারদের মতগুলি মোটামুটি এক পর্যায়ের, এরা অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আচার্য নিম্বার্ক ও মধ্বাচার্য্যের মতবাদ দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আচার্য নিম্বার্কের মতে জীব ও জগৎ মিথ্যা ও মায়া নয়। ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। জীব ব্রহ্মের অংশ। জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক ভেদেরও বটে অভেদেরও বটে। মুক্ত জীবের সাথে ব্রহ্মের ভেদ সম্পর্ক থাকে আবার জীব ব্রহ্ম থেকে নিজের স্বাতন্ত্র রাখতে অক্ষম সেজন্য ব্রহ্মের সাথে জীবের অভিন্ন সম্পর্ক।

মধ্বাচার্যের মতে ব্রহ্ম ঈশ্বর ও বিষ্ণু একই—তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। তিনি জগৎ স্রষ্টা। তিনি কর্তা, জগৎকার্য। তিনি সগুণ। তিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কারণ। তিনি জ্ঞান-অজ্ঞান বন্ধন মুক্তিরও কারণ, কিন্তু সর্ব স্বতন্ত্র। জীব ব্রহ্ম নয় এবং মুক্তিতে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় না তাহার ভিন্ন সত্তা থাকে। ভক্তির দ্বারাই আমরা ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণুকে লাভ করতে পারি।

যোগদর্শনে পুরুষরূপী ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে। ইনিই অনাদিকাল সিদ্ধ গুরু ও উপদেষ্টা। ঈশ্বর প্রনিধান যোগ দর্শনের প্রধান উপায়। পতঞ্জলি এই দর্শনের প্রবর্তক।

চৈতন্যদেবের মতে জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ ও অংশীবলের পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধ হচ্ছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। এই কারণে যথাবিহিত পন্থায় প্রিয়রূপে তাঁর উপাসনা করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে। মোক্ষলাভ এদের কাছে তুচ্ছ। কৃষ্ণ সুখ বাসনা অর্থাৎ ভক্তিই এঁদের কাম্য।

ঈশ্বর : পরম : কৃষ্ণ : সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ :

অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্

এই গোবিন্দ (ব্রহ্ম) ই পুরুষোত্তম। তিনি সেব্য ও ভোক্তা। সর্বজগৎ সকলেই তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির রাধিকার রূপ ভেদ এবং সেবিকা ও নারী। গোবিন্দকে দাসরূপে, সন্তানরূপে, সখারূপে ভজনা করা যায়। কিন্তু স্বামীরূপে ভজনাই শ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ নয়। জীব ভক্তরূপে পরমাত্মা ঈশ্বরকে সেবা করাই কর্তব্য।

সমস্ত উপনিষদের সার নিয়ে গঠিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা। এতে ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মুখ নিসৃত বাণীই গীতা। শ্রোতা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। গীতায় শ্রীভগবান নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ স্থাপন করেছেন।

কিন্তু সাংসারিক মানুষের পক্ষে এই নিষ্ক্রিয় ভগবানকে ডাকা কতটুকু সার্থক ? যারা সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, যোগী, ঋষি তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলেও মানুষের পৃথিবীতে থাকতে গেলে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে গেলে এমন ঈশ্বর চাই যাঁর কাছে আমরা পাব ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অর্থাৎ যাকে ভজনা করলে যেমন পার্থিব সম্পদ লাভ হবে তেমনি পাওয়া যাবে মোক্ষ। তাই তন্ত্রযুগে ইহলোক এবং পরলোকের সুখপ্রদায়িনীরূপে কল্পিত হয়েছেন 'মহাশক্তি'। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম শিবের ইনি হচ্ছেন শক্তি। ইনি ব্রহ্মময়ী হলেও ইনি 'ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী'। এঁর কাছে ভক্ত কেবল রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি : বলে প্রার্থনা করেন না। একটি মনোবৃত অনুকারিণী মনোরমা ভার্যা চাইতেও দ্বিধা করেন না। তন্ত্রে আছে জীবন ও মুক্তির সমন্বয়। যে ভোগবৃত্তি মানুষের জীবনকে চঞ্চল করে তাকে শুদ্ধে পরিণত করাই শক্তি সাধনার প্রথম স্তর। মহাশক্তিকে আকর্ষণ করে জীবনের বৃত্তিগুলিকে সজীব ও সুতীক্ষ্ণ করা ও তাদের পূর্ণ বিকাশ করাই তন্ত্রের লক্ষ্য।

এইবার ইসলাম ধর্মের কথা আলোচনা করা যাক। কোরাণের মূলসূত্রই হচ্ছে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় এবং হজরত মহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ বা পয়গম্বর। ঈশ্বর মহা ঐশ্চর্যময়, বিরাট ক্ষমতাশালী। তাঁর প্রতি অনুগত থেকে তাঁর (কোরাণের) নির্দেশিত বিধি নিষেধ মেনে চললেই তারা নিষ্পাপ তথা অনুগত ও কর্তব্যনিষ্ঠ বলে পুরস্কার লাভ করে। শেষ বিচারের দিনে সে বেহেস্তে (স্বর্গে) গমন করে। ইসলাম দ্বৈতবাদী। সৃষ্টি ও স্রষ্টার সত্তায় পৃথক।

খ্রীষ্টান ধর্মে ঈশ্বর স্রষ্টা। তার ইচ্ছাতেই জীব ও জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। যীশু তার সন্তান। "ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন যেন, যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়। কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। মানুষ সর্বদাই শয়তান দ্বারা প্রলুব্ধ হ'য়ে পাপ করছে। অনুতপ্ত হয়ে যীশুর কাছে ক্ষমা চাইলেই তিনি মানুষকে ক্ষমা করবেন। তিনিই মানবের বন্ধু ও মুক্তিদাতা। বিশ্ব স্রষ্টা ঈশ্বর আমাদের পিতা। তিনি অণোর্গরিয়ান, মহতোমহীয়ান। পবিত্র, প্রতাপবান সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বদা আমাদের কৃপা করেন। তাঁকে সম্মান দিলেই আমরাও সম্মানিত। স্বর্গেও যেমন মর্তেও তেমন তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

যে ধর্মে ঈশ্বরের কথা অস্বীকার করা হয়েছে বা যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা হয়েছে তাদের মধ্যে সাংখ্যদর্শনের নামই উল্লেখযোগ্য।[১] এই দর্শনের লক্ষ্য ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ। এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ হলেই মুক্তি, বিবেকজ্ঞানের সাহায্যে এই মুক্তি ঘটে। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়নি। সাংখ্যের সর্বপ্রধান প্রকৃতিও পুরুষ।

জৈনধর্মমতে ঈশ্বর আছেন তবে তিনি নিষ্ক্রিয়। তাঁর সাথে মানুষের কোন সম্বন্ধ নেই। মানুষের স্তুতিবাদে তিনি সন্তুষ্ট হননা বা নিন্দাবাদেও অসন্তুষ্ট হননা। সুতরাং তাঁকে উপাসনা করা বৃথা। তিনি জগৎ বা জীবকে সৃষ্টি করেন নি। তিনিও অনাদি জগৎও অনাদি। এই জগৎ ব্যতীত আর একটি অনাদি আছে তাহা কর্ম। কর্মফলে মানুষ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। কর্মই মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের কারণ। সুতরাং কর্ম হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে মানুষের নির্বাণ বা মোক্ষলাভ হয়না। অতএব সৎকর্ম কর, সর্বজীবে দয়া কর, কাহাকে পীড়া দিও না। মুক্তির জন্য ভগবান তীর্থংকরের নিকট প্রার্থনা কর এবং তাদের পূজা কর।　　[ক্রমশঃ]

১. সাংখ্যদর্শনকে সাধারণত নাস্তিক্যবাদী দর্শন বলা হয়ে থাকে। কারণ, এই দর্শনের এক স্থানে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমানের অভাবের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই দর্শনেই আবার সর্বপ্রধান হিসেবে 'পুরুষ ও প্রকৃতি'র কথা স্বীকার করা হয়েছে। সাংখ্যের 'পুরুষ ও প্রকৃতি' শৈব ও শাক্ত দর্শনের 'শিব ও শক্তি'র সাথে প্রায় অভিন্ন। অদ্বৈতবাদে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ যে, মায়া-উপহিত-ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে, তাঁর সাথে সাংখ্যের 'পুরুষ ও প্রকৃতি'র পার্থক্য খুব সামান্যই। আসলে সাংখ্য দর্শনে, বোধ হয়, দ্বৈতবাদের ঈশ্বরকে অস্বীকার করে অদ্বৈত্যবাদের ঈশ্বরকে অন্য নামে অর্থাৎ 'পুরুষ ও প্রকৃতি' নামে স্বীকার করা হয়েছে। তাই সাংখ্যদর্শনকে নাস্তিকবাদীদর্শন না বলে, বোধ হয়, আস্তিক্যবাদী দর্শন বলাই সঙ্গত।　　—সম্পাদক

আহ্বান

শ্রীবলরাম নাথ

পৃথিবীতে স্বশ্রেণীব মোরা যত জন,
নহি কভু হীন মোরা বক্রজ-ব্রাহ্মণ।
নিয়তির পরিহাসে পড়ে রাজ রোষে,
লাঞ্ছিত, হেলিত হিনু নিজ ভাগ্য দোষে

কিন্তু আজ পুনঃ হের উষার কিরণ,
মুছে নিয়ে যাইতেছে নিশার স্বপন।
সুপ্তুতার কুজ্ঝটিকা করে উন্মোচন,
উদ্ভাসিত সত্যারুণ লোহিত বরণ।

যোগ-সাধনার বলে পূর্ববর্তীগণ,
বিশ্বহিতে শতশত অসাধ্য সাধন—
করেছেন চেয়ে দেখ নয়ন ভরিয়া,
সমুজ্জ্বল রত্ন সম উঠে ঝলসিয়া।

রাজগুরু রূপে মোরা পেয়ে ছিনু স্থান,
নিজ দোষে সে সম্মান হবে কেন ম্লান?
এসো ভাই পুনঃ মোরা সাধনার বলে,
প্রতিষ্ঠিত হই আবার এই মহীতলে।

আত্মগোপনে যেথায় আছ যত জন,
স্বশ্রেণীর বন্ধু যত ভাই বোন গণ।
এসো আজি সবে মিলে হয়ে একমত,
বিশ্ব হিতে বেছে নিই নিজ কর্ম পথ।

সিংহ শিশু ওরে মোরা নহিরে শৃগাল,
কেন রব সুপ্ত ভাই মোরা চিবকাল ?
সিংহের শাবক মোরা সিংহ সম কাজ,
এ সমাজ ভেঙে গড়ব নতুন সমাজ।

তারা মা

প্রফুল্ল গৌতম

এবার দেখা দে মা জ্যোতির্ময়ী
মা জননীব মূর্তি ধরে।
দিনের শেষে ঘরের ছেলে
নে ডেকে মা তোরই ঘরে॥

ষড রিপুব বেড়ায় ঘরা
হৃদি-মন যে আঁধার ভরা,
তাই তোবে মা ডাকি তারা—
আঁধার দিতে আলো করে॥

মা তোর ছেলের এই কামনা
কোলের ছেলে কোলে নে মা,
হোক এজীবন ধন্য গো মা—
দু' চোখ ভরে দেখে তোরে॥

পাত্র-পাত্রী

(পরিণয় সংঘটন বিভাগ)

পরিচালনায়—**বি. দেবনাথ**

৫২/৬ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০৩৬

পাত্রী—(২২) (৫'-১") উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্রস্বভাবা সুন্দরী, সুগঠনা ও সূচী শিল্পে নিপুনা। শিক্ষিত ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীরেবতী রঞ্জন চৌধুরী ৬০/২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৩ ফোন নং—২১-৩২৬০ সকাল ১০টা পর্য্যন্ত, ২৪-৬২৯৭ ও ২৪-৯৪৫৮ সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত।

পাত্র—(৪২) বি. এ., State Electricity Board-এর হেড ক্যাশিয়ার। নিঃসন্তান প্রথমা স্ত্রী বর্তমান। ফর্সা শিক্ষিতা সুন্দরী ধর্মপরায়ণা পাত্রী চাই। স্কুল শিক্ষিকা চলবে। রেজেষ্ট্রী বিয়েতে আপত্তি নাই।

এবং

পাত্রী—(২৪) ঐ ভগ্নী, বি. এ., (ইং অনার্স) দিয়েছে। ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী স্লীম শান্ত স্বাভাবা, ৫"। দাবিহীন উদার পাত্র চাই। রেজেষ্ট্রীতে আপত্তি নাই। মিঃ দেবনাথ, Qrs No. D—60, P.O. Santaldih Thermal Plant, Dist-Purulia.

পাত্রী—(২২) (৫'-১") রাণাঘাটের বিশিষ্ট পরিবারের। বি. এ. পরীক্ষার্থিনী, ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী। গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে পারদর্শিনী। শ্রীরবীন্দ্র দেবনাথ, ষষ্ঠীতলা, রাণাঘাট, নদীয়া।

পাত্র—উপার্জনশীল ৩৫ বৎসরের উর্দ্ধে পাত্র চাই। পাত্রী B. A. P. G. B. T পাশ। মধ্যম গড়ন মধ্যম চেহারা উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ৫'-৩" গৃহকর্মে নিপুণা। যথাসাধ্য দাবীদাওয়া মিটানো হবে। Sri Tarun kumar Nath 7/127 H. I. G. Colony, New D. N. Nagar, Andheri (west) Bombay-400058.

পাত্রী—(১৮) (৫'-৩") এস এফ পাশ, সঙ্গীতশ্রী, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুল গীতিতে বিশেষ পারদর্শিনী, উজ্জল শ্যামবর্ণা সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। উপযুক্ত পাত্রের ক্ষেত্রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। শ্রীসুবল দেবনাথ ৪৮ টালাপার্ক এভিনিউ, ফ্লাট নং ১৮, কলি-৩৭।

পাত্রী—(২০) (১'৫৫ মিঃ), দুর্গাপুর ষ্টীল প্লান্টে কর্মরত পিতার একমাত্র কন্যা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, সঙ্গীতে ৪র্থ বর্ষ। ১৯৮৩ সালে হাঃ সেঃ পরীক্ষা দেবে। শ্রীধীরেন দেবনাথ, ২১/৩ ভারতী রোড, দুর্গাপুর-৫ জিঃ—বর্ধমান।

পাত্রী—(২৫) (৫'-২") উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, আণ্ডার গ্রাজুয়েট উত্তম মুখশ্রীযুক্তা দোহারা গড়ন,

এবং

পাত্রী—(২৬) (৫'-২") উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, গ্রাজুয়েট, দোহারা গড়ন, সুন্দর মুখাবয়বযুক্তা। শ্রীআশুতোষ নাথ C/o ডাঃ কল্যাণময় নাথ ৬২/২ ব্যানার্জী পাড়া রোড, পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা, পিন—২৪৩১৩৫।

পাত্রী—(২৮) বি. এ Short Hand জানা, প্রাইভেট ফার্মে কর্মরতা, ফর্সা সুন্দরী স্লীম ফীগার।

এবং

পাত্রী—(২৬) বি. এ Short hand জানা, ফর্সা স্লীম ফীগার

এবং

পাত্রী—(২৪) (৫'-১") বি. এ পরীক্ষার্থিনী, প্রকৃত সুন্দরী। শ্রীগোপাল দেবনাথ ৭ অনরেট্ ফাষ্ট লেন, ইণ্টালি, কলি-১৪।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

শ্রীকালিদাস অধিকারী
তারকেশ্বর বস্ত্রালয়
অরবিন্দ রোড
পোঃ—নৈহাটী
জিঃ—২৪ পরগণা

শ্রীহরিহর নাথ
১৫৪ দিনেমার ডাঙ্গা
পোঃ—গোণ্ডপাড়া
চন্দননগর
জিঃ—হুগলী

শ্রীরাখাল চন্দ্র দেবনাথ
৪৭/১ রায়পুর রোড
কলিকাতা-৭০০০৪৭

শ্রীরেবতী রঞ্জন চৌধুরী
৬০/২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৩

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন একশত টাকাদিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

শ্রীশ্রীশিবগীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শিবভক্ত্যুৎকর্ষনিরূপণম্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বন্ধেষু যাদৃশী প্রীতির্বর্ত্ততে পরনেশিতুঃ।
উত্তমেষ্বপি নাস্ত্যেব তাদৃশী গ্রামজেষ্বপি॥ ২৯

তং ত্যক্ত্বা তাদৃশং দেবং যঃ সেবেতান্য দেবতাম্।
স হি ভাগীরথীং ত্যক্ত্বা কাঙ্খতে মৃগতৃষ্ণিকাম্॥ ৩০

কিন্তু যস্যাস্তি দুরিতং কোটিজন্মসু সঞ্চিতম্।
তস্য প্রকাশতে নায়মর্থো মোহান্ধচেতসঃ॥ ৩১

ন কালনিয়মো যত্র ন দেশস্য স্থলস্য চ।
যত্রাস্য রম্যতে চিত্তং তস্য ধ্যানেন কেবলম্॥ ৩২

আত্মত্বেন শিবস্যাসৌ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
অতিদীর্ঘতমায়ুঃ শ্রীভূতেশাং শোধিশোঽপি যঃ॥ ৩৩

স তু রাজাহম স্মীতি বাদিনং হন্তি সান্বয়ম্।
কর্ত্তাপি সর্ব্বলোকানামক্ষ ঐশ্বর্য্যবানপি॥ ৩৪

শিবঃ শিবোহহমস্মীতি বাদিনং যঞ্চ কঞ্চন।
আত্মনা সহ তদাত্ম্য ভাগিনং কুরুতে ভৃশম্ ॥ ৩৫

অনুবাদ ঃ—

বনে জাত দ্রব্যাদিতে পরমেশ্বর পার্বতীপতি যেরূপ প্রীত হন, গ্রামে জাত উত্তম সামগ্রীসমূহেও সেরূপ হন না। ২৯ ॥ সুতরাং এই রকম আশুতোষ দেবতা থাকতে যিনি অন্য দেবতার সেবা করেন তিনি ভাগীরথী পরিত্যাগ করে মরীচিকার আশায় ধাবিত হন। ৩০ ॥ যার কোটি-জন্মের পাপ সঞ্চিত থাকে সেই মোহান্ধ ব্যক্তির হৃদয়ে কখনো শিবজ্ঞানের সঞ্চার হয় না। ৩১ ॥ শিবারাধনায় দেশকালাদির কোন নিয়ম নেই, যেখানে যখন চিত্ত প্রফুল্ল হবে সেখানে তখনই তাঁর ধ্যান করা যেতে পারে। ৩২ ॥ এইভাবে শিবজ্ঞানের সঞ্চার হলে শিব-তাদাত্ম্য ও শিব-সাযুজ্য লাভ হয় এবং শিবজ্ঞানী সেই ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও শ্রীমান হয়ে শঙ্করের অংশাধিপ হন। ৩৩ ॥ যে ব্যক্তি 'আমি রাজা' এরূপ গর্বিত বাক্য ব্যবহার করে, শিবজ্ঞানী তাকে সবংশে নিহত করতে পারেন এবং শিবজ্ঞানী ব্যক্তিই সকল লোকের কর্তা ও অক্ষয় ঐশ্বর্য্যবান হন। ৩৪ ॥ যাঁর হৃদয়ে 'আমিই শিব' এরূপ অদ্বৈতজ্ঞান সঞ্চারিত হয় তিনিই শিব-তাদাত্ম্য লাভ করেন। ৩৫ ॥ [ক্রমশঃ

অনুবাদক—সু. নাথ

সম্পাদকীয়

রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের পদবী নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। পদবী সম্পর্কে অনেকের ধারণাই অতি অস্পষ্ট। পদবী প্রধানত তিন ধরণের —(১) সাধারণ, (২) বিশেষ এবং (৩) পরবর্তীকালে প্রাপ্ত।

হিন্দুদের চারটি বর্ণের সাধারণ-পদবী আছে,—ব্রাহ্মণদের 'শর্মা বা দেবশর্মা', ক্ষত্রিয়দের 'বর্মা বা দেববর্মা', বৈশ্যদের 'গুপ্ত' এবং শূদ্রদের 'দাস'। এই সাধারণ-পদবী চারটি স্মার্ত-ক্রিয়াদিতে ব্যবহৃত হয়।

ব্রাহ্মণদের সকল শ্রেণীই তাঁদের উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সাধারণ-ব্রাহ্মণ-পদবী 'দেবশর্মা' ব্যবহার করেন। রুদ্রজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণরাও তাঁদের উপনয়নাদি অনুষ্ঠানে সাধারণ-ব্রাহ্মণ-পদবী 'দেবশর্মা'ই ব্যবহার করে থাকেন।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে গুরুকুলের জন্য বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবীর প্রচলন হয়। শৈব ও শাক্ত ধর্মের আদি-গুরু-কুলের জন্য প্রচলিত হয় 'নাথ' এই বিশেষ ব্রাহ্মণ পদটি কালক্রমে সাধারণ-ব্রাহ্মণদের আর একটি অংশও গুরুগিরি আরম্ভ করেন এবং তাঁরা ব্যবহার করেন 'স্বামী' এই বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবীটি। কালান্তরে গুরুকুল গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি আরো দশ ভাগে বিভক্ত হয়। বৈষ্ণব-ধর্মের আবির্ভাবে যে গুরুকুলের উদ্ভব হয় তাঁরা ব্যবহার করেন 'গোস্বামী' এই বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবীটি রুদ্রজ-ব্রাহ্মণরা শৈব ও শাক্ত ধর্মের আদি-গুরু-গণের বংশধর। তাই তাঁদের বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবী 'নাথ বা দেবনাথ'।

অবশ্য অনেক অব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যেও 'নাথ বা দেবনাথ' পদবী ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা বোধ হয়, সন্ন্যাসী-নাথ-গুরুদের উদারতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। সন্ন্যাসী-নাথ-গুরুর কাছ থেকে সাধারণ-দীক্ষা

লাভ করেই অনেক অব্রাহ্মণ-গৃহস্থ 'নাথ বা দেবনাথ' পদবী ব্যবহার করেছেন।

অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মতো রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের মধ্যেও পরবর্তীকালে প্রাপ্ত-পদবী অনেক রয়েছে। রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী, বাগচী গোস্বামী, রায় চৌধুরী, তালুকদার, বিশ্বাস, দালাল, হালদার, ভৌমিক, সরকার, মজুমদার, মুহুরী প্রভৃতি সবই পরবর্তীকালে প্রাপ্ত-পদবী।

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবী, সাধারণ-ব্রাহ্মণ-পদবীকে এবং পরবর্তীকালে-প্রাপ্ত-পদবী, বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবীকে অপসারিত করে বহাল হয়েছে।

—:*:—

সনাতন-হিন্দুধর্ম

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বর্তমান যুগের হিন্দু ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রেও পৌরাণিক যুগের মতো সাধারণ গৃহস্থদের জন্য পূজা, সাধক-গৃহস্থদের জন্য পূজা ও যোগ এবং সন্ন্যাসী-সাধকদের জন্য যোগ-সাধনা নির্দিষ্ট আছে। তবে বর্তমান যুগের হিন্দুধর্মে কঠিন সাধনাকে সরল করে 'মেডইজি'-রূপেও হিন্দুদের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। এই 'মেডইজি' হচ্ছে 'নাম-সাধনা'। বর্তমান যুগে বলা হচ্ছে—নামই যজ্ঞ, নামই যোগ, নামই পূজা। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল শাখাতেই নাম সাধনার কথা বলা হচ্ছে।

নাম মানে মন্ত্র। এই মন্ত্র আসলে ঈশ্বর বা দেবতার নামকে অবলম্বন করে রচিত। শৈব শাখায় শিব-মন্ত্র, শাক্ত শাখায় শক্তিমন্ত্র, বৈষ্ণব শাখায় বিষ্ণু বা কৃষ্ণ মন্ত্র প্রভৃতির সাধনের কথা বর্তমান যুগে বলা হচ্ছে।

সাধারণ গৃহস্থদের জন্য বলা হচ্ছে, সাংসারিক নানান কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর যেটুকু সময় ও সুযোগ যখন যেমন পাওয়া যাবে তখন তেমন নাম জপ করতে হবে। সাধক-গৃহস্থদের জন্য বলা হচ্ছে, সাংসারিক-কর্মের সাথে সাথেই সমান গুরুত্ব দিয়ে নাম জপ করে যেতে হবে। আর সন্ন্যাসী সাধকদের জন্য বলা হচ্ছে প্রতিনিয়ত নাম জপে ডুবে থাকতে হবে।

নাম জপের মধ্য দিয়ে মন-প্রাণ বাইরের সমস্ত বিষয় থেকে সরে

এসে নামে নিবদ্ধ হয়। তাই, ব্যক্তিগত বিষয় বাসনা পরিত্যাগের মধ্য দিয়েই প্রকৃত নাম জপ হতে পারে। সুতরাং, সাধারণ গৃহস্থদের জন্য যে নাম জপের কথা বলা হচ্ছে তাতে তাঁদের ভোগের সাথে সাময়িক ত্যাগাভ্যাসই হবে; সাধক-গৃহস্থদের জন্য যে নাম জপের কথা বলা হচ্ছে তাতে ত্যাগের সাথে ভোগের অনুশীলন হবে; আর সন্ন্যাসী সাধকদের জন্য যে নাম জপের কথা বলা হচ্ছে তাতে সার্বিক-ত্যাগই সাধিত হবে।

সুতরাং, বর্তমান যুগের হিন্দুদের জন্য যে সরলীকৃত নাম-সাধনার কথা বলা হচ্ছে তাতেও দেখা যাচ্ছে, ত্যাগই ধর্ম সাধনার ভিত্তি। সাধারণ গৃহস্থদের জন্য ভোগের সাথে সাময়িক ত্যাগাভ্যাস, সাধক-গৃহস্থদের জন্য ত্যাগের সাথে ভোগ এবং সন্ন্যাসী-সাধকদের জন্য সার্বিক ত্যাগ-সাধনা এখানেও পুরোপুরি রক্ষা করা হয়েছে।

কাজেই, দেখা গেল,—বিভিন্ন যুগে বাইরের দিক থেকে হিন্দু ধর্ম সাধনার অনেক পরিবর্তন সাধিত হলেও ভেতরের দিক থেকে এই হিন্দু ধর্ম সাধনা পুরোপুরি অপরিবর্তিতই থেকেছে; একই ত্যাগাদর্শ বিভিন্ন যুগের হিন্দু ধর্ম সাধনার ভিত্তিরূপে কাজ করেছে। প্রথমে ভোগের সাথে সাময়িক ত্যাগাভ্যাস, তারপরে ত্যাগের সাথে ভোগ এবং সবশেষে সার্বিক-ত্যাগের মধ্য দিয়ে মোক্ষ বা মুক্তিলাভের সাধনাই সর্বযুগের সর্বশাখার হিন্দু-সাধনার জন্য নির্দেশিত হয়েছে।

আগামী যুগে এই হিন্দু-ধর্ম-সাধনার বহিরঙ্গ-রূপের আরো পরিবর্তন, হয়তো, সাধিত হবে, তবে পূর্বোক্ত ঐ একই ত্যাগাদর্শ আগামী যুগের হিন্দু-ধর্ম-সাধনারও ভিত্তিরূপে নিশ্চয় বর্তমান থাকবে। এখানেই রয়েছে হিন্দু-ধর্মের সনাতনত্ব। তাই সনাতন হিন্দুধর্ম বলতে আমাদের বুঝতে হবে ত্যাগধর্মের ক্রমবিকাশকে—প্রাথমিক পর্যায়ে ভোগের সাথে সাময়িক ত্যাগাভ্যাস, দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্যাগের সাথে

ভোগ এবং তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে সার্বিক ত্যাগের ধর্মই সনাতন হিন্দু-ধর্ম।

সনাতন-হিন্দুধর্মের একটি সনাতন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,—একই ধর্মাদর্শকে অবলম্বন করে চরম লক্ষ্যে পৌঁছুবার মত ও পথের বিভিন্নতা। এই বৈশিষ্ট্য প্রাক-বৈদিক, বৈদিক ও পৌরাণিক প্রত্যেক যুগেই বর্তমান ছিল; বর্তমান যুগেও বর্তমান আছে এবং আগামী যুগেও নিশ্চয় বর্তমান থাকবে।

সনাতন-হিন্দু-ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,—ধর্ম-সাধনার বিভিন্ন মত ও পথের মধ্যে, বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় সাধন। বৈদিক-যুগের শেষভাগে একবার বৃহদাকারে ঋষিধারা ও মুনিধারার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছিল; পৌরাণিক যুগের শেষভাগে আর একবার শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি শাখার মধ্যে বড় ধরণের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল; বর্তমান যুগেও বিশেষত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পর থেকে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াস এগিয়ে চলেছে।

সনাতন-হিন্দু-ধর্মের দুটি প্রাচীন শাখা—বৌদ্ধ ও জৈন শাখাকে হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা ধর্ম হিসেবে প্রদর্শন করার একটা প্রবণতা বর্তমানে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই প্রবণতাকে আমরা যদি কাটিয়ে উঠতে না পারি—আমরা যদি অনুভব করতে না পারি যে, হিন্দুধর্মের প্রতিটি শাখা ধর্মের অভ্যন্তরেই, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যন্তরেও একটি অভিন্ন ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাহলে হিন্দু ধর্মে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না, বহুবিচ্ছেদে হিন্দু ধর্মের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে, হিন্দুধর্ম বিশ্বের সংখ্যা-লঘুদের ধর্মে পরিণত হবে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে হিন্দু ধর্মের শাখা হিসেবে ধরলে আজো হিন্দুধর্ম বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম হিসেবে

পরিগণিত হতে পারে। আনন্দের ব্যাপার, বিগত হিন্দু ধর্ম মহা-সম্মেলনে বৌদ্ধ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পরিশেষে কামনা করি,—সনাতন-হিন্দু-ধর্মের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় প্রকৃত সনাতন-ধর্মাদর্শ অনুসৃত হোক, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধিত হোক, সুপ্রাচীন মহান হিন্দু-ধর্ম বিশ্বমানবের মুক্তির পথ প্রদর্শন করুক।

ঈশ্বর ভাবনা ও মানব সেবা

ডাঃ ভবনাথ সরকার, বি. এ. (অনার্স) বি. টি, ডি. এম. এস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বুদ্ধদেবের মতে 'বাসনা বিকার, ঘৃণা, পাপ, সংসারে আসক্তি, রিপুপরবশতার জন্য জীবের ক্লেশ এবং এই দুর্বিসহ ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়াই জীবের পরম লক্ষ্য। দুঃখ পাঁচ প্রকার রূপ (ইন্দ্রিয়)। বিজ্ঞান (আমিত্ব), বেদনা (সুখ দুঃখাদির অনুভব), সংজ্ঞা (ভেদাভেদজ্ঞান), সংস্কার (রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি ভাব) ; এই পঞ্চবিধ দুঃখ নিরোধের নাম নিধান। শাক্যের মতে জগৎ অবিদ্যা সমুৎপন্ন। জ্ঞান থাকলেই তৎ বিপরীত অজ্ঞান সহজে প্রতিভাত হয়। অজ্ঞান অভাব সামগ্রী সুতরাং উহা কিছুই নয়। অজ্ঞান অনন্ত জ্ঞানকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং এই অজ্ঞান মূলক জগৎসহ সেই জ্ঞানবস্তু অসংস্পৃষ্ট, ইনি স্রষ্টাও নন, কর্তাও নন। এই জগৎ অস্তি নাস্তি ভাব সম্পন্ন (এই আছে দুদিন পরে আর থাকবে না-এইরূপ ক্ষণিকত্ব)। বুদ্ধদেবের মতে—জন্মের দ্বারা কেহ নীচজাতি বা ব্রাহ্মণও হয়না, কেবল কার্যের দ্বারা মানুষ নীচ বা ব্রাহ্মণ হয়ে থাকে। বেদপাঠ, পুরোহিত দেবতাদের কিছুদান, অগ্নি বা শীতলতার মধ্যে কঠোর তপস্যা অথবা অমৃতত্ব লাভের জন্য অপর নানাবিধ কৃচ্ছ সাধনের দ্বারা মানুষ পুণ্যবান হয় না ; যে ব্যক্তি সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত, সেই-ই পবিত্র। চার্বাক দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। তাদের মতে প্রত্যক্ষ ব্যতীত সত্যজ্ঞান লাভের কোন উপায় নাই। যাহা কিছুই ইন্দ্রিয় গোচর তাহাই সত্য। এই বিপুল পৃথিবী আকস্মিক ভাবেই সৃষ্ট। দেহই আত্মা। চৈতন্য মানব দেহের গুণ বিশেষ, দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয়। সুতরাং কর্মফল ভোগ, আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ সবই অর্থহীন। ঈশ্বর বলিয়া অতি প্রাকৃত কোন সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব নাই। রাজাই পরমেশ্বর, মোক্ষ বলিয়া কিছু নাই, ইহজগতে সুখই—একমাত্র বস্তু যাহা সত্য ও কাম্য। সুতরাং যাবৎ জীবেৎ, সুখং জীবেৎ।

পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন যুগের যুক্তিবাদের জনক ছিলেন সক্রেটিস ; প্লেটো ও এরিষ্টটল তারই অনুসরণ করে। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য

তার হয় মৃত্যুদণ্ড। বেকন ও হিউস ছিলেন সংশয় বাদী। কাণ্ট মিল ও বেন্থামও যুক্তিবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। অতি আধুনিক দ্বন্দ্ববাদের স্রষ্টা কার্লমার্কস। জড় থেকেই চেতনার উদ্ভব। এই মতবাদ হেগেলের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর মতে চেতনা থেকে জড়ের উৎপত্তি। তবে কার্লমার্কস তত্ত্বের অন্যতম পথিকৃত লেনিন মতে 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অক্ষমতা থেকে উদ্ভুত হয় ঈশ্বর, শয়তান, অলৌকিকত্ব ইত্যাদিতে বিশ্বাস। ধর্ম জনগণের পক্ষে আফিম স্বরূপ। ** আলোক প্রাপ্ত আধুনিক সচেতন শ্রমিক বুর্জোয়া ভক্তদের জন্য স্বর্গ ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা এ পৃথিবীতে উন্নততর জীবনে হবে উদ্যোগী'। ডারউইন কার্লমার্কসের পূর্ববর্তী দার্শনিক তিনি বলেছিলেন ঈশ্বর পৃথিবী বা জীব সৃষ্টি করেন নি। এক আকস্মিকতার জন্য পৃথিবীর জন্ম এবং বিবর্তনের ফলেই জীবের জন্ম।

এইবার আমরা মানব সেবায় কোন ধর্মের স্থান কতটুকু এ প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখতে পাই বৌদ্ধ যুগের পূর্বে কোন ধর্মই ব্যক্তিগত চিন্তা ও স্বার্থ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র আর্ত ও দরিদ্র জনগণের সেবায় এগিয়ে আসেন নি।[২] বুদ্ধদেব

২। বৌদ্ধ-পূর্ব যুগের ধর্মীয় ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। বেদের মধ্যে এই ইতিহাসের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। সেই আভাস থেকে একটা কাঠামো কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। এই কাঠামো কল্পনায় অনেক ভ্রান্তি আছে, মনে হয়। কারণ,—প্রধানত ত্যাগধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের চরম ও পরম কথা, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ জগতের এই সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম। যে ঋষি বা মুনি এই চরম ও পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি তাঁর শিষ্যদের ব্রহ্মজ্ঞানে জগতের সমস্ত কিছুকে সেবা করতে বলেন নি— এটা হতে পারে না। আবার হিন্দু-দর্শনগুলোর মধ্যে অদ্বৈতবাদে জীব ও ব্রহ্মকে অভিন্ন বলা হয়েছে এবং দ্বৈতবাদে বলা হয়েছে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন হলেও প্রতিটি জীবে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট। কাজেই কি দ্বৈত কি অদ্বৈত, সমস্ত বাদেরই বক্তব্য,—মানব তো বটেই, কোন জীবই ব্রহ্ম বর্জিত নয়। সুতরাং হিন্দু-দর্শন অনুযায়ী মানব বা জীব সেবা আসলে ব্রহ্মসেবা।

বৈদিক যুগ থেকেই জ্ঞানকাণ্ডী ও কর্মকাণ্ডীদের মধ্যে সংঘাত হয়ে এসেছে। বৈদিক যুগের মধ্যভাগে জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য সূচিত হয়। কিন্তু এই যুগেরই

ঈশ্বর সম্পর্কে নীরব থাকলেও জনগণের সেবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। 'সর্ব জীবে দয়ার মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাজর্ষি অশোক। জৈনরা যদিও মনুষ্যেতর প্রাণীর সেবার জন্য আজও নানারকম ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু মানুষের সেবাতে তাঁদের অনীহা। কারণ তাঁদের মতে কর্মফলেই মানুষের কষ্ট। তাদের সাহায্য করার অর্থ স্বীয় কর্মফল ভোগ করতে বাধা দেওয়া। বৈষ্ণব ধর্মে যদিও 'জীবে দয়া'র কথা বলা হয়েছে কিন্তু 'বহুজন হিতায়' হাসপাতাল বা আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য কোন চেষ্টা করা হয়নি। কারণ জাগতিক দুঃখকে তাঁরা ঈশ্বরের লীলা বলেই মনে করেন। বৈষ্ণব কবি নরোত্তম দাস নাম জপের সময় তৃষ্ণার্তকে জলদান করার অপরাধে তাঁর গুরু লোকনাথ গোস্বামী দ্বারা ভর্ৎসিত হয়েছিলেন এবং গুরুর আদেশে তাঁকে বৃন্দাবন ত্যাগ করে গৃহাশ্রমে ফিরে যেতে হয়েছিল। ইসলাম ধর্মে প্রতিবেশীদের দয়া করার কথা আছে। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের তাদের আয়ের অন্তত ২½% দান করার বিধি আছে। তবে এই সব দান ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম সেবার ধর্ম। যীশু বলেছেন 'আমরা কেউ কর্তৃত্ব করতে আসিনি—সেবা করতে এসেছি। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রাণ নরনারীদের দানে পুষ্ট বহু মিশনারী সংস্থা আজও সারা পৃথিবীতে

শেষভাগে আবার কর্মকাণ্ডের একাধিপত্য দেখা দেয়। সেই সময়েই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনি আবার জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্যকে ফিরিয়ে আনেন (বৌদ্ধধর্ম বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের ওপর প্রতিষ্ঠিত)। বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগে আবার কর্মকাণ্ড প্রাধান্য পায়। এই ভাবে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সংঘাতে কখনো জ্ঞানকাণ্ড কখনো কর্মকাণ্ড আধিপত্য করেছে। যখনই কর্মকাণ্ডের আধিপত্য ঘটেছে তখনই হিন্দু-ধর্মাচরণ মানব বা জীব সেবা থেকে সরে গেছে। আবার জ্ঞানকাণ্ডের আধিপত্যে মানব বা জীব সেবা ফিরে এসেছে। মধ্যযুগে চৈতন্যদেব একবার এবং আধুনিক যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আর একবার কর্মকাণ্ডের কোলাহলের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ডকে কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ জ্ঞানকাণ্ডের সেই চরম ও পরম কথাটাই নতুনভাবে বলেছেন,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" —সম্পাদক

আর্তের সেবা করে যাচ্ছেন।[৩] মাদার টেরেসা'র সেবার কথা সারা বিশ্বের লোকের অজানা নয়।

সর্বশেষে মার্কসবাদে বিশ্বাসী সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা বলি। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ এই নীতি মেনে চলেন। এরা ঈশ্বর মানেন না। নাস্তিক। কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণের জন্ম বা জগতের মানুষের সাহায্যে এদের হস্ত প্রসারিত।[৪] বিজ্ঞানে বিশ্বাসী আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি দেশে সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব, ধনী নির্ধনের ব্যবধান এখনো মাঝে মাঝে ওদেশের নীরিহ জনগণকে পীড়ন করছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের উপর উৎপীড়ন ধার্মিক ইহুদীদের লেবাননের উপর বোমাবাজী এখনো চলছে।

এর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়েও মানবতার সেবা করছে। এরা কি পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের সেবা করছে না? ধর্মপ্রাণ ভারতে এখনও জাতিতে জাতিতে হিংসা, ভেজাল, জাল-জুয়াচুরি ভণ্ডামী চলছে। এরা কি ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী থেকে সৎ জীবন যাপন করছে না?[৫] আমাদের ধারণা

৩। খ্রীষ্টান-মিশনারীদের সেবামূলক কাজের মধ্যে পূর্বে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়েছে এবং বর্তমানেও অনেকক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপতি হচ্ছে। —সম্পাদক

৪। সমাজতান্ত্রিক দেশেও মানব-পীড়ন যে হয় না তা নয়। তথাকথিত সর্বহারার একনায়কতন্ত্র দ্বারা অন্যদের পীড়ন এবং মার্কসীয় দর্শনে আস্থাহীন অথচ অন্যদর্শনে আস্থাশীল মানবের পীড়ন সেখানে দেখা যায়। —সম্পাদক

৫। প্রত্যেক মতবাদ বা দর্শনের প্রাথমিক-প্রয়োগ-কালে ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বার্থান্বেষীর দল সেই মতবাদ বা দর্শনের আড়ালে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ করতে তৎপর হয়। আসে বিচ্যুতি; আসে অনাচার, অবিচার, জাল-জুয়াচুরি-ভণ্ডামী। শুরু হয় সেই মতবাদ বা দর্শনের অবক্ষয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে প্রচলিত মতবাদ দর্শনের সংস্কার হয় অথবা নতুন কোন মতবাদ বা দর্শনের উদ্ভব হয়। এই ভাবেই অগ্রগতি চলতে থাকে।

ভারতবর্ষে হিন্দু মতবাদ বা দর্শনের প্রয়োগে ব্যক্তি মানুষের সূক্ষ্ম মানসিক প্রশান্তির দিকটা যতটা প্রাধান্য পেয়েছে ততটা প্রাধান্য পায়নি সমষ্টিগতভাবে

ঈশ্বরে বিশ্বাসী হোক আর না হোক যারা জনগণের সেবা করছেন তাঁরাই পরোক্ষভাবে ঈশ্বরেরই সেবা করছেন। কারণ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ,বহুরূপে সম্মুখে তোমার / ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর / জীবে প্রেম করে যেই জন / সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

মানুষের স্থুল জৈবিক-প্রয়োজন মেটাবার দিকটা। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে স্থুল জৈবিক-প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে, সূক্ষ্ম মানসিক প্রশান্তি আসতে পারে না। সেখানেই সঙ্কট দেখা দিয়েছে বারে বারে। প্রয়োজন হয়েছে মতবাদ বা দর্শনের সংস্কারের। সংস্কারও সাধিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আগামী দিনে, হয়তো, হিন্দু মতবাদ বা দর্শনের ব্যাপক সংস্কার সাধিত হবে অথবা নতুন কোন মতবাদ বা দর্শনের উদ্ভব হবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সর্বাধুনিক মার্কসীয় মতবাদ বা দর্শনের প্রয়োগ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সূক্ষ্ম মানসিক প্রশান্তির দিকটা প্রাধান্য পায় নি, প্রাধান্য পেয়েছে সমষ্টিগতভাবে মানুষের স্থুল জৈবিক প্রয়োজন মেটাবার দিকটা। সেখানে সমষ্টিগতভাবে স্থুল জৈবিক প্রয়োজন অনেকটা মিটছে। কিন্তু খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ছাড়াও মানুষের আরো কিছু প্রয়োজন হয়। সেখানেই সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই মার্কসীয় মতবাদ বা দর্শনের বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে—একটি দেশ আর একটি দেশের বিরুদ্ধে বিচ্যুতির অভিযোগ তুলে অনুসৃত নীতির পরিবর্তন দাবী করছে। যতদিন যাবে অবস্থা ততই জটিল হবে। প্রয়োজন হবে, মার্কসীয় মতবাদ বা দর্শনের সংস্কারের। আগামী দিনে, হয়তো, ঐ মতবাদ বা দর্শনের ব্যাপক সংস্কার সাধিত হবে অথবা নতুন কোন মতবাদ বা দর্শনের অভ্যুদয় ঘটবে। —সম্পাদক

॥ গোরক্ষাবতার মস্তনাথ ॥

এস. ভট্টাচার্য্য

নাথ-সাধনমার্গে এমন অনেক স্বয়ংসিদ্ধ মহাযোগী পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন যাঁহাদের বিষয় আমরা অনেকেই অবহিত নহি। মস্তনাথ এমনই এক স্বয়ংসিদ্ধ মহাযোগী। ইনি শ্রীশ্রীগুরুগোরক্ষদেবের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত রোহতক জেলায় নাথপন্থী যোগীদের একটি প্রসিদ্ধ মঠ আছে, ঐ মঠের নাম বহর যোগমঠ। গোরক্ষাবতার মস্তনাথ ছিলেন ঐ যোগমঠের প্রথম মহান্ত। উক্ত মঠের পঞ্চম মহান্ত চেৎনাথজী মহারাজের অন্যতম শিষ্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশঙ্কর নাথ যোগীশ্বর হিন্দি ভাষায় পদ্যছন্দে 'মস্তনাথ চরিত' নামে একখানি সুললিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত হিন্দি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়া গুরু ভ্রাতা বর্দ্ধমান জেলা নিবাসী সাধক ও সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত বিষ্ণুচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বঙ্গ ভাষায় 'মস্তনাথ চরিত' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বর্দ্ধমান যোগমঠ হইতে উহা প্রকাশ ও প্রচার করেন। বর্তমানে এই গ্রন্থখানিও আর পাওয়া যায় না। এইরূপ মূল্যবান গ্রন্থের এবং যোগী পুরুষদের অদ্ভুত লীলা মাহাত্ম্য প্রচার করা প্রয়োজন মনে করিয়া আমি উক্ত গ্রন্থের সারাংশ গ্রহণ করতঃ 'গোরক্ষাবতার মস্তনাথ' লিখিতে আরম্ভ করি। যোগের অলৌকিক ক্ষমতা অনুধাবন করিয়া যোগসাধনার প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

জন্মবৃত্তান্ত :—পাঞ্জাব প্রদেশে রোহতক জেলার অন্তর্গত কেসরিহাট গ্রামে সুবল নামে রেবারী জাতীয় এক ধনী ব্যবসায়ী বাস করিতেন।

বহু ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হইলেও তিনি পুত্রধনে বঞ্চিত ছিলেন, দেবদ্বিজ, সাধু সন্ন্যাসী, যোগী-মহাপুরুষদের দর্শন পাইলেই ভক্তি সহকারে প্রণতি জানাইয়া সুবল দম্পতি তাহাদের নিকট পুত্রধন কামনা করিতেন। একদা ব্যবসা-বাণিজ্যব্যপদেশে যমুনাতীরস্থ কোন স্থানে গমন করিলে, তথায় জটাজুট সমন্বিত কুণ্ডল ও নাদবিন্দুধারী এক সিদ্ধযোগী পুরুষের দর্শন লাভ করেন। তাঁহাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইয়া সুবলদম্পতি তথায় অপেক্ষা করিতে থাকেন। ধ্যানভঙ্গ হইলে মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি তাঁহাদের উপর পতিত হয়। তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমরা' কি চাও'? সুবলদম্পতি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট পুত্ররত্ন কামনা করেন। সিদ্ধযোগীপুরুষ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বরদান করিয়া বলেন, 'অচিরেই তোমাদের এক পুত্ররত্ন লাভ হইবে।' সুবলদম্পতি ঐ যোগী পুরুষকে পুনরায় প্রণতি জানাইয়া ফিরিবার উপক্রমকালে সহসা দেখিলেন যে সেই মহাপুরুষ আর তথায় নাই। তিনি অন্তর্ধান হইয়াছেন। যাহা হউক মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া এক পরম বিস্ময়—এক অপার আনন্দ, এক আশার আলোক হৃদয়ে পোষণ করিয়া সুবলদম্পতি দেশে ফিরিলেন! এইবার তাঁহারা নিশ্চয়ই পুত্ররত্ন লাভ করিবেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসরও বিগতপ্রায় কৈ সুবল জায়ার তো সন্তান সম্ভাবনার কোন লক্ষনই প্রকাশ পাইতেছে না। বিধাতা কি এতই নিষ্ঠুর, মহাপুরুষের বাণীও বিফল হইবে? আশা নিরাশার মাঝে রেবারীদম্পতির দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন কোন কার্যোপলক্ষে সস্ত্রীক গ্রামান্তরে যাইবার কালে পথিমধ্যে জঙ্গলের ধারে বৃক্ষতলে এক বৎসর বয়স্ক এক শিশু সন্তানকে শায়িত দেখিতে পাইলেন। কি আশ্চর্য! এই গভীর অরণ্যে এই

শিশুকে একেলা রাখিয়া ইহার অভিভাবক কোথায় গিয়াছে? সুবল-দম্পতি উষ্ট্র পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া বালকের নিকটে গেলেন। বালককে দর্শন করিয়া সুবল জায়ার হৃদয়ে মাতৃস্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি বালককে কোলে তুলিয়া বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। শিশুটিও সুবল জায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া অভিমান সুরে কাঁদিয়া উঠিল, যেন দীর্ঘদিন মাতৃসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া সে তাহার হারান মাকে পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছে। সুবল শিশুটিকে লইয়া প্রথমে কিছু বিব্রত বোধ করিলেন, বহুক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়াও ঐ শিশুর অভিভাবকের কোন সন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে নিকটবর্তী গ্রামে উপস্থিত হইয়া ঐ শিশুর মাতা পিতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই শিশুটিকে নিজের বলিয়া দাবী জানাইল না। সুবলদম্পতি সহসা দৈববাণী শুনিতে পাইল—'এ শিশু তোমাদেরই সন্তান, এক বৎসর পূর্বে জন্মলাভ করিয়াছে, ইহাকে গৃহে লইয়া লালন-পালন কর। সিদ্ধ যোগী মহাপুরুষের পূর্বকথা স্মরণে উদিত হইল শিশুটিকে সেই সিদ্ধযোগী মহাপুরুষের বরদত্ত সন্তান জানিয়া তাহাকে স্বগৃহে লইয়া আসিলেন ও পরম আদর যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। যিনি সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, অজর ও অমর, অক্ষয় ও অব্যয়, নিরালম্ব অথচ যিনি সর্বভূতের আশ্রয়, সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শিবাবতার গোরক্ষনাথ পুনরায় যোগের অপূর্ব মহিমা ও প্রভাব প্রকাশ ও প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং বালকরূপ ধারণ করিয়া রেবারী গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন; মহান যোগীপুরুষের বরদত্ত সন্তান বলিয়া রেবারী সুবল বালকের নাম রাখিলেন মস্তনাথ।

[ক্রমশঃ

॥ জীবন সঙ্গীত ॥

ধীরেন দেবনাথ

মোর জীবনের নেই কোন দাম—হে ভগবান।
আমি ঝরা ফুল নেই কোন নাম—হে ভগবান ॥
ভালবেসে যার কাছে ছুটে যাই—
অবহেলা শুধু কুড়িয়ে যে পাই ;
ভালবাসার কী এই পরিণাম—হে ভগবান ॥
এই পৃথিবীর কেউতো আমার
জানে না মরম ব্যথা,
বুকের গহনে গুমরিয়া কাঁদে
কত যে না বলা কথা।

এ ভুবনে আমি বড় অসহায়,
দুখের আঘাতে ভেঙে গেছি হায় ;
চরণে এবার দাও বিশ্রাম—হে ভগবান ॥

—ঃ(০)ঃ—

নিম্নলিখিত ব্যক্তি একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

ডঃ বলরাম দেবনাথ
আই, আই, টি
কোয়াটার নম্বর সি—৬০
পোঃ—খড়্গাপুর
জিঃ—মেদিনীপুর

এলোকেশে এলো
কে সে ?
যুগে যুগে কবিব প্রেবণা সুন্দর চুল সেই চুলেব যত্ন
নিতে জ্যাবোরাণ্ডি কেশ তৈল একান্ত
প্রয়োজনীয় । পৃথিবীব সর্বত্র চুলেব চিকিৎসায়
আদিকাল হতে ব্যবহাব হযে আসছে "জ্যাবোরাণ্ডি"
—কোটি কোটি মানুষ উপকৃত
জ্যাবোরাণ্ডি
কেশ তৈল
পরীক্ষায় প্রমাণিত ব্রাজিলের জ্যাবোরাণ্ডি
ও কিছু ভারতীয় ভেষজের সংমিশ্রণে তৈরী
জ্যাবোরাণ্ডি কেশ তৈল, যা—
• চুল ওঠা বন্ধ করে, নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।
• মাথা ঠাণ্ডা রাখে সুনিদ্রা আনে।
• চুল আরও ঘন-কালো মোলায়েম করে।
• অকাল পক্কতা রোধ করে।
ডাঃ এস, ডি, দেবনাথ
হোমিও ল্যাবোরেটরী
সমস্ত এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও
স্টেশনারী দোকানে খোঁজ করুন
Jaborandi
HAIR OIL

বলিদান

হরষিত দেবনাথ

জীবহত্যা চায় কোন্ দেবতা ওরে—ও পাষণ্ড পূজারী দল।
বলির মানে হত্যা করা কোন্ পুরাণে আছে বল্?
বলির অর্থ—শরণ লওয়া, দেবতাকে উৎসর্গ,
জীবাত্মারূপ পশুকে কাটিবে শানিত ভক্তি খড়্গ।
প্রাণীর রক্তে রঞ্জিত ক'রে, করো মন্দির অপবিত্র,
মন্দির-মঝে ফুটিয়া ওঠে, বীভৎসতার সে কী চিত্র।
'উপাসনালয়' ধর্মের ঘর, পবিত্রতায় হবে উজ্জ্বল,
অথচ সেখানে ঘৃণ্য দৃশ্যে আঁখি করে শুধু ছলছল।
যেখানে আসিলে প্রেমের সাগরে ভক্তির বারি থৈ থৈ—
সে-ই দেবালয়; তোদের ওখানে অর্ঘ্য সেটুকু কৈ?

বীভৎসতার আনন্দে মেতে করিতেছ জীব হত্যা,
ওরে-জল্লাদ! রক্ত পিশাচ! নাহি মন্দিরে তোর স্বত্ব।
ধর্ম-মুখোশ পরিধান ক'রে দেবতা করিস্ ভক্তি,
হত্যা-যজ্ঞ নীরবে যে দেখে, নাহি তার কোন শক্তি।
কে করিবে ত্রাণ, কী ক্ষমতা আছে পাপী ঐ দেবতার?
অভিশাপ দেই দেবতাকে আমি মমতা নাহিক যার।

খাদ্য সম্ভার হিসাবে বুঝিয়া খাও বেশ ভাল কথা,
ধর্মের নামে গ্লানি ক'রে কেন দেবতাকে দিছ ব্যথা?
ভাগাভাগি ক'রে পূজোর আগেই মূল্যটা ক'ষে ক'ষে,
উত্তোলিত হইবে খড়্গ কখন ভাবছ বসে?

ভয়ঙ্করের নিষ্ঠুরতায় মনে নেই সংশয়,
ওই চেয়ে দেখ রক্তের স্রোতে দেবতার পরাজয়।
করছে ঘোষণা কলুষিত মনে ঘৃণ্য ধর্মালয়,
আত্ম-প্রসাদ লাভ ক'রে তা'তে দানিতেছ পরিচয়?
তোদের সাথে তোদের দেবতা ঘৃণ্য পাতকী মূর্তি,—
"সম্পাত-বাণী" বিফল হবে না, হবেই হবে তা'র পূর্তি।

ভারত চায় অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ,

এ্যাডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট

প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদ থাকে। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং মানুষের প্রকৃতিকে ভিত্তি করে এই মতবাদ গড়ে ওঠে এবং তাদের আলোক-নির্দেশে দেশের অর্থনীতি ও শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হলে তা ফলপ্রসূ হয়। এজন্য প্রয়োজন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শাসকদের গভীর জ্ঞান ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে শাসকদের এই বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দেশের মাটিতে যে অর্থনীতি ও রাজনীতির বীজ বা শিকড় থাকে, দেশের অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থায় সেই নীতিই মূর্ত হয়ে ওঠে। এজন্যই দেখা যায়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী, চীন ও রাশিয়া অর্ধ-সাম্যবাদী এবং ভারত পুরোপুরি সাম্যবাদী দেশ। অর্ধ-সাম্যবাদী দেশ আধুনিক সাম্যবাদী দেশ বলেই পরিচিত। পুঁজিবাদীরা সব সময়েই চায় দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হোক। রাজনীতি অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বভাবতই পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত। আধুনিক সাম্যবাদীরা রাষ্ট্রের মাধ্যমে দেশের সম্পদের উপর সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। কাজেই চীন রাশিয়া প্রভৃতি

আধুনিক সাম্যবাদী দেশের শাসনব্যবস্থায় একক ক্ষমতার অধিকারী কোন শাসক নেই। সেখানে ক্ষমতা যৌথ সংস্থার উপর অর্পন করা হয়েছে। পুরোপুরি সাম্যবাদীরা চায় সম্পদের সুষম বন্টন বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এজন্যই নিখাদ সাম্যবাদী দেশ ভারত রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক সংসদীয় গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি এবং বিচার বিভাগীয় অণুবীক্ষণকে সংবিধানের মৌলিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—ভারত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থক হলেও এই দেশ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে বা রাষ্ট্রের হাতে সম্পদ পুঁঞ্জীভূত হওয়ার বিরোধী। ভারতের এই নীতি মনোবিজ্ঞান সম্মত। মানুষ সহজাত গুণ বা প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী মানুষের বিকাশের জন্য সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা অপরিহার্য। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই গুণের পার্থক্য দেখা যায়। স্বভাবতঃই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবস্থা ব্যক্তিগত গুণাবলী বিকাশের সম্যক উপযোগী নয়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজেই তার বিকাশ। আবার ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। কাজেই ভারত ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই উন্নতি কামনা করে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে সম্পদ পুঁঞ্জীভূত হলে দেশের কোটি কোটি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ঘটে না—সমাজের উন্নতি হয় না। কাজেই ভারত চায় সম্পদের সুষম বন্টন বা বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি।

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে ভারত ব্যক্তির উন্নতিকে সমাজের উন্নতি এবং সমাজের উন্নতিকে ব্যক্তির উন্নতি মনে করে। বক্তি এবং সমাজ একই টাকার এপিঠ এবং ওপিঠের মতো। ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে এই অভেদ জ্ঞানই সাম্যবাদ। পৃথিবীতে একমাত্র ভারতই নিখাদ

সাম্যবাদী দেশ। ভারতীয় সাম্যবাদ সুপ্রাচীন। চীন ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশ পুরোপুরি সাম্যবাদী নয়। কারণ, আধুনিক সাম্যবাদ রাষ্ট্রের উন্নতিকেই উন্নতি জ্ঞান করে। ব্যক্তির উন্নতিকে পৃথকভাবে গুরুত্ব দেয় না। এই মতবাদ একদেশদর্শী এবং অমনস্তাত্ত্বিক। ভারতে ব্যক্তি এবং সমাজ অভিন্ন। কাজেই সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা ভারত প্রতিটি নাগরিককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশ শাসনের সুযোগ দিতে চায়। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের এই নীতি মূলতঃ দেশের বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ-নীতিরই প্রতিফলন।

ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে—একটি দেশে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ। অপরটি, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের নিজস্ব অর্থনীতির ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা। ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ভারতীয় কংগ্রেসও তার জন্মলগ্ন থেকেই জনগণকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা দেশে সাম্যবাদী-সমাজ ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেসী সরকার ভারতের বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি অনুসরণ না করে দেশের স্বার্থান্বেষী মহল বিশেষ করে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে নিখাদ সাম্যবাদী ভারতে খাঁটি পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চালু করার জন্য মার্কিন ধাঁচের পুঁজিপতি-ঘেঁষা অর্থনীতি অনুসরণ করে চলেছেন এবং এই বিদেশী অর্থনীতির ফলে দেশে সব কিছু বিগড়ে গিয়ে ঘণীভূত অর্থনৈতিক সঙ্কট, সীমাহীন দারিদ্র্য, বল্গাহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারী এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা প্রভৃতি বহুমুখী সমস্যা দেখা দিয়েছে। এটা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না গত তিন দশক ধরে সরকার যে অর্থনীতি অনুসরণ করে

চলেছেন, তারই পরিণতিতে গোটাকয়েক পরিবারের হাতে এত সম্পদ পুঁঞ্জীভূত হয়েছে যা এই দেশের পোড়া কপালে আর কখনও হয়নি। এ অবস্থা আর বেশী দিন চলতে দিলে যিনি বা যে দলই ক্ষমতায় আসুন না কেন, দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকবে এই গোটা কয়েক ভাগ্যবান পরিবারের হাতে। কারণ অর্থ ই রাজনীতির চালিকা শক্তি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা একই হাতে কেন্দ্রীভূত হলে দেশ বা জাতির ভাগ্য বিপর্যয়কর অবস্থায় এসে দাঁড়াবে। একই হাতে ক্ষমতার এই মিলন দেশের পক্ষে অশুভ লক্ষণ।

দেশবাসী এখন তীব্র দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছে। দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, বাড়ছে বৈষম্য। ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরীব আরও গরীব। এই অর্থ নৈতিক বৈষম্য থেকে সামাজিক বৈষম্যও বাড়ছে। সততা, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং দেশপ্রেম প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর পরিবর্তে অর্থ ই যে আজ সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হচ্ছে তা কে না জানে? জারজ সন্তানের মতো দেশে কালো টাকার সৃষ্টি হয়েছে। এই কালো বা চোরা টাকার চোরাকারবারীরাই আজ সমাজের চূড়ামণি।

ভারতের মাটিতে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির বীজ বা শিকড় রয়েছে। কংগ্রেসী সরকার প্রতিশ্রুত বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি অনুসরণ না করে মার্কিন মুল্লুক থেকে ধনতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি আমদানি করেছেন। এটা দেশের পক্ষে শুধু অপমানকর নয়, বিশেষভাবে ক্ষতিকর। আমাদের সরকার অনুসৃত অর্থনীতির লক্ষ্য বড় বড় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য বিত্তবানদের লাভের সুযোগ বাড়ানো এবং রাজনীতির লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য অধিক ক্ষমতা কব্জা করে রাখা। এই দুটি লক্ষ্যই ভারতীয় আদর্শ ও পরিবেশের পরিপন্থী। কাজেই দেশের সর্বোত্তম স্বার্থে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সরকারের অর্থ নৈতিক

ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুগামী।

জনসাধারণের নিপীড়নের মধ্য দেশে অল্প কয়েকজনই সমৃদ্ধ হয়েছেন। জনসাধারণ আজ দারিদ্রভারে কুব্জ ও ন্যুব্জ। আমাদের সরকারের অর্থনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য দূর করে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনা। ক্ষুধা থেকে মুক্তি দারিদ্র্য থেকে মুক্তিই তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সার্থক করে তুলতে পারে। জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টন বা বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি দ্বারাই তা সম্ভব। আমাদের সরকার জনস্বার্থে পুঁজিপতি তোষণকারী বিদেশী অর্থনীতি বর্জন করে স্বদেশের বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি অনুসরণ করলে ভারতে বর্তমান বহুমুখী সমস্যা বিশেষ করে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান হবে—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পাত্র-পাত্রী

(পরিণয় সংঘটন বিভাগ)

পরিচালনায়—বি. দেবনাথ

৫২/৬ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০৩৬

পাত্রী—সুন্দরী স্কুল ফাইনাল অনুত্তীর্ণা বয়স ২১/২২ উচ্চতা (৫'-২") গৃহকর্মে নিপুণা। ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পূর্ব নিবাস। শ্রীহরিপদ দেবনাথ। ৪৭ ডাঃ কুমুদ সরকার রায় রোড, কলিকাতা-৩২।

পাত্র—২৪ স্কুলফাইনাল পাশ ব্যবসা নিজস্ব, ঐ পাত্রী ১২ ক্লাশে পাঠরতা লাবণ্যময়ী সু-উপায়ী পাত্র চাই পত্রদ্বারা যোগাযোগ করুন। বসন্ত কুমার নাথ ১/১৫ পোদ্দার নগর কলোনী কলিকাতা-৭০০০৬৮।

পাত্রী—(২২ বছর) (৫') এস. এফ. পাশ. সুশ্রী শ্যামবর্ণা গৃহকর্মে নিপুণা, সূচীশিল্পে পারদর্শিনী। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীবলাই চন্দ্র নাথ ২৮/১এ, কলিমুদ্দিন সরকার লেন, বেলেঘাটা, ক'লকাতা-৭০০০১০।

পাত্রী—(২৮) পি, ইউ ফেল, সুশ্রী, স্লিম ফিগার, গৃহকর্মে নিপুণা চাকুরী বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। যোগাযোগ করুন — শ্রীপ্যারী নাথ ভারতী, ১নং কালীবাড়ী রোড, সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলিকাতা-৭০০০৭৫।

পাত্রী—(২২) (৫'-১") উচ্চমাধ্যমিক পাশ নম্রস্বভাবা সুন্দরী সুগঠনা ও সূচীশিল্পে নিপুনা। শিক্ষিত ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জীনিয়ার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীরেবতী রঞ্জন চৌধুরী ৬০/২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৩ ফোন নং ২১-৩২৬০ সকাল ১০টা পর্য্যন্ত, ২৪-৬২৯৭ ও ২৪-৯৪৫৮ সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত।

পাত্র—(২৯) (৫'-৪") বি. কম্ অনুত্তীর্ণ, স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, সুব্যবসায়ী শিক্ষিত বনেদী পরিবার ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। শ্রীবাসচন্দ্র পণ্ডিত ১৩ কাশী ব্যানার্জী লেন, লক্ষ্মীতলা পাড়া, পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া।

পাত্রী—(২৩) (৪'-১০") বি. এস সি. শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ জানা উজ্জল শ্যামবর্ণা মাঝারি গড়ন। শ্রীদেবী চরণ নাথ, ১০৪ রবার্টসন রোড, পোঃ গরিফা, ২৪ পরগণা।

পাত্রী—(২০) (১·৫৫) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী, সঙ্গীত শিক্ষার্থী (৪র্থ বর্ষ) ১৯৮৩ সালে হাঃ সেঃ পরীক্ষার্থিণী। ষ্টীল প্লাণ্ট কর্মীর একমাত্র কন্যা। শ্রী ডি দেবনাথ, ২১/৩ ভারতী রোড, দুর্গাপুর-৫, বর্ধমান।

পাত্র—(২৬) বি. কম, ব্যাঙ্ক কর্মচারী স্লিম ফিগার নিজস্ব বাড়ী পত্রে যোগাযোগ করুন—শ্রীহরিদাস দেবনাথ, সুশীল জ্যোতি এভিনিউ, রবীন্দ্র পল্লী। পোঃ প্রফুল্ল কানন, কলিকাতা-৫৯।

পাত্রী—(১৮ বছর ১৫২ সে. মি.) মধ্যমবর্ণা, সুশ্রী, শান্তস্বভাবা, গৃহকর্মে নিপুণা বি. এ. পাঠরতা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীকুমারেন্দ্রনাথ দালাল, ভদ্রপল্লী, পোঃ+জেঃ বর্ধমান।

পাত্রী—অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসারের কনিষ্ঠা কন্যা (২৬) (৫'-৩") ফর্সা, সুশ্রী, স্বাস্থবতী, বি. এ. অনুত্তীর্ণা, সঙ্গীতজ্ঞা, গৃহকর্মে সুনিপুণা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। ধর্মপ্রাণ পাত্র কাম্য। সত্বর যোগাযোগ করুন। শ্রীহীরালাল দেবনাথ, আদর্শপাড়া, পোঃ—পূর্ববিদ্যাধরপুর শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

পাত্রী—(২৪ বৎসর ২ মাস), বি. এ. সুন্দরী, সুস্বাস্থের অধিকারী। উচ্চতা ৫'-১", পূর্ব নিবাস ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায়। গৃহকর্মে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, ঘোষহাট, পোঃ—কাটোয়া, জিলা—বর্ধমান। (পশ্চিমবঙ্গ) পিন—৭১৩১৩০।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা। আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৯০

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

শ্রীশ্রীশিবগীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শিবভক্ত্যুৎকর্ষনিরূপণম্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূত উবাচ

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং পারং যাস্থথ যেন [illegible]

মুনয়স্তং প্রবক্ষ্যামি ব্রতং পাশুপতাভিধম্॥ ৩৬

কৃত্বা তু বিরজাং দীক্ষাং ভূতিরুদ্রাক্ষধারিণঃ।

জপন্তো বেদসারাখ্যং শিবনাম সহস্রকম্॥ ৩৭

সন্ত্যজ্য তেন মর্ত্ত্যত্বং শৈবীং তনুমবাপ্স্যথ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবাঞ্ছঙ্করো লোকশঙ্করঃ।

ভবতাং দৃশ্যতামেত্য কৈবল্যং বঃ প্রদাস্যতি॥ ৩৮

রামায় দণ্ডকারণ্যে যৎ প্রাদাৎ কুম্ভসম্ভবঃ।

তৎ সর্ব্বং বঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং ভক্তিযোগিনঃ॥ ৩৯

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শিবগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শিবরাঘবসংবাদে শিবভক্ত্যুৎকর্ষ নিরূপণং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

অনুবাদ :—

সূত বললেন—হে মুনিগণ। যার দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের পারগামী হওয়া যায়, সেই পাশুপাতব্রত কীর্তন করছি, শ্রবণ করুন। ৩৬॥ বিরজা-দীক্ষা গ্রহণ করুন এবং বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করে বেদসার শিবনাম সহস্রবার জপ করুন। ৩৭॥ তাহলে মনুষ্যদেহ পরিহার করে শৈব-দেহ লাভ করবেন। আর তাহলেই লোকহিতৈষী ভগবান শঙ্কর প্রসন্ন হয়ে আপনাদের দেখা দেবেন এবং কৈবল্য-মুক্তি প্রদান করবেন। ৩৮॥ কুম্ভসম্ভব (মহাতপা অগস্ত্য) দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্রকে যে সকল উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তা সমস্তই আপনাদের সামনে কীর্তন করছি, ভক্তিসহকারে শ্রবণ করুন। ৩৯॥

[ক্রমশঃ

অনুবাদক—সু. নাথ

সম্পাদকীয়

বর্তমানে অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবারে পুত্র-সন্তানদের যথাসময়ে উপনয়ন-সংস্কার হচ্ছে না; অনেক পুত্র-সন্তান আবার অসংস্কৃতই থেকে যাচ্ছেন। এই অবস্থা প্রায় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে। তবে রুদ্রজ শ্রেণীর মধ্যে এটা একটু বেশী মাত্রায় দেখা যাচ্ছে।

যুক্তি হিসেবে ঐ সব পরিবারের নবীনরা, হয়তো, ধরে নিয়েছেন,—হিন্দু সমাজে জাতিভেদ-প্রথার বিলোপ-সাধন প্রয়োজন; আর ব্রাহ্মণদের উপনয়ন-সংস্কার বর্জন জাতিভেদের সেই বিলোপ-সাধনে সহায়তা করবে।

হিন্দু-সমাজে জাতিভেদের বিলোপ-সাধন প্রয়োজন, অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেটা কিভাবে হবে সেটাই প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সকলেই শূদ্র হয়ে যাবেন, না কি ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলেই ব্রাহ্মণ হবেন?

কোন সংস্কার-সংস্কৃতিকে বর্জন করে অন্য কোন সংস্কার-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে হলে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টকে বর্জন করে সর্বশ্রেষ্ঠকে গ্রহণ করাই শ্রেয়। আবার ব্রাহ্মণের সংস্কার-সংস্কৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নেই। সুতরাং ব্রাহ্মণের সংস্কার-সংস্কৃতি গ্রহণ করে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলেরই ব্রাহ্মণ হয়ে যাওয়া উচিত।

হিন্দু-শাস্ত্রে আছে,—আদিতে, সত্যযুগে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন; কালক্রমে জাতিভেদের উদ্ভব হয়েছে। তাহলে শাস্ত্রানুযায়ী দেখা যাচ্ছে,—ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলেরই আদি-পুরুষ ব্রাহ্মণ। কাজেই,

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলের ব্রাহ্মণ হয়ে যাওয়া একেবারে অশাস্ত্রীয় হবে না।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের শূদ্র হওয়া অধোগতি ; আর ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের ব্রাহ্মণ হওয়া উর্ধ্বগতি। অধোগতি নয়, উর্ধ্বগতিই কাম্য। আবার উর্ধ্বগতিই প্রগতি। তাই, প্রকৃত প্রগতিশীলতার দিক থেকেও ব্রাহ্মণ মাত্রেরই উচিত, অন্যদের আকৃষ্ট করার জন্য স্ব-সংস্কার-সংস্কৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ হওয়া।

তাই, রুদ্রজ সহ সকল শ্রেণীর সকল ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতিই আবেদন,—আপনাদের পরিবারে পুত্র-সন্তানদের, যথাসময়ে উপনয়ন দিয়ে, সংস্কৃত করুন ; আপনারা কোন পুত্র-সন্তানকেই অসংস্কৃত রাখবেন না।

রাজকীয় ও স্বাধীনতোত্তর ত্রিপুরা রাজ্যে শৈবনাথতান্ত্রের উপাদান

ডক্টর এন. সি. নাথ

অধ্যক্ষ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

(মাঘ সংখ্যার পর)

রাজমালা-য় দেওড়াই প্রসঙ্গে—

আমাদের অনুমান রাজমালার দেওড়াই এবং আমাদের দেওড়ি[১] একই সম্প্রদায়। রাজমালা-য় দেওড়াই সম্পর্কে সমষ্টিগত ও, ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গ আছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

রাজমালা-র ত্রিপুর খণ্ডে চতুর্দশ দেবপূজা প্রসঙ্গে দেওড়াই শব্দের প্রথম অবতারনা। তাহাতে দেখা যায় দেওড়াইগণ সমুদ্রের দ্বীপ নিবাসী এবং চতুর্দশ দেবতার পূজায় অভ্যস্ত।

> চতুর্দশ দেব পূজা করিব সকলে।
> আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী হইলে॥
> …পূজাবিধি দেওড়াই সবে তাকে জানে।
> সমুদ্রের দ্বীপে তারা রহিছে নির্জনে॥ (পৃ. ১৫-১৬)

ত্রিপুররাজ ত্রিলোচন তথা হইতে দেওড়াই পুরোহিত আনয়নের জন্য দূত প্রেরণ করেন এবং পরবর্তীকালে মন্ত্রীসহ স্বয়ং-ই তথায় গমন করেন—

> একা ত্রিলোচন রাজা শিবের আজ্ঞায়।
> দেওড়াই আনিবারে দূতকে পাঠায়॥
> সমুদ্রের দ্বীপেতে দেওড়াই রহিছে।
> চতুর্দশ দেবপূজার শিবে আজ্ঞা দিছে॥

১। নামান্তর দেওড়া, দেওদার ইত্যাদি। Dalton কৃত Descriptive Ethnology of Bengal, পৃ. ৩৮, ৭৮, ৮৫, ১৪১ দ্রষ্টব্য।

....দূতের সাক্ষাতে তারা দৃঢ় করি কয়।
আপনে আসিলে রাজা যাইব নিশ্চয় ॥
এই বাক্যশুনি দূতে আসিল তৎপর।
শুনিয়া চলিল রাজা সঙ্গে মন্ত্রীবর ॥
বহু দিনান্তরে রাজা সে দ্বীপ পাইল।
চণ্ডাই দেওড়াই সবে আগু বাড়ি নিল ॥
দেওড়াই, গালিম, পূজক তারা যাত।
সবে আসি দেখিলেক ত্রিলোচন পাত ॥
...শুভদিনে দেওড়াই রাজার সহিতে।
রাজধানী আসিলেক মন হরষিতে ॥
চতুর্দশ দেবতাকে সমর্পিল রাজা।
তদবধি দেওড়াই নিত্য করে পূজা ॥[১]

দেওড়াইগণ চতুর্দশ দেবতার পূজাবিধি অবগত ছিলেন। তাই তাঁহাদিগকে এই পূজার জন্য আনয়ন করা হয়। তাঁহারা এই পূজা করিয়াও আসিতেছেন। কিন্তু এই পূজাবিধি তাঁহারা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহাদের এই বিদ্যা গুরুমুখী-ই রহিয়া গিয়াছে। মনে হয় তাহারা এই বিদ্যাকে অত্যন্ত গুহ্য ব্যাপার মনে করিতেন। রাজমালা বলেন—

চতুর্দশ পূজাক্রম তারা সবে জানে।
পাঁচালীতে না লিখিল অন্যে পাছে শুনে ॥[২]

চতুর্দশ দেবতার প্রথম পূজানুষ্ঠানে অর্জিত দেবতারা সকলেই স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেবল বিষ্ণু ছিলেন অনুপস্থিত। তদ্দর্শনে

১। রাজমালা, ত্রিলোচন খণ্ড, পৃ. ২৬ ২৮।
২। ঐ পৃ. ২৮।

প্রধান পুরোহিত চণ্ডাই রাজাকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে বিষ্ণুসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

চণ্ডাই আসিছি প্রভু, রাজা রহে দ্বারে।
বার্ষিক পূজন নাথ পূজিবার তরে॥
....তথাতে চলেন যদি প্রভু দয়াময়।[১]

চণ্ডাইর প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু পূজা গ্রহণ করিতে আসিলেন। এই কাহিনীতে বিষ্ণুর অনুপস্থিতি ব্যাপারটা লক্ষণীয়। অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, ইহা ত্রিপুর রাজগণের শৈবধর্ম প্রীতিরই ইঙ্গিত বহন করিতেছে।

চতুর্দশ দেবতার এই পূজায় যে সমস্ত বলি প্রদান করা হয়, তাহাতে রাজা, দেওড়াই ও চণ্ডাই তিনেরই ভূমিকা ছিল। রাজা স্বহস্তে তিনটি বলি দেন। অন্যান্য বলি ছেদন করেন দেওড়াইরা। আর চণ্ডাই বলিকার্যে জলের ধারা প্রদান করেন। এই নিয়ম প্রচলিত হয়—

তিন বলি নৃপতিএ স্বহস্তে ছেদিব।
তিন দেবতা ভিন্ন রুধিরে তর্পিব॥
অন্য যত বলি সব মণ্ডপ বাহিরে।
চণ্ডাই দিব ধারা, দেওড়াই ছেদ করে॥[২]

শুধু পশুবলি নহে, ত্রিপুরায় নরবলিও প্রচলিত ছিল। চতুর্দশ দেবতা এবং ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর সম্মুখে নরবলি প্রদত্ত হইত। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে অবস্থিত। বর্তমানে ইহা "মাতাবাড়ী" নামে খ্যাত।[৩] ইহা প্রসিদ্ধ ৫১ পীঠের

১। রাজমালা, ত্রিলোচন খণ্ড পৃ. ৩০।
২। ঐ পৃ. ৩১-৩২।
৩। ইহাই ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। উদয়পুর শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে, সাব্রুম সহরগামী রাস্তার পার্শ্বে নাতি উচ্চ শৈল খণ্ডে অবস্থিত। তবে শাক্ততীর্থ ও বলি বহুল হওয়াতে সকলের আকর্ষণীয় মনে হইবে না।

অন্যতম। দেবীর দক্ষিণপদ এখানে পতিত হইয়াছিল। যথা পাঠমালাতন্ত্রে—

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী।
ভৈরবঃ ত্রিপুরেশশ্চ সর্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ॥

(ত্রিপুরায় দেবীর দক্ষিণ পদ পতিত হয়। এই স্থানেই ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী নামক মহাপীঠ। তাহা ছাড়া এখানের ত্রিপুরেশ্বর ভৈরবও সর্ব অভীষ্ট প্রদায়ক)।

রাজমালাতে আছে—

সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে।
ত্রিপুরাসুন্দরী খ্যাতি ত্রিপুর ভূমিতে॥
ত্রিপুরেশ নাম শিব ত্রিপুরা রাজ্যেতে।
সে ঔরসে ত্রিলোচন ত্রিপুর পত্নীতে॥[১] *

[ক্রমশঃ

১। রাজমালা, দৈত্য খণ্ডে পৃ ৯। (বা ত্রিপুরানাথ) শিবের ঔরসে মহারাজ ত্রিপুরের বিধবা মহিষীর গর্ভে রাজা ত্রিলোচনের জন্ম হয়।* ইনি শিব-গোত্র এবং শিবপ্রধান চতুর্দশ দেবতার পূজক।

---

* রুদ্র বা শিব থেকে উৎপন্ন রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান ত্রিলোচন প্রজা-পীড়ক ত্রিপুরকে উৎখাত করার পর ত্রিপুর-মহিষীকে মাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন—এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কাব্যরূপ দিতে গিয়েই বোধ হয়, 'রাজমালা'র কবি শিবের ঔরসে ত্রিপুর-পত্নীর গর্ভে ত্রিলোচনের জন্মের কথা বলেছেন। —সম্পাদক

॥ গোরক্ষাবতার মস্তনাথ ॥

এস. ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাল্যলীলা—বালক মস্তনাথ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে পিতা সুবল তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে পাঠাইলেন। যোগ প্রভাবে সর্ববিদ্যা যাহার অধীত, যিনি মানবগণকে শিক্ষা দিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাহার মন বশীভূত হইবে কেন? বালক মস্তনাথ বিদ্যালয়ে না গিয়া প্রতিবেশী বালকদের সঙ্গে সারাদিন খেলা করিয়া দিন কাটাইয়া দিতেন। সমবয়সী বালকেরা তাহাকে মস্তনাথ না বলিয়া মস্তমিতা বলিয়া ডাকিত। এদিকে পিতা সুবল পুত্রের লেখাপড়া কিছু হইবে না নিশ্চয় করিয়া রাখাল বালকদের সঙ্গে তাঁহাকে আপন গরু চরাইবার কার্যে নিযুক্ত করিলেন। মস্তনাথ রাখাল বালকদের সাথে গরু চরাইতে যান। পথে পথে বালকদের সাথে খেলিয়া বেড়ান। সবাই সর্বত্র মস্তনাথকে দেখেন, আর তাঁহার পিতাকে সংবাদ দেন। পিতা রাখাল বালকদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে মস্তমিতা তো তাহাদের সহিত পাচন হস্তে সারাদিন গরু চরাইয়াছে। গ্রামস্থ বালকেরা বলে যে তাহারা তাহাদের মস্তমিতাকে সারাদিন গ্রামের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে খেলা করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। সংশয় নিরসনের জন্য পিতা সুবল একদিন নিজেই গোচারণে গিয়া দেখেন মস্তনাথ সযত্নে গরু চরাইতেছে; গ্রামে ফিরিয়া দেখেন গ্রামস্থ বালকদের সঙ্গে মস্তনাথ খেলা করিতেছে। সংশয়চিত্তে পুনরায় গোচারণে গিয়া দেখেন বালক মস্তনাথ যথারীতি রাখাল

বালকদের সহিত গরু চরাইবার কার্যে ব্যাপৃত। পিতার আর বুঝিতে বাকি রইল না যে এ বালক সামান্য বালক মাত্র নহে, এ এক দেবদুলাল।

এক নিদাঘ দ্বি-প্রহরে প্রখর রৌদ্রে অতিশয় তৃষ্ণার্ত হইয়া রাখাল বালকেরা গরু লইয়া গ্রামে ফিরিতে চাহিলে তাহাদের মস্তমিতা বলিলেন, 'তোম'দের গ্রামে ফিবিবার প্রয়োজন নাই, আমি এখানেই জল আনায়ন করিয়া দিতেছি।' বালক মস্তনাথ উর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকাইলেন, সহসা আকাশে একখণ্ড মেঘের উদয় হইল; দেখিতে দেখিতে প্রবল বর্ষণ শুরু হইয়া গেল। গরুগুলি ও রাখাল বালকেরা সেই জলে পিপাসা নিবারণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিল। এই সংবাদ মস্তনাথেব পিতার নিকট পৌছিতে বিলম্ব হইল না। পুত্র সম্বন্ধে এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতা সুবলের মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অব্যক্ত বেদনায় তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এহেন পুত্রকে কি তিনি চিরদিন বক্ষে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন।

অপব এক নিদাঘ অপরাহ্নে রাখাল বালকেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইলে তাহাদের মস্তমিতা একটি ক্ষুদ্র ভাণ্ডে সামান্য দুগ্ধ দোহন করিয়া রাখাল বালকদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিরসন করিয়া দিলেন অথচ ভাণ্ডটি পূর্ববৎ দুগ্ধে পূর্ণই রহিল। সেই সময় ঐ পথে দূরদেশাগত এক বরযাত্রীর দল যাইতেছিল, তাঁহারাও অনুরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। বালক মস্তনাথ ঐ ক্ষুদ্র ভাণ্ডের সামান্য দুগ্ধ দ্বারাই সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। বিস্মিত বরযাত্রীর দল গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামবাসীগণকে এই সংবাদ প্রদানে বিলম্ব করিলেন না। বালকের পরিচয় জানিয়া তাঁহারা বেবারী গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বালক মস্তনাথও সেই সময় গরু লইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। বালকের দিব্য কান্তি ও

মুখে দেবদুর্লভ এক অপার্থিব জ্যোতি দর্শন করিয়া বরযাত্রীর দল সকলেই তাঁহাকে সশ্রদ্ধে প্রণাম জানাইতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না।

এইরূপ বিভিন্ন অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়া বালক মস্তনাথের জীবনের কয়েকটি বৎসর কাটিয়া গেল। মস্তনাথের বয়স এখন দ্বাদশ বৎসর। রাখাল বালকদের সাথে গরু চরানো এখন আর ভাল লাগে না। তিনি এখন তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে চান। গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সীমায়িত না রাখিয়া বিশ্বের সম্মুখে নিজেকে প্রকটিত করিতে চাহেন।

রেবারী সুবলের পার্শ্ববর্তী গৃহে মিশ্র উপাধিধারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করিতেন। একদিন মধ্যরাত্রে দ্বার খুলিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া মিশ্র মহাশয় দেখিলেন যে রেবারীর দেবগৃহ-প্রাঙ্গনে অগ্নি জ্বলিতেছে। উৎসুক হইয়া কিয়ৎ সন্নিকটবর্তী হইলে দেখিতে পাইলেন যে দেবগৃহ-প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসীর ধুনি জ্বলিতেছে, এক বালক ব্রহ্মচারী ধুনির সম্মুখে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া যুবা বৃদ্ধ কয়েকজন যোগীপুরুষ বসিয়া আছেন, বালক ব্রহ্মচারী কি যেন বলিতেছেন আর সকলে সাগ্রহে তাহা শ্রবণ করিতেছেন।

নিশি প্রভাত হইতে না হইতেই মিশ্র মহাশয় রেবারী গৃহে আসিয়া উপস্থিত। তিনি সুবলকে ডাকিয়া বলিলেন,—'কল্য তোমার গৃহে যে কয়জন যোগীপুরুষ আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে যে বালক ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন, তাঁহারা কোথায়? একবার দর্শন করিতে চাই'। সুবল বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—'কৈ আমাদের গৃহে তো কোন যোগীপুরুষের আগমন ঘটে নাই; আপনি এ সংবাদ কাহার নিকট পাইলেন'? মিশ্র মহাশয় পূর্ব রাত্রের ঘটনাটি বিবৃত করিলেন। দেব-প্রাঙ্গণে যাইয়া দেখিলেন যে তথায় ধুনির অঙ্গারের লেশমাত্রও নেই। আশ্চর্যান্বিত হইয়া মিশ্র মহাশয় বাড়ী ফিরিয়া

গেলেন ; কিন্তু তাহার মন সংশয় দোলায় দুলিতে লাগিল। সেই দিন রাত্রিকালে উৎসুক্যবশতঃ মিশ্র মহাশয় পুনরায় গৃহের বাহিরে আসিয়া সুবলের দেবগৃহ প্রাঙ্গণের দিকে তাকাইতে দেখিতে পাইলেন যে পূর্বরাত্রের ন্যায় সিদ্ধ যোগীপুরুষেরা ধুনির সম্মুখে আসীন বালক ব্রহ্মচারীকে ঘিরিয়া সভা করিতেছেন। তৃতীয় দিবস রাত্রে সুবল-দম্পতিকে স্বগৃহে ডাকিয়া আনিযা অপেক্ষা করিতে বলিলেন। মধ্যরাত্রে পুনরায় সিদ্ধ মহাপুরুষদের সভা অনুষ্ঠিত হইলে মিশ্র মহাশয় সুবল-দম্পতিকে সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখাইলেন। বেবারী সুবল বলিয়া উঠিলেন —'কী আশ্চর্য্য ! বালক ব্রহ্মচারীই তো আমার পুত্র মস্তনাথ।'

শৈব-নাথধর্ম ও দর্শনের রূপরেখা

শ্রীনরেশ চন্দ্র নাথ

মানুষ কি? এর যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া দুস্তর কঠিন, তবে এটুকু বলা যায়—সৃষ্টির দিক থেকে মানুষ হলো সেরা সৃষ্টি এবং স্রষ্টার সবচেয়ে কাছাকাছি।

বলাবাহুল্য, সৃষ্টির আদি প্রভাতে প্রকৃতির কাছে এই মানুষ ছিল নিতান্ত অসহায়। তখনকার মানুষ না জানতো বস্ত্রের ব্যবহার, না জানতো আগুনের। কাঁচা মাংস এবং বনের ফলমূল ছিল তাদের আহার্য। ক্রমে সেই দিনগুলো পেরিয়ে মানুষ আধুনিক সভ্যতায় পা বাড়ালো। শিক্ষার প্রসার ঘটতে লাগলো ব্যাপকভাবে। অজানাকে জানবার ও অদেখাকে দেখবার কৌতূহল হতে লাগলো এবং এই জিজ্ঞাসা দু'টো খাত বেয়ে প্রবাহিত হতে থাকলো। তার একটি হলো—বিজ্ঞান, যা মানুষকে দিয়েছে প্রকৃতির রহস্যকে জানবার ও প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করবার প্রেরণা; তথা জীবনে সুখ-ভোগ ও বিলাসের বৈচিত্র্যময় সুযোগ—যার দৌলতে মানুষ আজ ঊষর মরুকে উর্বর করতে সমর্থ হয়েছে, দূরকে করেছে নিকট এবং অজানা ও অদেখাকে উদ্ঘাটন করে চলেছে, চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। অপরটি হলো দর্শন ও ধর্ম—যার সুতীক্ষ্ণ ও বিশুদ্ধ মনন-ধারা মানুষকে দিয়েছে দেশ-কাল-ব্যবহারিক সীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত বৈচিত্র্যকে পেরিয়ে জগৎ ও জীবনের মূলে অখণ্ড সত্তার সন্ধান।

মুখ্যতঃ দর্শন বলতে বুঝায় মননশীলতাকে আশ্রয় করে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে জগৎ-জীবনের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা। অথবা বলা যায়, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যানুসন্ধান। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে স্পষ্টত কিংবা অস্পষ্টত প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা তিন

ধরনের : যেমন—(১) জগৎ কি ? এর সৃষ্টি কোথা থেকে ? (২) মানুষের স্বরূপ কি ? জগতে মানুষ আসে কোথা থেকে ? মৃত্যুর পর তার স্থানই বা কোথায় ? (৩) জগৎ ও জীবনের সৃষ্টিকর্তা কে ? তাঁর স্বরূপই বা কি ? তাঁর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি ইত্যাদি।

বাস্তবিকপক্ষে, জগৎ-জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে অদ্যাবধি কোন সর্বজনগ্রাহ্য একক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক গোষ্ঠি বা সম্প্রদায় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন ; তাই আমরা শুনি বহুবিধ দর্শনের কথা, যেমন নাস্তিক্য দর্শন, আস্তিক্য দর্শন, বস্তুবাদী দর্শন, ভাববাদী দর্শন, বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি। তাই একের সঙ্গে অপরের দ্বন্দ্ব সদাই বর্তমান। ফলে, কেউ কেউ দর্শনকে "অলস মস্তিষ্কের উর্বর কল্পনা" বলে পরিহাস করেন। বস্তুতঃপক্ষে দর্শন "অলস মস্তিষ্কের উর্বর কল্পনা"-মাত্র নয়। বরং জগৎ ও জীবনের উৎস সন্ধানে দর্শনের অভিসার খুবই যুক্তিযুক্ত। ফল-ফুল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত বিধৃত জগৎ, অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত আকাশ-মণ্ডল মানুষের কাছে যেমন রহস্যময়, মানুষেব নিজের স্বরূপও নিজের কাছে তেমনি রহস্যাবৃত। তাই জগৎ ও জীবনকে জানবার জিজ্ঞাসা মানুষের চিরন্তন ও স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা। সুতরাং এই জিজ্ঞাসার অনুসন্ধানের পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে একটি যথার্থ পদক্ষেপ। তবে রসায়ন, পদার্থ প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠ ভৌত বিজ্ঞানে সার্বজনীন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, এমন কি পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত ঐক্যমত ভৌত বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানকে সার্বজনীনতায় পৌঁছবার সুযোগ দেয় ; কিন্তু দর্শন, আদর্শ-নিষ্ঠ বিজ্ঞানহেতু, জগৎ ও জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে তার প্রাপ্ত ফলাফল সার্বজনীনতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন। বলাবাহুল্য, জগৎ ও জীবনের স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক নিজ নিজ চিন্তাশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্ত

দিয়েছেন—যার ফলেই ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং একের সঙ্গে অপরের মতবিরোধ ঘটছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও লক্ষ্যণীয় ধর্ম ও দর্শন, ত্যাগ, প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সংহত সুন্দর ও সুষমময় করতে সাহায্য করছে। এই সব আদর্শ ব্যতিরেকে ব্যক্তি ও সমাজজীবন আদর্শহীন পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে মহাবিভ্রমের মহানিশায় ঘুরপাক খেত—শান্ত-সুন্দর ব্যক্তি ও সমাজজীবন অসম্ভব হয়ে পড়ত।

আসলে, জগৎ ও জীবনের স্বরূপ নির্ণয় তো ততটা সহজ নয়। ধরা যাক, আমাদের সামনে রয়েছে একখানা "ঘর"—একে যদি বিভিন্ন দিক থেকে লক্ষ্য করা যায়, তবে তার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। আর এই বিশ্বজগৎ ও রহস্যময় জীবনের দিকে নজর দিলে স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পাওয়া সম্ভব। তাই বলে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের জন্য দর্শনকে অনাবশ্যক বা বাহুল্যমাত্র বলা যায় না। আসলে প্রতিটি দর্শনের কেন্দ্রে আছে জগৎ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করবার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক দিক—যার ফলেই দেখা দেয় একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য।

চুলচেরা বিচার বাদ দিলে, এযাবৎ যত দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে তাদের প্রধানতঃ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে—আস্তিক্য বা ভাববাদী দর্শন ও অপরটি নাস্তিক্য বা বাস্তববাদী দর্শন। যদিও উভয়বিধ দর্শনই বৈচিত্র্যময় জগৎ ও জীবনের অন্তরালে অদ্বৈত-তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যে রয়েছে আশমান জমিন ফারাক। বস্তুদর্শন মতে—জগৎ ও জীবনের মূলে রয়েছে জড়-প্রকৃতি এবং এই জড়-প্রকৃতিই জীব-জগতের প্রসূতি। এই মতবাদ জীবনকে মুখ্যত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছে। দেশ-কালে সীমিত জীবনের সুখ-

স্বাচ্ছন্দ ও সামাজিক সাম্য এই মতবাদে কাম্য ও আদর্শ। পক্ষান্তরে আস্তিক্য দর্শন—যা জীবনকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছে—যার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে সুপ্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত দর্শন—যাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি দার্শনিক শাখা-প্রশাখা। যার সিদ্ধান্ত হচ্ছে—জগৎ জীবনের অন্তরালে রয়েছে এক ও অদ্বয় চৈতন্য-শক্তির অবস্থান—যা বহুরূপে অভিব্যক্ত, যার প্রকাশেই পরিদৃশ্যমান জগৎ বা জড়প্রকৃতিও চৈতন্যময়। এই দর্শন মতে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত করে ভোগ থেকে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মোপলব্ধি বা জীবাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার একত্ব উপলব্ধি মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। তদ্রূপ, জগৎ ও জীবনের কারণ, ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক এবং জীবের চরম লক্ষ্য কি হইতে পারে—এ বিষয়ে, শৈব-নাথ-দর্শনের মুখ্য বক্তব্য হচ্ছে—এই বিশ্ব-জগৎ শিব ও শক্তির প্রকাশ। বস্তুতঃ শিব ও শক্তি বলতে বুঝায় এক ও অদ্বয় চৈতন্যময় সত্তার দ্বিবিধ রূপ; যেমন চন্দ্র ও তার কিরণ—অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি। জ্ঞানরূপে যাহা শিব, ক্রিয়ারূপে তাহাই শক্তি। সৃষ্টিকর্তা শিব আপন ইচ্ছায় বহুরূপে ব্যক্ত এবং জীব শিবেরই অংশ বিশেষ। কিন্তু অজ্ঞানতাহেতু জীব সংসারে ইন্দ্রিয় তাড়িত হয়ে আপন শিব স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং সংসারে দুঃখ তাপের আবর্তে আবর্তিত হয়। এই দুঃখ তাপ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে শৈব-নাথ-দর্শনে শিব স্বরূপ উপলব্ধি করাকেই জীবের চরম লক্ষ্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—আধ্যাত্মিক দর্শনের সিদ্ধান্তের উপরেই অবস্থান করছে ধর্মীয় চেতনা-বোধ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "Alter thc end of Philosophy religion begins" অর্থাৎ দর্শনের যেখানে শেষ সেখান থেকেই ধর্মের আরম্ভ। বস্তুত-পক্ষে ধর্ম নিয়েছে—"আধ্যাত্ম দর্শনের" সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ জগৎ ও

জীবনের কেন্দ্রে অবস্থিত "চৈতন্যময় শক্তিকে" উপলব্ধি করবার পথ ও পদ্ধতি ; কিংবা বলা যায়—বহির্মুখী ভোগলিপ্সু মনকে ত্যাগ, সদাচার ও সততার উপর প্রতিষ্ঠিত করে জীবাত্মার অন্তর্নিহিত সনাতন শক্তির স্বরূপ উপলব্ধির প্রক্রিয়া।

শৈব-নাথ-দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবকে শিবে রূপান্তরিত করবার অথবা বলা যায় অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবার যে সাধন পদ্ধতি, শৈব-নাথ-ধর্মে তা মূলতঃ উল্টাসাধন বা কুণ্ডলিনী সাধন নামে খ্যাত। গুরুসান্নিধ্যে এসে মানবদেহে অবস্থানরত সুপ্তা কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত করে জীবকে শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত করার যে সাধনা তাই শৈব-নাথ ধর্ম ও সাধনার চরম লক্ষ্য।

শিবাষ্টোত্তর শতনাম

ধীরেন দেবনাথ এম. এস-সি, বি. এড্.

দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিভুবনেশ্বর।
ত্রিলোচন শূলপাণি পিনাকী শঙ্কর॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু হর পঞ্চানন।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা বিভু নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রুদ্র দিগম্বর।
পশুপতি আশুতোষ দেবকুলেশ্বর॥
ভোলানাথ গিরীন্দ্র গিরীশ লোকেশ।
যোগেশ্বর যোগীন্দ্র ধ্যানেশ যোগেশ॥
ত্রিনয়ন ললাটাক্ষ শম্ভু কৃত্তিবাস।
নীলাক্ষ নীলকান্ত ত্রিজগন্নিবাস॥
শৈলবাসী কৈলাশেশ্বর ভূতেশ ভূপতি।
নিখিলেশ জগদীশ গোলক-নৃপতি॥
বরপ্রদা মঙ্গলময় শৈলেশ সুবীর।
লোকনাথ লোকেশ্বর সুশান্ত সুধীর॥
নীলকণ্ঠ বিষহরি মহামৃত্যুঞ্জয়।
অনন্ত অনাদি ব্রহ্ম অজয় অক্ষয়॥
ডমরু-শিঙ্গাধর হরি দর্পহারী।
নটরাজ নন্দিকেশ মহেশ মুরারী॥
পরমাত্মা সদাশিব পতিত পাবন।
জগন্নাথ ব্যোমকেশ ভয়ভীত সূদন॥
বামদেব ধূর্জটি চির জ্যোতির্ময়।
বৃষধ্বজ বীরভদ্র বীরেশ চিন্ময়॥

সর্বজ্ঞ জ্ঞানেশ্বর নাথ নাথেশ্বর।
পুরুষোত্তম প্রজাপতি পরমঈশ্বর ॥
উমানাথ গৌরীপ্রিয় পার্বতী-বল্লভ।
বিশ্বেশ বিশ্বনাথ করুণার্ণব ॥
জটেশ্বর গঙ্গাধর ভুজঙ্গ ভূষণ।
চিদানন্দ ভর্তৃহর দেব নারায়ণ ॥
একেশ্বর ভগবান অজর অমর।
শাশ্বত সত্য শিব সুন্দর ॥

—(০)—
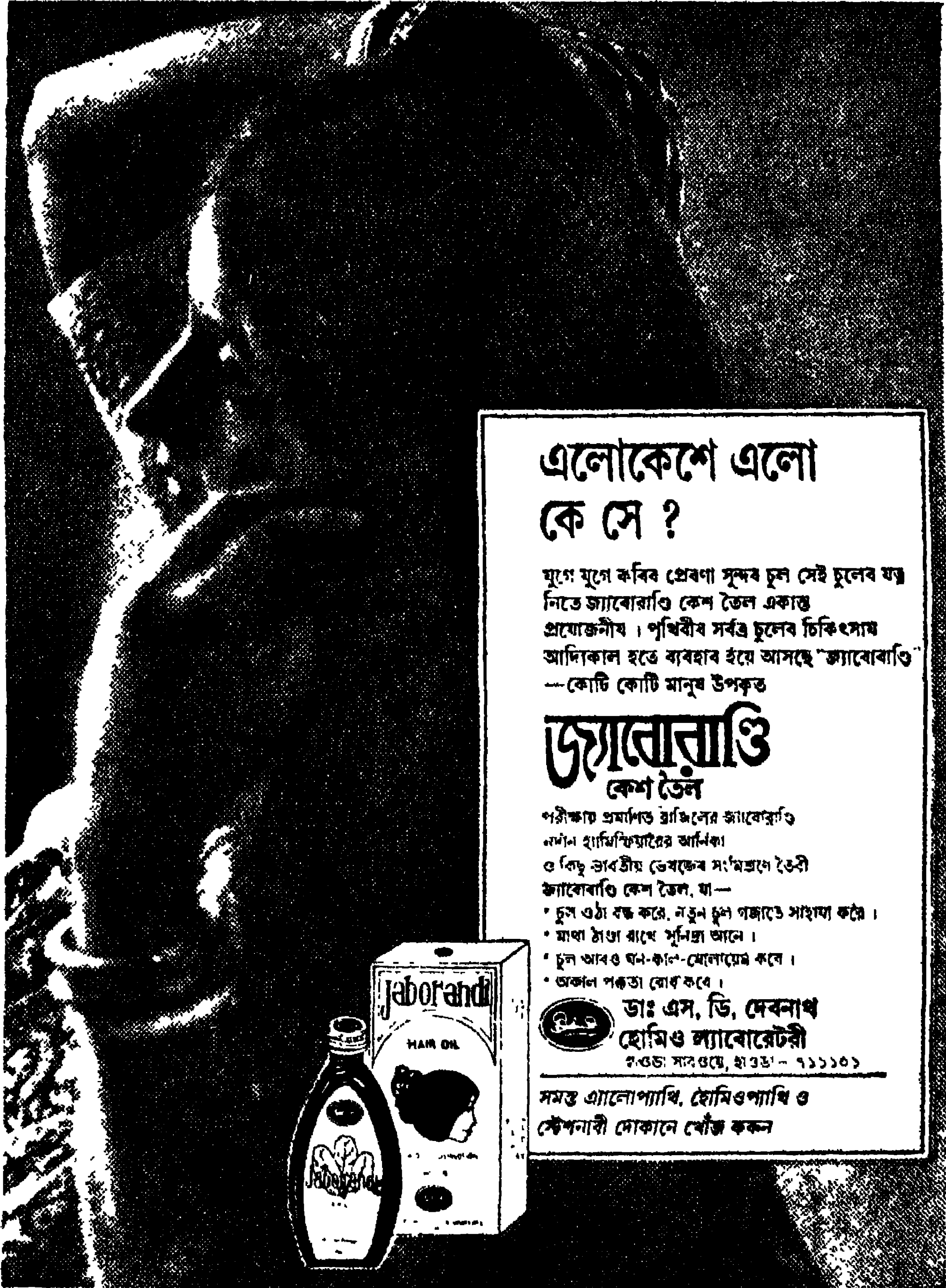
মাতৃস্মৃতি

কুমারী রেবা নাথ

তুমি চলে গেছ ওমা কত কাল আগে,
সতত তোমার স্মৃতি স্মরণেতে জাগে।
তব স্নেহ-ভালবাসা-সোহাগ-আদর,
ভুলিতে না পারি আমি ক্ষণিকের তর।
বাবা-দাদা-দিদি-বৌদি সকলেই আছে,
শুধু তুমি নেই মাগো আমাদের কাছে।
তোমার অভাব প্রতি ক্ষণে অনুভবি,
হারানর বেদনাতে ভুলে যাই সবি।
আজো তুমি দাও দেখা স্বপনের মাঝে,
তোমার চরণ ধ্বনি সদা প্রাণে বাজে।
আসবেনা ফিরে কিগো কোনদিন আর,
ডাকবেনা কভু কিগো রেবাকে তোমার।
সব কিছু আছে তবু কি যেন মা নেই,
দুচোখে অশ্রু ঝরে সেই ব্যথাতেই।
এজগতে মা জননী নেই যার হায়,
তার মত হতভাগা কে আছে কোথায়?
দয়াল বিভুর পদে মিনতি জানাই,
পর জনমেও যেন তোমাকে মা পাই।

—:o:—

এলোকেশে এলো
কে সে ?
যুগে যুগে কবির প্রেরণা সুন্দর চুল সেই চুলের যত্ন নিতে জ্যাবোরাণ্ডি কেশ তৈল একান্ত প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর সর্বত্র চুলের চিকিৎসায় আদিকাল হতে ব্যবহার হয়ে আসছে "জ্যাবোরাণ্ডি" —কোটি কোটি মানুষ উপকৃত
জ্যাবোরাণ্ডি
কেশ তৈল
পরীক্ষায় প্রমাণিত ব্রাজিলের জ্যাবোরাণ্ডি
ও কিছু ভারতীয় ভেষজের সংমিশ্রণে তৈরী
জ্যাবোরাণ্ডি কেশ তৈল, যা—
• চুল ওঠা বন্ধ করে, নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।
• মাথা ঠাণ্ডা রাখে সুনিদ্রা আনে।
• চুল আরও ঘন-কাল-মোলায়েম করে।
• অকাল পক্কতা রোধ করে।
ডাঃ এস, ডি, দেবনাথ
হোমিও ল্যাবোরেটরী
হাওড়া সাবওয়ে, হাওড়া – ৭১১১০১
সমস্ত এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও
স্টেশনারী দোকানে খোঁজ করুন
Jaborandi
HAIR OIL

স্বাধীনতা সংগ্রামী সমাজসেবক
শ্রীকালীপদ পণ্ডিত

অধ্যাপক উমাপদ নাথ

বঙ্গদেশীয় রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-সমাজে একটি বিশিষ্ট নাম শ্রীকালীপদ পণ্ডিত। ব্যক্তিত্বে, চরিত্রে, ধ্যানধারণায় যদিও তিনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তথাপি প্রচারবিমুখ পণ্ডিত মহাশয় হয়তো সকল স্বজাতীয়ের কাছে সুবিদিত নন। কিন্তু, পাছে এমন একটি নাম অনেকের অজ্ঞাতেই হারিয়ে যায়, তাই একরকম তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁর সম্মতি নিয়ে তাঁর এই ক্ষুদ্র জীবনী রচনার প্রয়াস। তাঁকে পরিবেশন করতে গিয়ে তাঁকে ছোট করে ফেলছি কিনা—এ ভয় অবশ্যই আছে। সেজন্য শুধু তাঁর কাছেই নয়, সকল স্বজাতীয় সজ্জনের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি। কারণ, তিনি সকলের।

শ্রীযুক্ত কালীপদ পণ্ডিত মহাশয়ের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত মীরপুর রেল-স্টেশনের নিকটবর্তী খয়েরপুর গ্রামে। পিতা যদুনাথ পণ্ডিত, মাতা গৌরী দেবী। যদুনাথ পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন তাঁর আমলের একজন নিষ্ঠাবান্ সদাচারী খ্যাতিমান পুরোহিত। দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ দেহের অভ্যন্তরে ছিল এক শক্তিমান্ সত্যবান ব্যক্তিত্ব। তাই যদুনাথ ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। মাতা গৌরী দেবীও ছিলেন নিষ্ঠাবতী, সাত্ত্বিক গুণান্বিতা।

কালীপদবাবুর জন্ম ১৩১৪ বঙ্গাব্দে, অগ্রহায়ণ মাসে। হিসাবে, এখন ৭৫ বছর উত্তীর্ণ হয়ে ৭৬ বছরে পদার্পণ করেছেন তিনি। কিন্তু পিতার মতোই সুদীর্ঘ এবং সুগঠিত দেহে এবং মনে এখনও বলের অভাব নেই। পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি, তিনি সুস্থ দেহে

শতবর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকুন এবং জনগণকে সেবামন্ত্রে দীক্ষিত করতে থাকুন।

লেখাপড়ায় মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও, সমাজসচেতন কালীপদ স্কুল-কলেজের দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখাটা অত্যন্ত গর্হিত মনে করেছিলেন। পূজনীয় পিতৃদেবের পৌরোহিত্য কর্মের নিত্য-সহচর হিসাবে কর্ম করে ঐ কর্মে গভীর নিষ্ঠা ও দক্ষতা অর্জনও করেন।

কিন্তু দেশের বৃহত্তর কর্মে ঝাঁপ দেবার জন্য প্রাণ তাঁর আঁকুপাকু করছিল বাল্যকাল থেকেই। সেই দিকেই এগিয়ে গেলেন তিনি। পাবনার বিপ্লবনায়ক রাজেন লাহিড়ীর কাছে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন পণ্ডিতজী। এই রাজেনবাবু ছিলেন কাকোরি ষড়যন্ত্র-মামলার অন্যতম আসামী। তিনি খালাস পেলেও তাঁর অন্যান্য সহকর্মী রামপ্রসাদ, আসফাকুল্লা, রোশন শিং প্রভৃতির ফাঁসি হয়। মামলায় জড়িত হয়েছিলেন পণ্ডিতজীও। তাঁর পক্ষ নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লড়েছিলেন মদীয় পিতৃদেব যতীন্দ্রমোহন নাথ (উনি তখন কুষ্টিয়া কোর্টের উকিল) এবং পণ্ডিতজীকে বেকসুর মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু পণ্ডিতজী স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পথ থেকে ফিরে এলেন না। তদানীন্তন স্বাধীনতাসংগ্রামী নদীয়ার কংগ্রেস-নেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মুক্তিসাধক চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে পণ্ডিতজীর দেশপ্রাণতা ও সংগ্রামশীলতা গেল আরও বেড়ে। আর একজন অগ্রজ দেশসেবককে পেলেন তাঁর প্রেরণাদায়ক হিসাবে। ইনি হলেন ভেড়ামারার কংগ্রেস নেতা বিলাস রায় আগরওয়ালা। ব্যবসায়ী বংশের সন্তান হয়েও বিলাসবাবু ছিলেন ভেড়ামারা অঞ্চলের মুখ্য স্বাধীনতা-সংগ্রামী। নিষ্কাম কর্ম ও ধর্মের বাঁধনে তিনি বেঁধেছিলেন তাঁর দেশসেবার ব্রতকে। গীতাধর্মের

অনুগামী ছিলেন এই বিলাসবাবু। এঁর নিয়ত সাহচর্য পণ্ডিতমশাইয়ের কর্মভিত্তিক ধর্মজীবনের উপরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। আজও বিলাসবাবুকে তিনি গুরু বলে স্মরণ করেন। বিলাসবাবুও একাধিকবার আইন অমান্য করে বৃটিশের কারাবরণ করেন।

এর পর এলো মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক। সে ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন কালীপদবাবু। গ্রেপ্তার হলেন কুষ্টিয়াতে। সেখান থেকে চালান হয়ে এলেন কৃষ্ণনগর সদর জেলে। বিচারে এক বছরের কারাদণ্ড পেলেন পণ্ডিতজী, স্থানান্তরিত হলেন খড়্গাপুরের উপকণ্ঠস্থিত তৎকালীন কুখ্যাত হিজলী জেলে। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের শায়েস্তা করবার জন্যই এই বিশেষ কারাগার।

একবছর পর খালাস হলেন। কিন্তু খালাস হতেই যটক থেকে পুনরায় গ্রেপ্তার হলেন তিনি। এবার বঙ্গীয় নিরাপত্তা আইনে অন্তরীণ রইলেন অন্তরীণ শিবিরে, অনির্দিষ্টকালের জন্য। এই অন্তরীণ জীবনে যে সব সমচেতনার সংগ্রামীদের সাহচর্যলাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ কুস্তিগির ও ছোরা-খেলোয়াড় রঙ্গলাল পাল, প্রখ্যাত সাম্যবাদী গ্রন্থকার ও সাংবাদিক সরোজ আচার্যের অনুজ শ্রীনিশীথরঞ্জন আচার্য প্রমুখ। একটানা অন্তরীণকাল তিন বছর। তিন বছর পরে মুক্তি পেয়েও নিস্তার পেলেন না পণ্ডিতজী। পুনরায় অন্তরীণ হলেন দৌলতপুর (বর্তমান কুষ্টিয়া জেলায়) থানায়। এও চললো একটানা আবার তিন বছর। মুক্তি পেলেন ১৯৪২ সালে। এবার কর্মযজ্ঞের মুখ ঘোরালেন তিনি। এবার আত্মনিয়োগ করলেন নরসেবাযজ্ঞে। অস্পৃশ্যতাবর্জন, দুঃস্থের সেবা, নির্যাতিতের পাশে সক্রিয়ভাবে দাঁড়ানো প্রভৃতি কর্ম হলো তাঁর ব্রত। মানুষকে অন্তরে টেনে নিয়ে অন্তর থেকে তার জাগরণের প্রেরণা বিতরণ করতে লাগলেন তিনি এবার। বিলাসবাবুর অভিপ্রায়-

ক্রমে হলেন ভেড়ামারা মুক্তিসঙ্ঘের সম্পাদক। নির্বিশেষে জনসেবা ও জনকল্যাণ করা ছিল এই সংঘের ব্রত। এই সময়ে সহকর্মী ও বন্ধুরূপে লাভ করলেন জাতিভেদপ্রথা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা পাবনা জেলার বেড়গ্রাম নিবাসী বিপ্লববাদী নেতা 'তরুণের প্রাণ' নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, আর্যসমাজ মন্দিরের আচার্য দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী, সমাজসেবী দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে।

অতঃপর দেশবিভাগের পরে পণ্ডিতজী সপরিবারে এলেন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সদর শহরের নিকটবর্তী দিগনগর গ্রামে। পরিবার আছে, কিন্তু সর্বত্যাগী গৃহ সন্ন্যাসীর পরিবার বলতে যেমন অনুমান করা যায় ঠিক তেমনটিই। আজীবন সকলের জন্যে করেই গিয়েছেন শুধু, নিজের জন্যে আহরণ করেননি কিছুই। বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহে স্বাধীনতাসংগ্রামী তথা রাজনৈতিক নির্যাতিতদের জন্য নির্ধারিত সরকারী পেনশনের ব্যবস্থা হয় তাঁর। বর্তমানে মাত্র দুশো টাকা মাসিক পেনশন পেয়ে থাকেন পণ্ডিতজী। বলা বাহুল্য, পেনশনের হার এখন বেড়ে মাসিক তিনশো টাকা হলেও স্বাধীনচেতা মানুষটি এর জন্যে কাঠ-খড় পোড়ানোকে অমর্যাদাকর মনে করেন। তাই তিনি উপেক্ষিতই রয়ে গেলেন। অবশ্য, নদীয়া জেলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে পণ্ডিতজীর সচিত্র জীবনী আহৃত হয়েছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও সমাজ সেবাকর্ম পূর্বের মতোই অক্ষুণ্ণ আছে। সঙ্গে রয়েছে কুলসূত্রে প্রাপ্ত পৌরোহিত্য। রুদ্রজ ব্রাহ্মণ-সমাজ ছাড়াও অন্যান্য সকল সমাজের লোকের কাছেই পণ্ডিত-মশাই পুরোহিত হিসাবে সমান আদৃত। কিন্তু এক্ষেত্রেও দক্ষিণা অপেক্ষা দক্ষতার প্রতিই তাঁর দৃষ্টি থাকে নিবদ্ধ। তাঁর রচিত অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা ও গীতাশ্রিত নিষ্কাম কর্মের গান এখনও অনেক সভায় ও অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

পণ্ডিতজীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। গত বৎসরে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। কিন্তু সদানন্দময় প্রণবসাধক জনসেবক কালীপদ পণ্ডিতমশাই তেমনি অবিচলিত, তাঁর আরব্ধ কর্মই করে চলেছেন ধর্মজ্ঞানে। তাঁর ক্ষুদ্র গৃহটি শান্তিভূমি ঋষি-আশ্রমের সঙ্গেই তুলনীয়। মাথা গোঁজার জন্য একটা আশ্রয় দরকার, তাই একটি নামমাত্র কুটির রয়েছে মাথা গোঁজার জন্য। একেই বলে যথার্থ যোগী-পুরুষ।

———

পাত্র-পাত্রী

(পরিণয় সংঘটন বিভাগ)

পরিচালনায়—বি. দেবনাথ

৫২/৬ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০৩৬

পাত্রী—(২২) (৫'-১") উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্রস্বভাবা সুন্দরী সুগঠনা ও সূচীশিল্পে নিপুনা। শিক্ষিত ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জীনিয়ার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীরেবতী রঞ্জন চৌধুরী ৬০/২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৩ ফোন নং ২১-৫২৬০ সকাল ১০টা পর্য্যন্ত, ২৪-৬২৯১ ও ২৪-৯৪৫৮ সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত।

পাত্রী—পূর্ব বঙ্গীয় ২১ (৫'-৩") B. A. উজ্জল শ্যামবর্ণা। নম্রস্বভাবা, উত্তম মুখশ্রীযুক্তা, গৃহকর্মে নিপুণা এবং মেসিনে মেয়েদের যাবতীয় সেলাই ও সূচীশিল্পে এবং অন্যান্য হাতের কাজে নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। Shri J. C. Debnath, Qrt. No.—460/VI/Type "B" P. O. Balconagar, Dist Bilaspur, (M. P) Pin—495684

পাত্র—(৩০) (৫'-৮") B. Sc. চলচিত্র শিল্পে পরিচালনায় নিযুক্ত। অন্ততঃ সুশ্রী গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। কোন দাবী নাই। শ্রীমতি আরতি দেবনাথ। পোদ্দার পার্ক, ব্লক—১২ (টি-১) কলিকাতা—৪৫।

পাত্রী—(২৩) অতীব সুশ্রী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, নিখুঁত গঠনা, প্রকৃত রূপসী, স্বাস্থ্যবতী ও কেশবতী। বি-এ পাশের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ঠ সংগীতের পাঠক্রমে শিক্ষারতা, সুকণ্ঠী গায়িকা। সংগীতের অন্যান্য ডিপ্লোমাদিও আছে। সুযোগ পেলে সংগীতের ক্ষেত্রে কিছু অবদান রাখতে পারে। স্বভাবে অতি নম্র ও ধীর এবং সুরুচিবতী ও সুভাষিণী। এর জন্য কলকাতা বা তার নিকটবর্তী স্বগৃহে বাসকারী সংগীতের অধ্যাপক অথবা সংগীতজ্ঞ কিংবা সংগীতপ্রেমিক সুশিক্ষিত সুদর্শন প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। সমরুচিবন্ধনে আগ্রহী পাত্রপক্ষ দয়া করে লিখুন। অধ্যাপক উমাপদ নাথ, কবিকুঞ্জ, কুইকোটা, পোঃ মেদিনীপুর ৭২১১০১।

পাত্রী—(২৩) স্বাস্থ্যবতী, সুলক্ষণা, মধ্যমবর্ণা, মাধ্যমিক পাশ গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে সুনিপুণা, সম্ভ্রান্ত বংশের চাকুরিয়া বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শ্রীএন, এল, ভৌমিক। ১০নং হলধর বর্ধন লেন, কলি-১২, ফোন ৩৫-৭৪৬৪।

পাত্র—(৩৫) বোকারো ষ্টীলপ্লান্টে কর্মরত (১২০০) এর জন্য শিক্ষিতা সুন্দরী সুগঠনা দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই।

এবং

পাত্রী—(২৭) মাধ্যমিক পাশ ফর্সা, গৃহকর্মে নিপুণা রুচীশীলা এবং নম্রস্বভাবা এর জন্য উপার্জনশীল পাত্র চাই। বদলে আপত্তি নাই। শ্রী এ. কে. নাথ। ডুমুরিয়া স্ট্যাণ্ড, ধানবাদ, বিহার, ৮২৬০০১।

পাত্রী—(২৬) (৫ ৩′) এম. এ (পেইন্টিং) দিয়াছে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, রুচিশীলা, গৃহকর্মে নিপুণা। শ্রী নত্য রঞ্জন মহাজন, মহামায়া ফার্মেসী। ৪১ এম. জি. রোড। কলিকাতা—৯

পাত্র—(৫′-৫″) বি. এস. সি ব্যবসায়ী। সুন্দরী সম্ভ্রান্ত বংশের পাত্রী চাই। ফটোসহ পত্রে যোগাযোগ করুন। শ্রীগৌরাঙ্গ চৌধুরী, তেঁতুলতলা, পোঃ আগড়পাড়া, জিলা : ২৪ পরগণা।

উঁচু জমি বিক্রয়

সোনারপুর জংশন ষ্টেশন হইতে ১০/১২ মিনিট দূরে কামরাবাদে ইলেকট্রিক লাইট যুক্ত পাকা রাস্তার পাশে উঁচু জমি একত্রে বা ছোট ছোট প্লটে বিক্রয় হইবে। জমি দেখিয়া দাম স্থির হইবে। স্বজাতির দাবী অবশ্যই অগ্রগণ্য হইবে। নিম্নঠিকানায় পত্র মারফত যোগাযোগ করুন।

ডক্টর কে, এল্, রায়, পি-এইচ ডি
৪/১২এ, বিজয় গড় (4/12A, Bejoygarh),
পোঃ—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা—৩২

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত টাকা**।

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থে রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত'প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার **স্বতন্ত্র**। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

শৈবভারতী

শ্রাবণ ১৩৯০

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

শ্রীশ্রীশিবগীতা

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

বৈরাগ্যোপদেশঃ

ঋষয় ঊচুঃ

কিমর্থমাগতোঽগস্ত্যো রামচন্দ্রস্য সন্নিধিম্।
কথং বা বিরজাং দীক্ষাং কারয়ামাস রাঘবম্।
ততঃ কিমাপ্তবান্ রামঃ ফলং তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১

সূত উবাচ

রাবণেন যদা সীতাপহৃতা জনকাত্মজা।
তদা বিয়োগদুঃখেন বিলপন্নাস রাঘবঃ ॥ ২

নির্নিদ্রো নিরহঙ্কারো নিরাহারো দিবানিশম্।
মোক্তুমৈচ্ছত্ততঃ প্রাণান্ সানুজো রঘুনন্দনঃ ॥ ৩

লোপামুদ্রাপতির্জ্ঞাত্বা তস্য সন্নিধিমাগতঃ।
অথ তং বোধয়ামাস সংসারাসারতাং মুনিঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ—

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈরাগ্যোপদেশ

ঋষিগণ বললেন—হে মহাত্মন্! মহর্ষি অগস্ত্য কেন রামচন্দ্রের নিকট সমাগত হয়েছিলেন? কি ভাবেই বা তিনি রাঘবকে বিরজা-দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন? রামচন্দ্রই বা তাতে কি ফল লাভ করেছিলেন? সেই সমস্ত আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। ১ ॥

সূত বললেন—রাবণ যখন জনক-নন্দিনী সীতাকে অপহরণ করলেন তখন রাঘব বিয়োগ-ব্যথায় আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। ২ ॥ নিরহঙ্কার রঘুনন্দন অনুজের সঙ্গে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে দিবানিশি যাপন করতে লাগলেন এবং আত্মবিসর্জন করাই শ্রেয় বলে বিবেচনা করলেন। ৩ ॥ এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে লোপামুদ্রা-পতি মহামুনি অগস্ত্য শ্রীরামের নিকট আগমন করে সংসারের অসারতা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। ৪ ॥ [ক্রমশঃ

অনুবাদক—সু. নাথ

সম্পাদকীয়

কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন,—শিবের উল্লেখ বেদে নেই; তাই শিব বৈদিক-দেবতা নন। কিন্তু প্রকৃত সত্য তাই কি?

শিবের এক নাম রুদ্র। বেদের কর্মকাণ্ড সংহিতাগুলিতে শিব, প্রধানত, রুদ্র নামেই উল্লিখিত।

সামবেদ-সংহিতায় শিবের উল্লেখ আছে। সেখানে ইন্দ্রের শিব-স্বরূপ লাভের কথা বলা হয়েছে। এই সংহিতার ১৪৫২তম মন্ত্রে বলা হয়েছে,—

"স ন ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদ্ গোমদ্ যবমৎ। উরুধারের দোহতে॥"

—সেই ইন্দ্র শিব-স্বরূপ লাভ করে আমাদের বন্ধুই হন না, আমাদের জন্য অশ্বের মতো গতিশীল ও পয়োবিশিষ্ট উদক এবং বাক্‌যুক্ত ও যবযুক্ত ধন প্রচুর পরিমাণে দোহনও করেন।

শিবের উল্লেখ ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও আছে। রুদ্রই যে শিব, এমন ইঙ্গিতও সেখানে পাওয়া যায়। এই সংহিতায় বলা হয়েছে,—

"স্তোমং বো অদ্য রুদ্রায় শিকসে ক্ষয়দ্বীরায় নমসা দিদিষ্টন।
যেভিঃ শিবঃ স্ববাঁ এবযাবভির্দিবঃ সিষক্তি স্বযশা নিকামভি॥"

(ঋ ১০/৯২/৯)

—অদ্য তোমাদের স্তুতিসকল বিনীত নমস্কারের সঙ্গে শত্রুক্ষয়কারী রুদ্রের উদ্দেশ্যে অর্পণ কর; এগুলির দ্বারা তিনি স্ববান ও স্বযশা হয়ে শিব হন এবং দ্যুলোকে ব্যাপ্ত থাকেন।

রুদ্রই যে শিব সেটা আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যজুর্বেদ-সংহিতায়। এই সংহিতার ৩য় অধ্যায়ের ৫৮, ৬১ ও ৬৩তম মন্ত্রে বলা হয়েছে,—

"অব রুদ্রমদীমহ্যব দেবং ত্র্যম্বকম্। যথা নো বস্যসস্করত্তথা নঃ শ্রেয়সস্করত্তথা নো ব্যবসায়য়াৎ॥······এতত্তে রুদ্রাবসং তেন পরো মুজবতোঽতীহি। অবততধন্বা পিনাকবসঃ কৃত্তিবাসা অহিংসন্নঃ শিবোঽতীহি॥ ···· শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ।"

—আমরা ত্রিলোচন রুদ্রদেবের স্বরূপ জেনে তাঁর সত্ত্বভাব হৃদয়ে স্থাপন করছি, যাতে তিনি আমাদের শক্তি, শ্রেয় ও সকলকাজে সিদ্ধি দান করেন।··········হে রুদ্র, মুঞ্জবান নামক পর্বতে তোমার বাস; তুমি আমাদের অনুগ্রহ কর। হে দেব, ধনুতে জ্যা রোপন করে, আমাদের রক্ষার জন্য, পিনাকপানি হয়ে এস। হে কৃত্তিবাস, তুমি হিংসা না করে শিবরূপে আমাদের কাছে এস। ··········হে পিতা, তুমি বন্ধন-ছিন্নকারী, তুমি শিব-নামে অভিহিত; তোমাকে নমস্কার; তুমি আমাদের হিংসা কোরো না।

বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদেও শিবের উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৭২তম মন্ত্রে ব্রহ্মের আদি অবস্থা পরব্রহ্মকেই শিব-নামে অভিহিত করা হয়েছে,—

"যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ ন সন্ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥"

—(সৃষ্টির প্রাক্কালে) যে সময় অজ্ঞান ও অবিদ্যা ছিল না, সৎও ছিল না অসৎও ছিল না; তখন কেবলমাত্র শিবই বর্তমান ছিলেন। তিনিই অক্ষর-পুরুষ, তিনিই আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষেরও (বিষ্ণুরও) আরাধ্য; তাঁর থেকেই এই প্রাচীন-প্রজ্ঞা প্রকাশিত।

সুতরাং দেখা গেল,—বেদে শিবের উল্লেখ নেই, শিব বৈদিক-দেবতা নন, এমন ধারণা সত্য নয়। শিবের উল্লেখ বেদসমূহে রয়েছে; তাই তাঁকে অন্যতম বৈদিক-দেবতা বলতেই হবে।

রাজকীয় ও স্বাধীনতোত্তর ত্রিপুরা রাজ্যে শৈবনাথতান্ত্রের উপাদান

ডক্টর এন. সি. নাথ

অধ্যক্ষ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

James Long সাহেবের মতে ত্রিপুরার মত এত অধিক নরবলি ভারতের কুত্রাপি বিদ্যমান ছিল না—'In no parts of India were more human victims offered than in Tripura which appears to have been one of the strongest holds of Hindusim'[১] (ত্রিপুরার চেয়ে অধিক নরবলি ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে হইত না। মনে হয় ত্রিপুরা হিন্দুধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুর্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল)। এ সম্পর্কে রাজমালাতে নানা স্থানে অদ্ভুত বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়—

পূর্বেতে ত্রিপুর রাজা নরবলি দিত।
সহস্রে সহস্রে বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত॥
শ্রীধন্য মানিক্য মানা তাহাকে করিল।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল॥
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দশ দেবে।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে॥
দৌচা পাথরে দুই নর শক্র পাইলে হয়।
গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময়॥

১। দ্রষ্টব্য: Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XIX; কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত রাজমালা, ২য় লহর, পৃ. ১০৪, টীকা।

ইহাতে অধিক বলি মানা করে রাজা।
তদবধি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য প্রজা ॥[১]

দেখা যাইতেছে, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বঙ্গ অর্থ বাঙ্গালী বলিরূপে ছিন্নমুণ্ড হইত। শুধু বাঙ্গালী নহে, পাঠান বলিও উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা বিনয় মাণিক্য ষডযন্ত্রে লিপ্ত এক সহস্র অশ্বারোহী এবং বিস্তর পদাতিক পাঠান সৈনিককে চতুর্দশ দেবতার বলিরূপে হত্যা করেন—

তথা চাটিগ্রামে সেই পাঠান বর্বর।
রাজাকে মারিতে যুক্তি করেন অপর ॥
মদ্যপানে পাঠানেব কলহ জন্মিল।
পাঠানের কুমন্ত্রণা তাতে ব্যক্ত হইল ॥
....সহস্র শোয়ার কর্তা পাঠান বিস্তর।
চতুর্দশ দেবতারে দিল নরেশ্বর ॥[২]

চট্টগ্রামের যুদ্ধে বিজয়মাণিক্য গৌড় সেনাপতি পাঠান বীর মমারক খাঁকে বন্দী করেন। চণ্ডাইর প্ররোচনায় তাঁহাকে তদানীন্তন রাজধানী রাঙ্গামাটী (বর্তমান উদয়পুর) হইতে কিয়ৎদূরে অবস্থিত রত্নপুর নামক স্থানে চতুর্দশ দেবতাব সম্মুখে বলি দেওয়া হয়। জনৈক দেওড়াই এই বলিকার্য্য সম্পাদন করেন—

দুর্লভ চণ্ডাই নাম রাজাতে যে কহে।
চতুর্দশ দেব বলি খাঁকে দিব তাহে ॥
নৃপতি এ বলে চণ্ডাই উচিত না হয়।
মমারক খাঁ বড় লোক সর্বলোকে কয় ॥
চণ্ডাই বলে খাঁকে বলি দিবার তরে
দেবতার আজ্ঞা হৈছে বলিল রাজারে ॥

১। রাজমালা, ধন্য মাণিক্য খণ্ড, পৃ. ২৭। দৌচা পাথর—চট্টগ্রামের নিকটবর্তী তীর্থ বিশেষ। এখানে দুইটি নরবলীর কথা বলা হইয়াছে।

২। ঐ, বিজয়মাণিক্য খণ্ড, পৃ. ৪৬।

নিঃশব্দে রহিল রাজা অনুমতি জ্ঞানে।
চণ্ডাই যে খাঁকে নিল রত্নপুর স্থানে॥
রজনী বঞ্চিল খাঁয়ে রত্নপুর গ্রামে।
রাত্রি অবসানে চণ্ডাই দেওড়াই সনে॥
পৃষ্ঠ হস্তে বান্ধি তারে স্নান করাইল।
হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র খাঁকে পৈরাইল॥
চতুর্দশ দেব অগ্রে খাঁকে বৈসায়।
পশ্চিমমুখি হয় সে যে আপন ইচ্ছায়॥
.. খাঁর ভৃত্যে সেই কালে খাঁকে বলিয়াছে
.. স্কন্ধ মেলিয়া দেও পূর্ব মুখ হৈয়া।
এই দেহ ছাড় তুমি শীঘ্র যে করিয়া॥
একথা শুনিয়া খাঁয়ে কলিমা পড়িল।
পূর্ব মুখি হৈয়া খাঁয় স্কন্ধ পাতি দিল॥
চন্তাই খিতুঙ্গ নামে দিল উৎসর্গিয়া।
লিকা দেহড়াই ছেদে বারণা লইয়া॥[১]

এতক্ষণ যতটুকু আলোচনা করা হোল তাহাতে আমরা দেখিলাম দেওড়াইরা চতুর্দশ দেবতার পূজারী, বহিরাগত; তাঁহারা বলি ছেদন কার্য্য করেন; নরবলিও বাদ যায় না। ইঁহারা যতি একথাও রাজমালাতে উল্লিখিত স্পষ্টতঃ ইঁহারা বামাচারী তান্ত্রিক সাধক। [ক্রমশঃ

১। রাজমালা পৃ. ৫০—৫১। এখানে দেহড়াই = দেওড়াই। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি সমূহের ১০ম পঙ্‌ক্তিতে দেওড়াই বানানই আছে। শেষ পয়ারে দেহড়াই এর সাথে চণ্ডাই আছে। তাহাও দেওড়াই এর ইঙ্গিত বহল। গ্রন্থ শেষে সংযোজিত অনুক্রমণিকাতেও দেওড়াই আছে, দেহড়াই নাই। মনে হয় ইহা ছাপার ভুল। বারণা = সম্ভবতঃ হস্তী (বারণ) বলির খড়্গ। শাস্ত্রে হস্তী বলিও বিহিত, উহা মহাবলি নামে খ্যাত। নরবলিকে অতিবলি বলে (দ্রষ্টব্য কালিকাপুরাণ, ৫৬ অধ্যায়)। গোপীচন্দ্রের গানে মহিষ বলির খড়্গকে "মৈষকাটা মৈষাসুর" বলা হইয়াছে।

ধর্ম বনাম বিজ্ঞান

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ., বি. টি.

বর্তমানে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বিজ্ঞানকে নাস্তিক্যবাদী এবং ধর্মকে আস্তিক্যবাদী বলে মনে করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞান ও ধর্ম যেন পরস্পর বিরুদ্ধ; একে অন্যের বিরোধিতায় যেন স্বতোমুখর।

'রাসেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের স্বতোবিরোধ স্বয়ংসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন'। আবার দিলীপ কুমার রায় প্রমুখ সাধকেরা বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদানকে স্বীকার করলেও, আত্মিক উন্নতিতে বিজ্ঞান একেবারেই অচল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এইভাবে ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলে আসছে বেশ কিছুকাল ধরে।

ইদানীংকালে অবশ্য ধর্ম এবং বিজ্ঞানের একটা সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু ধর্মসভাতে বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মব্যাখ্যা করা হচ্ছে; কিছু কিছু রচনাও রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে এবিষয়ে।

এই প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক নিউটন ও আইনষ্টাইনকেও স্মরণ করা যেতে পারে। এঁরা বলেছেন—'সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি জাগায় কে? সৃষ্টির রহস্য। শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস এই অনুভূতিই বলব। যে মানুষ এ অনুভবে সাড়া দিতে অক্ষম, যে সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয় না সে জীবন্মৃত, অন্ধ। জীবনের রহস্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ভয়ের সম্ভ্রম জড়িয়ে থাকলেও, এই অন্তর্দৃষ্টিই ধর্মেরও উৎস। যা আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য তাও যে সত্যি আছে, তারই প্রকাশ যে হয় মহোত্তম প্রজ্ঞায় ও দীপ্ত সৌন্দর্যে ....এই জ্ঞান ও অনুভূতিই যথার্থ ধর্মভাবের মূলে। এইভাবে—কেবল এই ভাবেই —আমি ধর্মাত্মাদের সগোত্র বলে মনে করি নিজেকে।'

এলিসও বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রণোদনার মধ্যে কোন মূলগত বিরোধ দেখতে পাননি। তিনি এই আপাত-বিরোধের জন্য ধর্ম বা বিজ্ঞানকে দায়ী না করে দায়ী করেছেন আমাদের একদেশদর্শিতাকে। 'তাঁর মতে, এ-বিরোধের উদ্ভব হয়েছে শুধু এই জন্য যে, বৈজ্ঞানিকেরা চান ধর্ম-প্রবৃত্তিকে মেরে ফেলে শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তিগুলিকে অতিপুষ্ট করে তুলতে আর ধার্মিকেরা চান যুক্তিকে বাতিল করে নিছক বিশ্বাস ও হৃদয়বৃত্তি নিয়ে ঘর করতে। এর ফলে শেষটায় হয় কি, যখন বিজ্ঞান-সর্বস্ব অধার্মিককে ধর্ম-সর্বস্ব অবৈজ্ঞানিকের পাশে দাঁড় করানো যায় তখন মনে হয় তাঁরা যেন পৃথিবীর দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন পরস্পরের অবোধ্য ভাষায়।'

ধার্মিকদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান-সর্বস্ব মানুষের অভিযোগ,—এঁরা ধর্মের আফিং খাইয়ে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে নির্বীর্য জড়পদার্থে পরিণত করতে চায়, যার ফলে মানব-জাতি অন্ধ-বিশ্বাস-বশত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে, গভীর অন্ধকারে ডুবতে বসেছে। আবার বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে ধর্ম-সর্বস্ব মানুষের অভিযোগ,—এঁরা শুধুমাত্র বৈষয়িক উন্নতির প্রতি-যোগিতায় নামিয়ে মানুষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানিতে মত্ত করে, ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র আবিষ্কার করে মানব-জাতিকে সর্বাত্মক ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছে।

এখন এই অভিযোগগুলো নিয়ে একটু ভেবে দেখা যাক। গভীর-ভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে,—ধার্মিকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা আসলে ধার্মিকদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নয়; আর বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাও প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না।

জীবন, জগৎ ও সভ্যতার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বিজ্ঞানীরা তাঁদের আবিষ্কার করে থাকেন। পরে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ সেই

আবিষ্কারের অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় এবং তার ফলেই জীবন, জগৎ ও সভ্যতায় নেমে আসে সামগ্রিক বিনষ্টির বিভীষিকা। যেমন, বিজ্ঞানের পারমাণবিক-শক্তির আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই শক্তির আবিষ্কার সত্যি সত্যিই জগৎ-সংসারকে ধ্বংসের নিমিত্ত হয়েছিল কি ? এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জগৎ-সংসারের প্রভূত উন্নতি সাধন করা যাবে,—এই চিন্তাই কি বিজ্ঞানীদের মাথায় ছিল না ? পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ কায়েম করার তাগিদেই এই আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে এটোম বোমা তৈরী করে জাপানে ফেলা হ'ল। 'বিজ্ঞানের বিকৃত প্রয়োগেই আজ বিজ্ঞান আত্মঘাতী হতে চলেছে এবং সৃষ্টি করেছে বিভীষিকার'।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পারমাণবিক-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এটোম বোমা তৈরী বিজ্ঞানী ছাড়া সম্ভব নয়; আর এটোম বোমা তৈরীর উদ্দেশ্য বিজ্ঞানীর অজানা থাকার কথা নয়। তবে বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা চলবে না কেন ? এর উত্তরে বলা চলে,—হ্যাঁ, কিছুটা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে করা চলে বৈকি। এক্ষেত্রে গোঁড়ামি কাজ করেছে বলেই মনে হয়। যে কোন গোঁড়ামিই মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। বিজ্ঞানের গোঁড়ামি বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারকে (যিনি আমেরিকায় এটোম বোমা তৈরীর প্রধান নেতা ছিলেন) অমানুষে পরিণত করেছিল। নইলে পরবর্তীকালে তিনি রামকৃষ্ণ-মিশনে বেদান্ত চর্চা করবার জন্য যাতায়াত করবেন কেন ?

এই একই কথা ধর্ম এবং ধার্মিকদের ক্ষেত্রেও বলা চলে। ধর্মের গোঁড়ামিও মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। না হলে অন্ত্যবৈদিক-যুগে, সামাজিক প্রয়োজনে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে, যে বর্ণ বিভাগ করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই বর্ণ-বিভাগকে জন্মগত করে,

অস্পৃশ্যতা আমদানী করে, ভারতের হিন্দু-সমাজকে রাহুগ্রস্ত করে, মানবতাকে লাঞ্ছিত, অবমানিত করা হবে কেন? এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র (আমার জাতিভেদপ্রথা, ধর্মগুরু ও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র প্রবন্ধে) করা হয়েছে।

এছাড়াও, ধর্মের গোঁড়ামির ফলে মানুষ যে অমানুষে পরিণত হয়, তার নজীর মানব-ইতিহাসে দুর্লভ নয়। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী প্রিয়দা-রঞ্জন রায়ের বক্তব্য স্মর্তব্য। তিনি এক জায়গায় বলেছেন,—'ধর্মকে উপলক্ষ করে মানুষের ইতিহাসে যে কত রক্তারক্তি ও নৃশংসতার অভিনয় হয়ে গেছে এবং এখনো অনেক দেশে হচ্ছে এত অস্বীকার করা চলে না। এই ত সম্প্রতি কোথায় কাশ্মীরে হজরত মহম্মদের কেশ চুরি গেছে এই উপলক্ষ করে বাংলাদেশের এক প্রান্তের নিরীহ নরনারী ও শিশুর উপর কত অমানুষিক অত্যাচার হয়ে গেল, কত লোক প্রাণ দিল—একি ধর্মের বিকারের জন্য নয়।'

বিরোধটা ধর্মবেত্তা ও বিজ্ঞানবিদ্‌দের মধ্যে যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে রয়েছে সমর্থক-চেলাচামুণ্ডাদের মধ্যে। ধর্মবেত্তা ও বিজ্ঞানবিদ যাঁরা প্রকৃতই জিজ্ঞাসু ও সত্যান্বেষী তাঁদের মধ্যে কিন্তু কোন বিরোধই দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রিয়দারঞ্জন রায়ের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,—'যাঁরা প্রকৃত জিজ্ঞাসু ও সত্যান্বেষী, তাঁরা বিজ্ঞান-চর্চাই করুন বা ধর্ম-চর্চাই করুন, তাঁদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকতে পারে না; বরং পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায়। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভক্ত বা বিশ্বাসী ছিলেন না মোটেই; বিজ্ঞানেই মানুষের একমাত্র কল্যাণ এ ছিল তাঁর ধারণা। দেশে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য তিনিই প্রথম আয়োজন করেন। কিন্তু পরমহংসদেবের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল গভীর। কথামৃতে এর অনেক নজীর পাই।'।

এই প্রসঙ্গে 'স্বভাবে বুদ্ধিবাদী' কিন্তু 'বিশ্বাস ধর্মে গভীর আস্থাবান' টয়েনবি সাহেবের বক্তব্যও স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,— 'Man has been a dazzling success in the field of intellect and know-how and a dismal failure in the things of the spirit, and it has been the great tragedy of human life on earth that this sensational inequality of man's respective achievements in the non-human and in the spiritual sphere should, so far at any rate, have been this way round; for the spiritual side of man's life is of vastly greater importance for man's well-being (even for his material well-being, in the last resort) than is his command over non-human nature.'

—'বুদ্ধির ক্ষেত্রে ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে খাটানোর বহুবিচিত্র আখড়ায় মানুষের কীর্তি চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও অন্তর্জগতের সন্ধান ও ব্যাখ্যায় সে একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছে। আর আমাদের পার্থিব জীবনের একটি সাংঘাতিক ট্রাজেডি এই যে, মানুষ বাহ্য জগতে ছত্রপতি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্জগতে তার গবেষণা রয়ে গেল নগণ্য— অন্ততঃ আজ পর্যন্ত। এই বৈষম্যকে ট্রাজেডি বলছি এই জন্য যে, মানুষের অন্তিম মঙ্গল বিধানে অধ্যাত্মসাধনার অবদান ঢের বেশী ব্যাপক ও গভীর—শুধু আমাদের অন্তরের আনন্দলোকেই নয়, আমাদের বাহ্য সুখ-শান্তির রাজ্যেও বটে। এই আধ্যাত্ম স্বরাজের মহিমার পাশে বাহ্য প্রকৃতির উপর তার আশ্চর্য কর্তৃত্বের চমকও ম্লান হয়ে যায়।'

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে গিয়ে ধর্মকে পরাবিদ্যা আর বিজ্ঞানকে অপরাবিদ্যা বলা হয়েছে; বলা হয়েছে,—বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সংশয় বা অবিশ্বাস, বিজ্ঞান যুক্তিনির্ভর; আর ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, সে যুক্তির ধার ধারে না। এখন একটু ভেবে দেখা যাক, —সত্যি সত্যি ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে এরকম কোন পার্থক্য টানা চলে কিনা।

[ক্রমশঃ]

॥ গোরক্ষাবতার মস্তনাথ ॥

এস. ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গৃহত্যাগ ও দীক্ষা—অষ্টবিধ যোগৈশ্বর্যে যিনি ঐশ্বর্যবান্ তাঁহাকে পার্থিব ষড়ৈশ্বর্যের মায়ায় বন্ধন করা সম্ভব নয়। সুবল-দম্পতি তাই মস্তনাথকে আর ভোগৈশ্বর্যের মায়ায় আবদ্ধ করিতে চাহিতেন না। এখন হইতে তাঁহারা মস্তনাথকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া মস্তনাথও তাঁহাদের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া সংসার ত্যাগের বাসনা জানাইলেন। আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও সুবল-দম্পতি সন্তানের এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন। শুভদিনে এক শুভ মুহূর্তে বালক মস্তনাথ পিতামাতাকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার কালে পাঞ্জাব প্রদেশের বহর নামক স্থানে নির্জন বনানীর মধ্যে এক সিদ্ধ যোগী-পুরুষের সন্ধান পাইলেন। তাঁহার শিরে জটা, কানে কুণ্ডল, কণ্ঠে নাদবিন্দু, অঙ্গে ভস্ম, দেহের দিব্য জ্যোতিতে বনস্থল উদ্ভাসিত। আগম নিগম বেত্তা মহাযোগবল সম্পন্ন সদা সন্তোষশীল ব্রহ্মচারী এই রমতা যোগী বহর গদীর প্রসিদ্ধ যোগীশ্বর নরমাই নাথ। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সুবল-দম্পতি এই মহাপুরুষের হস্তে পুত্র মস্তনাথকে সমর্পণ করিয়া বিরহবেদন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

১। অষ্টৈশ্বর্য—অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, ব্যাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবশায়িত্ব।

২। ষড়ৈশ্বর্য—সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য।

৩। রমতা যোগী—যে নাথ যোগী অধিক দিন একই স্থানে অবস্থান করেন না।

স্বয়ংসিদ্ধ মহাযোগী হইয়াও যোগী-সম্প্রদায়ের চিরাচরিত প্রথানুসারে মস্তনাথ মস্তক মুণ্ডন করিয়া কর্ণে কুণ্ডল ধারণ ও নাদবিন্দু গ্রহণ করিয়া যোগধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১২৭৬ সম্বতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে মহাযোগী নরমাই নাথ বালক মস্তনাথকে সিদ্ধ ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন, এবং এই বালক মস্তনাথকেই বহর যোগমঠের প্রথম মহান্ত পদে অভিসিক্ত করিলেন। দীক্ষা মাত্রেই বালক মস্তনাথের সকল মায়া মোহ বিদূরিত হইয়া শুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি গাহিয়া উঠিলেন,—

"ঢুড়ন্ দূরি ন যাউ তুম, খোঁজ করো তন্ মাহিং।
ব্রহ্ম অনাদি হৈ তুহী, দুজা কোউ নাহিং"।
"খুঁজিতে যেওনা দূরে, খোঁজ হৃদয়েতে তাঁরে।
তুমি তিনি এক হয়, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নয়।"

পহেবা তীর্থে দ্বাদশ পন্থী যোগিদের নিকট পরিচয় দান

একদা নবীন যোগী মস্তনাথ স্বীয় গুরুর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া গঙ্গা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থল পহেবা নামক প্রাচীন তীর্থ দর্শনে গমন করেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে ঐ স্থানে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী নরনারী ও অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী ও যোগী পুরুষের সমাগম হয় এই পুণ্য স্নান তীর্থে। ঐ বৎসরও বহু সাধু-সন্ন্যাসী, উদাসীন ব্রহ্মচারী ও যোগিগণ নদীর তট ভূমিতে আপনাপন শিষ্য সমভিব্যাহারে ধুনি জ্বালাইয়া আসন পাতিয়াছেন। কেহ যোগাসনে বসিয়া ধ্যানে রত, কেহ গঙ্গার, কেহ বা শিবের স্তব পাঠ করিতেছেন। কোন কোন যোগী নানা যৌগিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেছেন। যোগী মস্তনাথও ইহারই এক পার্শ্বে আসন পাতিয়া ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া

আছেন। নবীন যোগীব দিব্যজ্যোতিতে সে স্থানটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সকলের দৃষ্টি এই যুবক-যোগী মস্তনাথের উপর পতিত হইল। বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগী পুরুষও তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভক্তমণ্ডলী তাঁহার পদরজ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে লাগিল।

মেলার তৃতীয় দিবসে কোন ধনী ব্যক্তির অর্থানুকুল্যে দ্বাদশপন্থী যোগীরা এক ভোজের ব্যবস্থা করেন। ঐ ভোজে যোগদানের জন্য নবীন যোগী মস্তনাথকেও আমন্ত্রণ জানাইবার প্রস্তাব উঠে। তখন কয়েকজন যোগী 'আদেশ-আদেশ' ধ্বনি করিয়া মস্তনাথের নিকট উপস্থিত হন এবং দ্বাদশ পন্থী যোগীদের ঐ ভোজে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। উত্তবে মস্তনাথ স্মিতহাস্যে জানান যে যোগী সম্প্রদায়েব চিরাচরিত প্রথা অনুসারে দ্বাদশ পন্থ হইতে দ্বাদশখানি কম্বল ও দ্বাদশটি দুগ্ধবতী গাভী ভেট স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি এই ভোজে যোগদান করিতে প্রস্তুত আছেন। নবীন যোগীর এইরূপ সাহঙ্কার উক্তি শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। যোগী মস্তনাথ উদাসীনভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে এক প্রবীন যোগী মস্তনাথের নিকট কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— ওহে নবীন যোগী তুমি কাহার নিকট দীক্ষিত? তোমার এইরূপ স্পর্ধাসূচক বাক্য বলিবার অধিকার আছে কি? তুমি কি দ্বাদশপন্থী যোগীদের নিকট সম্মান পাইবার যোগ্য? উত্তরে মস্তনাথ সবিনয়ে বলিলেন—"আমি প্রসিদ্ধ যোগী নরমাই নাথের নিকট দীক্ষিত, গোরক্ষনাথ ও আমি স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, গোরক্ষনাথকে দ্বাদশপন্থী যোগীগণ গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। তবে আমাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিবেন না কেন?" মস্তনাথের এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া
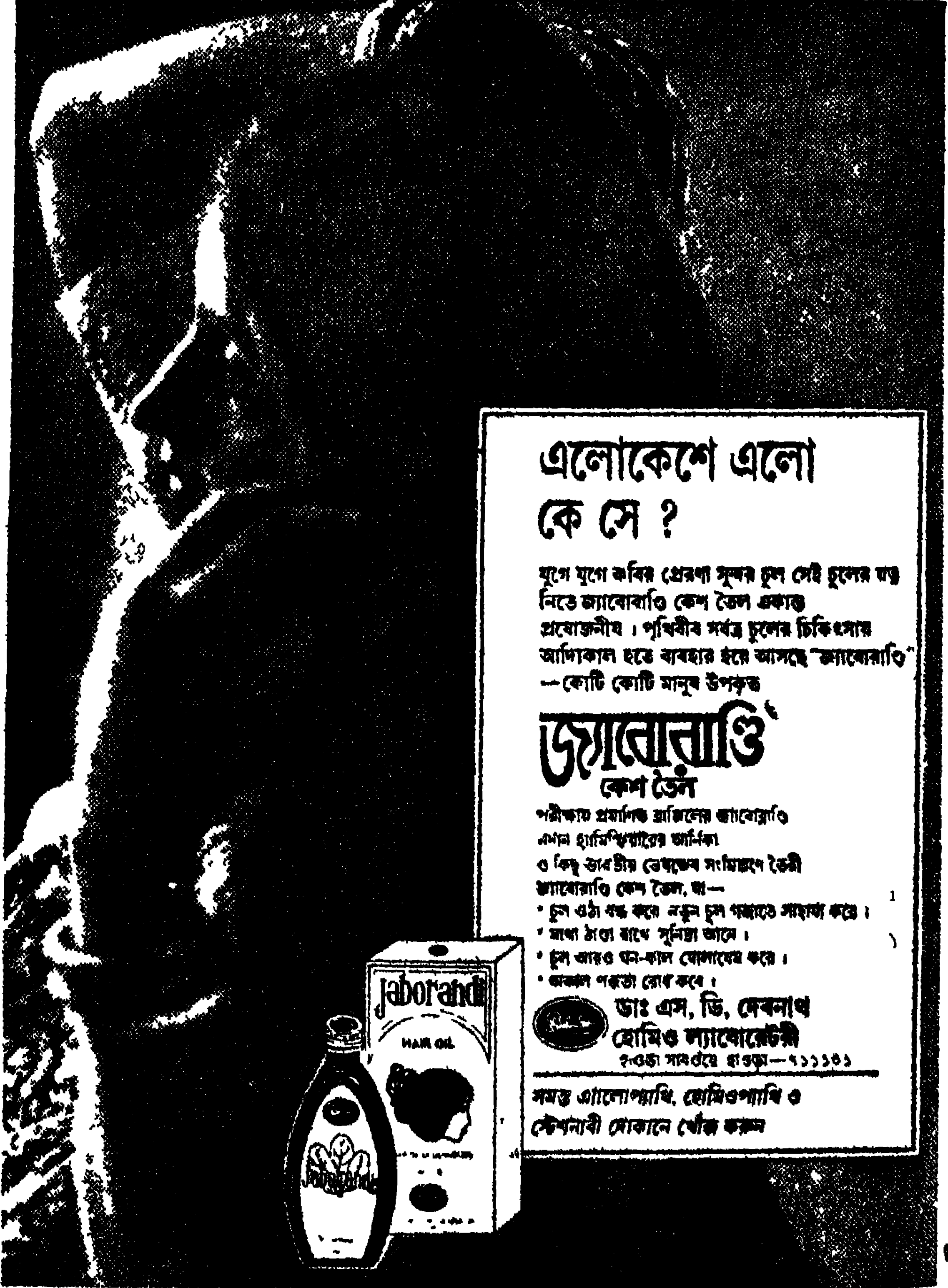
ঐ প্রবীন যোগী,—"তুমি যে গোরক্ষনাথ হইতে অভিন্ন তাহার প্রমাণ দিতে পার ?" উত্তরে মহাতেজস্বী যোগী মস্তনাথ বলিলেন,—"আমি চারি যুগেই বর্তমান, চারি যুগেই আমি যোগীকুলের গুরু। সত্যযুগে আমি শিব, ত্রেতাযুগে আমি শঙ্কর, দ্বাপরযুগে আমি গোরক্ষ এবং এই কলিযুগে আমি গোরক্ষাবতার মস্তনাথ। এই চারি যুগেরই আমি বাহির করিয়া দেখাইতে পারি।" এই কথা বলিয়া তিনি স্বীয় মুখগহ্বর হইতে সত্যযুগের সুবর্ণ, ত্রেতা যুগের রৌপ্য, দ্বাপব যুগের তাম্র এবং কলিযুগের মৃত্তিকার যেলি, মুদ্রা ও নাদ বাহির কবিয়া সকলকে দেখাইলেন। তথাপি উপস্থিত যোগীগণ মস্তনাথকে গোরক্ষনাথের অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা এই অলৌকিক ক্রিয়া কলাপকে হঠযোগের ভেল্কি ও বাজীকবের ইন্দ্রজাল বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। ব্যথিত হৃদয় মস্তনাথ তখন উপস্থিত সকলকে তাঁহার মুখ গহ্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। উপস্থিত সকল যোগীই মস্তনাথের মুখ গহ্বরে সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ ও চরাচব বিশ্ব অবলোকন করিয়া ধন্য হইল। তখন উপস্থিত যোগীগণের মধ্যে অনেকেই মস্তনাথকে গুরু গোবক্ষের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

এই সকল ঘটনার সংবাদ দ্বাদশ পন্থী যোগীদের নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু, তথাপি দ্বাদশ পন্থী যোগীরা মস্তনাথকে যোগাচার্য গোরক্ষনাথের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার সম্মানের জন্যে তাঁহার নিকট ভেট পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না। মস্তনাথ স্বীয় আসনে অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

দ্বাদশপন্থী যোগীদের ভোজের আয়োজন পুরাদমে চলিতেছে; মস্তনাথ ঈপ্সিত সম্মান না পাওয়ায় ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অনন্তর মহাতেজস্বী অমিত যোগবলে বলীয়ান মস্তনাথ

এলোকেশে এলো
কে সে ?
যুগে যুগে কবির প্রেরণা সুন্দর চুল সেই চুলের যত্ন
নিতে জ্যাবোরাণ্ডি কেশ তৈল একান্ত
প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর সর্বত্র চুলের চিকিৎসায়
আদিকাল হতে ব্যবহার হয়ে আসছে "জ্যাবোরাণ্ডি"
—কোটি কোটি মানুষ উপকৃত
জ্যাবোরাণ্ডি
কেশ তৈল
পরীক্ষায় প্রমাণিত ব্রাজিলের জ্যাবোরাণ্ডি
এবং হ্যামিস্ফিয়ারের আর্নিকা
ও কিছু ভারতীয় ভেষজের সংমিশ্রণে তৈরী
জ্যাবোরাণ্ডি কেশ তৈল, যা—
• চুল ওঠা বন্ধ করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।
• মাথা ঠাণ্ডা রাখে সুনিদ্রা আনে।
• চুল আরও ঘন-কাল মোলায়েম করে।
• অকাল পক্কতা রোধ করে।
ডাঃ এস, ডি, দেবনাথ
হোমিও ল্যাবোরেটরী
হাওড়া সাবওয়ে হাওড়া—৭১১১০১
সমস্ত এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও
স্টেশনারী দোকানে খোঁজ করুন
Jaborandi
HAIR OIL

স্বীয় আসনে বসিয়া ইড়া নাড়ি বা চন্দ্র নাড়ি দ্বারা পূরক করিয়া কুম্ভক করতঃ পিঙ্গলা নাড়ি বা সূর্য্য নাড়ি দ্বারা এরূপ বেগে রেচক করিলেন যে দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝঞ্চাবাত্যার সৃষ্টি হইয়া তটস্থ বালুকারাশি সমুদয় স্থানটি অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; নিমিষে নির্মল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রবল বর্ষণ শুরু করিয়া দিল। নগ্নদেহ কৌপিনধারী যোগীগণ প্রবল ঝড়ঝঞ্চায় সীমা রহিল না। অতঃপর মস্তনাথ পিঙ্গলা নাড়ি বা সূর্য নাড়িদ্বারা পূরক করিয়া কুম্ভক পূর্বক ইড়া বা চন্দ্র নাড়িদ্বারা এরূপ বেগে রেচক করিলেন যে নিমেষ মধ্যে মেঘজাল শূন্যে বিলীন হইয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সূর্যের কিরণ এত প্রখর হইয়া উঠিল যে নগ্নদেহ যোগীগণের গাত্রে প্রদাহ উপস্থিত হইল; নদীতীরস্থ বালুকারাশি এতই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল যে তাঁহারা আর তথায় স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখন আত্মরক্ষার্থে ইতস্ততঃ পলায়ন করিবার কালে তাঁহারা দেখিলেন যে মস্তনাথ নগ্নদেহে স্বীয় আসনে নির্বিকার চিত্তে বসিয়া আছেন। তখন তাঁহারা এই সমস্ত মস্তনাথেরই লীলা সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া তাঁহাদের কৃত-কর্মের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মস্তনাথ প্রসন্ন হইলেন, দ্বাদশ পন্থী যোগীগণেরও সকল দুঃখ কষ্টের অবসান হইল।

দ্বাদশপন্থী যোগীদের এই দ্বাদশটি শাখা যোগাচার্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত হইলেও এই দ্বাদশ পন্থের অনেকেই এখন আসল-যোগ সাধন-মার্গ হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। এই সকলকে যোগোপদেশ দিবার জন্য তিনি দ্বাদশপন্থী যোগীদের সকলকেই তাঁহার নিকট ডাকাইলেন। তাঁহার আহ্বানে সকলেই আসিয়া মস্তনাথকে ঘিরিয়া স্ব স্ব আসন পাতিয়া বসিলেন, মস্তনাথ তাঁহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া যোগের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। যোগীগণ সাগ্রহে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ি ত্রয়ের সাধনায় কি কি ফল লাভ হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহা সাধন করিতে হয় তাহা উপস্থিত সকল যোগীগণকে বুঝাইয়া দিলেন। দশদ্বার মুক্ত রাখিয়া কিরূপে মৃত্যুকে জয় করিতে হয় বা মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করিতে হয় তাহারও উপদেশ প্রদান করিলেন। কিরূপে দেহকে লঘু ও সূক্ষ্ম করিতে হয়, কিরূপে দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রুতি জন্মে, কিরূপে স্বীয় দেহ ত্যাগ করিয়া পরকায় প্রবেশ করা যায় যোগের এইরূপ নানা জটিল সাধনার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন সকলে একবাক্যে মস্তনাথকে গুরু গোরক্ষদেবের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া নিজ নিজ নাদ বাজাইয়া "জয় গুরু গোরক্ষনাথ কি জয়" "জয় যোগী মস্তনাথ কি জয়" ধ্বনি করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া গোরক্ষনাথ ও মস্তনাথের স্তব আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনন্তর মস্তনাথ আপন আসন উঠাইলেন। তখন দ্বাদশপন্থী যোগীগণ নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

মুদ্রণ-প্রমাদ সংশোধন

শৈবভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ সংখ্যার সম্পাদকীয়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদে বেশ কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে; ফলে অনুচ্ছেদটির অর্থ সুপ্রকাশিত হতে পারেনি। উক্ত অনুচ্ছেদটির শুদ্ধপাঠ নিম্নরূপ :—

ব্রাহ্মণদের মধ্যে গুরু কুলের জন্য বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবীর প্রচলন হয়। শৈব ও শাক্ত ধর্মের আদি-গুরু-কুলের জন্য প্রচলিত হয় 'নাথ' এই বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবীটি। কালক্রমে সাধারণ-ব্রাহ্মণদের আর একটি অংশও গুরুগিরি আরম্ভ করেন এবং তাঁরা ব্যবহার করেন 'স্বামী' এই বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবীটি। কালান্তরে গুরুকুল গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি আবো দশভাগে বিভক্ত হয়। বৈষ্ণব-ধর্মের আবির্ভাবে যে গুরুকুলের উদ্ভব হয় তাঁরা ব্যবহার করেন 'গোস্বামী' এই বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবীটি। রুদ্রজ-ব্রাহ্মণরা শৈব ও শাক্ত ধর্মের আদি-গুরু-গণের বংশধর। তাই তাঁদের বিশেষ-ব্রাহ্মণ-পদবী 'নাথ বা দেবনাথ'।

নবদেবতা

পার্থ প্রতিম নাথ

সবেমাত্র বৃষ্টি শেষ হয়েছে। রাস্তায় স্থানে স্থ'নে ছোট ছোট জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বিনোদবাবুর আজ খুবই প্রয়োজন অফিসে যাবার। তাই তিনি ইস্তিরি করা ধুতি-পাঞ্জাবী পবে অফিসে যাবেন বলে বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে তাঁর একটা ঢাউসব্যাগ।

বহুক্ষণ ধরে বাস আসছিল না। ফলে অনেক যাত্রী বিনোদবাবুর মত বাসের জন্য চাতক পাখীর মত উৎকণ্ঠিত। কিছুক্ষণ পরেই বহু-যুগের তপস্যালব্ধ অমৃতসম চারচাকা বিশিষ্ট যানটির দেখা মিলল। সবাই যেন অমৃত লাভ করার জন্য উন্মুখ। বিনোদবাবুও প্রস্তুত দেবতাপ্রদত্ত রথে চড়ে স্বর্গে যাবার জন্য। কিন্তু এই নির্মম পাষাণ হৃদয় দেবতা কি এত সহজে ভক্তের ডাকে সাড়া দেবে? কিছুযাত্রী উঠবে, কিছুযাত্রী পারবে না। এই পারল নার দলে হয়তো বিনোদ-বাবুকেও থাকতে হবে। যাকে লাভ করা এক অসামান্য ব্যাপার, তাকে দেবতারূপে কল্পনা করায় অন্যায়ের তো কিছু নেই, তাই তিনি বোধহয় একহাতে ব্যাগটি রেখে আরেক হাতে বাসের দিকে একটা প্রণাম ঠুকে দিয়েছিলেন। বিনোদবাবুর মত হয়ত কিছুদিন পরে বাঙালীরা বাস নামক এক দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য দিনরাত প্রণাম ঠুকবেন।

বাসটি বহু ঝুলন্ত বাদুড় নিয়ে হুড়দাড় করে বিনোদবাবুদের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাস থামতেই সবাইকে বাসে উঠবার জন্য সচেষ্ট হতে দেখা গেল। কিন্তু বেচারা বিনোদবাবুর এটা জানা ছিলনা যে বর্তমান কালে ভীড় বাসে উঠতে গেলে আগে 'লাইফ ইনসিওরেন্স' করতে হয়। তিনি তাঁর ঢাউসব্যাগটি নিয়ে ক্ষুব্ধ শ্বাপদের মতো

বারবার গোঁত্তা মারতে লাগলেন। যাইহোক বোধহয় এ যাত্রায় শিঙের অনুপস্থিতির ফলেই বাসে তার জায়গা হল না। বাসের সামান্যতম জায়গাটুকু না পেয়ে শেষপর্যন্ত লোকের জামাকাপড় পর্যন্ত ধরতে ছাড়েননি।

পরবর্তী বাসের আশায় বিনোদবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ এক অবাধ্য ট্যাক্সি ফ্যাচ করে নোংরা জল ছিটকিয়ে তাঁকে নানা বর্ণে 'বাটিক' প্রিন্ট করে 'সরি' বলার পরিবর্তে একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে বীরদর্পে চলে গেল। এক্ষেত্রে বিনোদবাবুর মৃদুস্বরে বর্তমান বাংলা ভাষার ভাবড় তাবড় শব্দগুচ্ছ এক নিশ্বাসে বলা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলনা।

অনেকক্ষণ পরে বহুদূর থেকে আবেকটি বাসের সামান্য জ্যোতি দেখা গেল। অবশেষে ভক্তের ডাকে দেবতা বহু ঝুলন্ত বাদুড় নিয়ে মর্ত্যে নেমে এলেন। মানুষ যে অবস্থা বিশেষে বাদুড় কিংবা বাঁদর ইত্যাদি বহুরূপ ধারণ করতে পারে তা আরেকবার প্রমাণিত হল।

বাসটি এসে থামতেই বিনোদবাবু ব্যাগটিকে অদ্ভুত কৌশলে গলিয়ে দিয়ে জয় মাকালী বলে অলিম্পিকের একটা লং জাম্প দিয়ে একজন ভদ্রলোকের পায়ের উপর উঠে পড়েন, মূলতঃ তারই ঠেলার জোরে বিনোদবাবু আরো ভিতরে ঢুকে যান, তবে দক্ষিণাস্বরূপ তাঁকে পাঞ্জাবীর বেশ খানিকটা অংশ ত্যাগ করতে হয়।

এই নির্মক্ষিক বাসে সামান্য জায়গা পাওয়া যে কি ভাগ্যের ব্যাপার তা ভাগ্যবান ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না। বিনোদবাবু উপলব্ধি করতে পারলেন যে সেই প্রাচীনকালে দুর্যোধন এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসেন।

কণ্ডাক্টর টিকিট চাইলেন। কিন্তু তিনি দেবেন কি ভাবে? এক হাতে ব্যাগ আরেক হাতে বাসের হ্যাণ্ডেল। ভীড় বাসে হ্যাণ্ডেল

একটি বার ছাড়লে পরে তা ধরবার জন্য যে আরেকটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাঁধাতে হয় তা বিনোদবাবু জানতেন। তাই তিনি হ্যাণ্ডেলটি না ছেড়ে ব্যাগটিকে হাত থেকে ছেড়ে যেই মাত্র নিজের পকেটে হাত দিয়েছেন এমন সময় বজ্রের মত কর্কশ কণ্ঠে কে একজন বলে উঠল— আহ্ দাদা; গন্ধমাদন পর্বত এনে ফেললেন নাকি। আরেকবার তিনি জানালা দিয়ে কিছু একটা দেখবার জন্য যেই মাত্র শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়েছেন, অমনি একটা পনেরা-ষোলো বৎসরের ছেলে বলে উঠল—কি দাদু! উদয় শঙ্করের নেত্য করতে এসেছেন? এরকম একটি কিশোরের ত্রিশ বৎসর বয়স্ক বিনোদবাবু দাদু হয়ে যাওয়াতে রীতিমত চমকে ওঠেন। বিনোদবাবুর মনে হল ভগবান যদি এমন একটা ব্যবস্থা করতেন যাতে হাত পা খুলে বাসে চড়া যেত তাহলে খুব ভালো হত।

অবশেষে বাসটি বিনোদবাবুর অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। বিনোদবাবু যতই নামবার চেষ্টা করেন ততই তাঁকে নবাগত যাত্রীরা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। এই সময় হঠাৎ তাঁর হাত থেকে ব্যাগটি পড়ে যায়, তিনি হাত বাড়িয়ে ব্যাগটি ধরতে গেলে দেখেন যে তাঁর হাতের মুঠোয় একজনের ধুতির কোঁচা। আমার ব্যাগ! আমার ব্যাগ! বলে বিনোদবাবু প্রলাপ না বিলাপ করছেন তা শোনার জন্য কোন শ্রোতাই পাওয়া গেল না। বিনোদবাবু ভীড়ের ঠেলায় একরকম আলুর বস্তার মতোই বাস থেকে গড়িয়ে পড়েন। তিনি দেখলেন যে তাঁর প্রভুভক্ত ব্যাগটি আশ্চর্যভাবে অপর দরজা দিয়ে ভীড়ের সাথে বাস থেকে নেমে এল। এক্ষেত্রে তাঁরা দুজন দুজনকে পেয়ে কি আনন্দলাভ করল তা বলতে না পারলেও সহজেই অনুমেয়।

***

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

শ্রীযদুলাল দেবনাথ
বাইগাছি পাড়া
পোঃ শান্তিপুর, জিলা নদীয়া

শ্রীরমেশচন্দ্র দেবনাথ
গ্রাম চরসরূপগঞ্জ
পোঃ গাদিগাছি
জিলা নদীয়া

শ্রীমাণিক দেবনাথ
প্রযত্নে মাধব দেবনাথ
মালির বাগান
পোঃ বৈদ্যবাটী
জিলা হুগলী

শ্রীমদন দেবনাথ
গ্রাঃ ও পোঃ চরব্রহ্মনগর
জিলা নদীয়া

শ্রীতারাপদ দেবনাথ
ঢাকাপাড়া
পোঃ শান্তিপুর, জিলা নদীয়া

শ্রীরাখালচন্দ্র দেবনাথ
৪৭/১, রায়পুর রোড
কলিকাতা-৭০০০৪৭

শ্রীঅমরচন্দ্র নাথ
পোঃ নবদ্বীপ [রাণীর চড়া]
জিঃ নদীয়া

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী—পূর্ব বঙ্গীয় ২১ (৫'-৩") B. A. উজ্জল শ্যামবর্ণা। নম্রস্বভাবা, উত্তম মুখশ্রীযুক্তা, গৃহকর্মে নিপুণা এবং মেসিনে মেয়েদের যাবতীয় সেলাই ও সূচীশিল্পে এবং অন্যান্য হাতের কাজে নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। Shri J. C. Debnath, Qrt. No.—460/VI/Type "B" P. O. Balconagar, Dist Bilaspur, (M. P.) Pin—495684

পাত্রী—(১৮) (৫'-৩") মাধ্যমিক পাশ, উজ্জল শ্যামবর্ণা। নম্রস্বভাবা সুগঠনা গৃহকর্মে ও সূচীশিল্পে নিপুণা। নজরুলগীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে সংগীতশ্রী ও সংগীত বিষারদ। একমাত্র কন্যা। শিক্ষিত ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জীনিয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীরবীন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লুব সেণ্টার, ২১এ, সাগর দত্ত লেন কলিকাতা-৭০০০৭৩। ফোন নং ২৭-৭২৪৭ সকাল ১০টা পর্য্যন্ত ও রাত্রি ৭-৩০ হইতে ১১টা পর্য্যন্ত, ২৬-৯২২০, ২৬৮৯৫৪ সকাল ১০-৩০ টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত।

পাত্রী—সুন্দরী সুশ্রী স্কুলফাইনাল অনুত্তীর্ণা বয়স ১৯ গান জানা গৃহকর্মে নিপুণা। সুউপায়ী পাত্র চাই। শ্রীসূর্য্য কুমার দেবনাথ, ১১৯/২/১ নিয়োগী পাড়া রোড, কলিকাতা—৩৬

পাত্রী—P. U. পাঠরতা, গান জানে, উজ্জল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী। চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পত্র দ্বারা যোগাযোগ করুন। গুরুদাস ভৌমিক, ২০৭, বি. টি. রোড। কলিকাতা—৩৬

পাত্রী—(২৩) স্বাস্থ্যবতী, সুলক্ষণা, মধ্যমবর্ণা, মাধ্যমিক পাশ, গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে সুনিপুণা, সম্ভ্রান্ত বংশের চাকুরিয়া বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শ্রীনন্দলাল ভৌমিক। ১০নং হলধর বর্দ্ধন লেন, কলিকাতা—১২

পাত্রী—(২২) (৫'-১") উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্রস্বভাবা সুন্দরী সুগঠনা ও সূচীশিল্পে নিপুনা। শিক্ষিত ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জীনিয়ার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীরেবতী রঞ্জন চৌধুরী ৬০/২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৩ ফোন নং ২১-৩২৬০ সকাল ১০টা পর্য্যন্ত, ২৪-৬২৯৭ ও ২৪-৯৪৫৮ সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত।

পাত্রী—(২১) (৫') কুমিল্লার ফর্সা, সুন্দরী, গ্রাজুয়েট। উপযুক্ত চাকুরে পাত্র চাই। যোগাযোগ করুন। শ্রীহরপ্রসাদ দেবনাথ। C/o শ্রীশ্রীদাম কুণ্ডু ৪, ইষ্ট মল রোড, দমদম। কলিকাতা—৭০০০৮০

পাত্র—(২৮) W. B. C. S, সুপুরুষ, সরকারী চাকুরিয়া। পূর্ব নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর, সুন্দরী ফর্সা, রুচিশীল পাত্রী চাই। যোগাযোগ করুন—। শ্রীহরিপদ দেবনাথ। পোঃ—গাইঘাটা, গ্রাম—গাইঘাটা, ২৪ পরগণা।

পাত্রী—(২১) (৫'-২") নম্র স্বভাবা, গৃহকর্মে নিপুণা, স্কুলফাইনাল অনুত্তীর্ণা। পূর্ব নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। উপার্জনশীল উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীহরিপদ দেবনাথ। ৪৭ ডাঃ কুমুদ সরকার রায় রোড। কলিকাতা-৩২।

পাত্রী—(২৬) (৫'-২") অষ্টম মান সুন্দরী সুগঠনা ও গৃহকর্মে নিপুণা। জীবনে প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। গীতা ভৌমিক। পোঃ বাটানগর নিউল্যাণ্ড, বাংলা দাস পাড়া, ২৪ পরগণা।

পাত্র—B. Com অনার্স (পারটওয়ান পাশ) (৫'-৪") (৩৩) সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান সুব্যবসায়ী, শিক্ষিত, বনেদী পরিবার। ফর্সা, শিক্ষিতা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। ফটোসহ যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

এবং

পাত্রী—ঐ ভগ্নী ২১ বৎসর S. F. পাশ। ফর্সা, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য সরকারী চাকুরীরত উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীদাস চন্দ্র পণ্ডিত ১৩, কাশী ব্যানার্জী লেন, লক্ষ্মীতলাপাড়া, পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া।

পাত্রী—(২২), বি. এ. পাঠরতা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা। চাকুরে পাত্র চাই।

এবং

পাত্র—এম. এ., (৩০) (৫'-৬"), সুন্দর স্বাস্থ্যবান ও সুগায়ক, সুন্দরী পাত্রী চাই।

এবং

পাত্র—(২৮) (৫'-৫"), H. S. পাশ, সুচাকুরে, সুন্দর স্বাস্থ্যবান্। সুন্দরী পাত্রী চাই। শ্রীজগদীশ চন্দ্র নাথ। ৪০৬/৮, কল্যাণগড়, পোঃ কল্যাণগড়, জিলা-২৪ পরগণা।

শারদীয়

শৈবভারতী

৩য় বর্ষ | ৫ম সংখ্যা | ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯০

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

শোক সংবাদ

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা এবং হাওড়া পণ্ডিত সমাজের প্রাক্তন সহ-সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন মহাশয় নিরানব্বই বৎসর বয়সে গত ৩১শে শ্রাবণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ বুধবার ইং ১৭ই আগষ্ট ১৯৮৩ তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়া সাধনোচিৎ ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীসুবল চন্দ্র দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

সূচীপত্র

অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্

নমঃ কল্যাণদে দেবি নমঃ শঙ্করবল্লভে।
নমো ভক্তিপ্রিয়ে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে ॥
নমো মায়াগৃহীতাঙ্গি নমঃ শঙ্করবল্লভে।
মাহেশ্বরি নমস্তুভ্যমন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে ॥
মহামায়ে শিবে ধর্ম্মপত্নীরূপে হরপ্রিয়ে।
বাঞ্ছাদাত্রি সুরেশানি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে ॥
উদ্যদ্ভানুসহস্রাভে নয়নত্রয়ভূষিতে।
চন্দ্রচূড়ে মহাদেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে ॥
বিচিত্রবসনে দেবি অন্নদান-রতেঽনঘে।
শিবনৃত্য-কৃতামোদে অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে ॥
সাধকাভীষ্টদে দেবি ভবদুঃখ-বিনাশিনি।
কুচভারনতে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে ॥
ষট্‌কোনপদ্মমধ্যস্থে ষড়ঙ্গ-যুবতীময়ে।
ব্রহ্মাণ্যাদিস্বরূপে চ অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে ॥
দেবি চন্দ্রকৃতাপীড়ে সর্ব্বসাম্রাজ্য-দায়িনি।
সর্ব্বানন্দকরে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে ॥
পূজাকালে পঠেদ্‌যস্তু স্তোত্রমেতৎ সমাহিতঃ।
তস্য গেহে স্থিরা-লক্ষ্মীর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
প্রাতঃকালে পঠেদ্‌যস্তু মন্ত্রজাপ-পুরঃসরম্।
তস্য চান্নসমৃদ্ধিঃ স্যাদ্‌বর্দ্ধমানা দিনে দিনে ॥
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন।
প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাৎ তস্মাদ্‌যত্নেন গোপয়েৎ ॥

ইতি শ্রীঅন্নপূর্ণা-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

—০:*:০—

মহেশ্বরস্তোত্রম্

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
বি.এ., বি.টি., বিদ্যাবিনোদ

ওঁ

শিবং শান্তং শঙ্করং বিশ্বরূপমনন্তং
সর্বব্যাপিনং শম্ভুং নমামি মহেশ্বরম্‌। ১ ।

সর্বভূতান্তরাত্মানং চেতনং নিগূঢ়ং
নিত্যমাদি বিহীনং নমামি মহেশ্বরম্‌। ২ ।

সচ্চিদানন্দরূপমব্যয়ং গুণাতীতং
জ্ঞানাত্মকং শুদ্ধং তং নমামি মহেশ্বরম্‌। ৩ ।

অদ্বৈতমরূপং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং
সত্যং পরমাত্মানং নমামি মহেশ্বরম্‌। ৪ ।

বিশ্বসৃষ্টিবিধায়কং পালকমন্তকং
পরং ব্রহ্ম হরং তং নমামি মহেশ্বরম্‌। ৫ ।

গিরিশং গঙ্গাধরং চন্দ্রচূড়মীশানং
শক্তিনাথং তং বিভুং নমামি মহেশ্বরম্‌। ৬ ।

ভস্মভূষণং যোগীশ্বরং পিনাকহস্তং
দেবাদিদেবং ভবং নমামি মহেশ্বরম্‌। ৭ ।

চন্দ্রার্কবহ্নিনেত্রং ভাস্বরং নীলকণ্ঠং
পঞ্চানন মুমেশং নমামি মহেশ্বরম্‌। ৮ ।

ভবভীতিহরং বিশ্বেশ্বরং মহাদেবং
জগতঃ পিতরং তং নমামি মহেশ্বরম্‌। ৯।

সর্বভূতাধিবাসং দিব্যং হি পরাৎপরং
জ্যোতির্ময়মক্ষরং নমামি মহেশ্বরম্‌। ১০।

সুরা সুরৈর্বন্দিতমখিলদুঃখহরং
ভক্তবৎসলং তং হি নমামি মহেশ্বরম্‌। ১১।

বিশ্বনাথ কৃপাময় প্রসীদ পাহি মাং
প্রভুমাশুতোষং ত্বাং নমামি মহেশ্বরম্‌। ১২।

— — —

সম্পাদকীয়

শরৎ-কালের দুর্গা-পূজা শারদীয়া-পূজা এবং বসন্ত-কালের দুর্গা-পূজা বাসন্তী-পূজা নামে খ্যাত। তবে দুর্গা-পূজা বলতে বাঙালীরা শারদীয়া-পূজাকেই বুঝে থাকেন। এই শারদীয়া-পূজাকে কেন্দ্র করে বাঙালী-হিন্দু-সমাজ মহোৎসবে মত্ত হয়। সেই মহোৎসব উপলক্ষে বঙ্গের চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। বঙ্গে শিল্পী, সাহিত্যিক, সুধীজন সকলের সৃষ্টি-সম্ভার সাজিয়ে-গুছিয়ে শারদীয়া-সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এই রীতিকে অনুসরণ করেই 'শৈবভারতী'র বর্তমান শারদীয়া-সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্ষার পর শরতের আবির্ভাব। বর্ষার অমৃত-ধারার স্পর্শে বঙ্গ-প্রকৃতিতে নবজীবনের সঞ্চার হয়। শরতে, সেই বঙ্গ-প্রকৃতির সর্বাঙ্গে দেখা দেয় নবযৌবনের প্রাণ-চঞ্চল লাবণ্যশ্রী—চারদিকে বয়ে যায় আনন্দ-হিল্লোল। এমন সৌন্দর্য-মণ্ডিত আনন্দ-ঘন মধুময় পরিবেশে বাঙালী-হিন্দু ব্রতী হন মাতৃ-আরাধনায়।

বর্তমান-বছরে বর্ষা প্রায় শেষ। কিন্তু বর্ষার অমৃত-বর্ষণের আগমন-বার্তা এখনো অঘোষিত। বঙ্গ-প্রকৃতির সর্বাঙ্গে এখনো নিদাঘের নিদারুণ দাবদাহ—আকাশ-বাতাস, ক্ষেত-খামার সবই যেন জ্বলছে। এবারের শরতে, বঙ্গ-প্রকৃতিতে নবযৌবনের লাবণ্যশ্রী আসবে কি? মনে হচ্ছে, এবারে, হাজারো-সমস্যায় জর্জরিত বাঙালী-হিন্দু-সমাজে কিছুটা বিষাদঘন পরিবেশে মাতৃ-আরাধনা অনুষ্ঠিত হবে।

আমাদের পাপরাশি, আমাদের শত-সহস্র অন্যায়-অনাচার, বোধ হয়, প্রকৃতির বুকে ঘোর-অনিয়মের সৃষ্টি করেছে—প্রকৃতি, বোধ হয়,

আমাদের প্রতি রুষ্টা হয়েছেন। প্রকৃতির এই রোষ, বোধ হয়, দুরাচার-অবাধ্য-সন্তানের প্রতি মাতৃ-রোষেরই বহিঃপ্রকাশ।

তাই আসুন, আমরা, 'শৈবভারতী'র পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, শুভানুধ্যায়ী, কর্মকর্তা সকলে, শারদীয়া মাতৃ-আরাধনার প্রাক্-মুহূর্তে, দেবীপক্ষের প্রথম-প্রভাতে, মাতৃ-সমীপে আমাদের আকুল-আর্তি জানাই,—

"তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিনি শিবে
কুপুত্রো জায়তে কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥"

নাথাচার্য্য অভিনবগুপ্ত

ডক্টর এন. সি. নাথ
এম এ. (সংস্কৃত), এম. এ. (ইংরেজী), পি. এইচ. ডি. (ভাষাতত্ত্ব),
কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, সাহিত্যশাস্ত্রী
প্রিন্সিপাল, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

সংস্কৃত সাহিত্যে অভিনবগুপ্ত একটি বিখ্যাত নাম। ধ্বন্যালোক নামক অলঙ্কার গ্রন্থের বিখ্যাত টীকা "লোচন" অভিনবগুপ্তের লেখনী প্রসূত। সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র পাঠ করেছেন অন্ততঃ তাঁরা সবাই অভিনবগুপ্তের নামের সঙ্গে পরিচিত।

কিন্তু অতি অল্প লোকেই জানেন অভিনবগুপ্ত নাথ সম্প্রদায়ের* এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর "গুপ্ত" পদবী** দেখে কেউ অনুমানই করতে পারেন না যে তিনি একজন নাথাচার্য্য। কিন্তু তিনি তা-ই ছিলেন। জানি, অনেকেই আকাশ থেকে পড়বেন, কিম্বা হেসে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে যে সব তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার ভিত্তিতেই এ কথা বলছি।

---

* নাথ-সম্প্রদায়ের দুটি বংশ—(১) বিন্দু বংশ ও (২) নাদ-বংশ। বিন্দু-বংশ পিতা-পুত্র-ক্রমে এবং নাদ-বংশ গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় প্রসারিত হয়েছিল। বিন্দু-বংশের নাথগণ যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত ছিলেন।

** 'অভিনবগুপ্ত'-এর 'গুপ্ত', বোধ হয়, পদবী নয়। 'অভিনবগুপ্ত' নাম এবং 'নাথ' তাঁর পদবী। —সম্পাদক

অভিনবগুপ্তের পূর্ণ নাম অভিনবগুপ্ত নাথ। বিভিন্ন গ্রন্থে এই নাথান্ত নাম পাওয়া যায়, যথা—

(১) অভিনবগুপ্ত তৎকৃত 'পর্য্যন্ত পঞ্চালিকা' নামক গ্রন্থের শেষে লিখেছেন—'পরিপূর্ণা কৃতিরিয়ং শ্রীমদ্ আচার্য্য অভিনবগুপ্ত নাথস্য পর্য্যন্ত পঞ্চালিকা নাম' (শ্রীমান্ আচার্য্য অভিনবগুপ্ত নাথের রচিত পর্য্যন্ত পঞ্চালিকা নামক গ্রন্থ সমাপ্ত হল)।

(২) অভিনবগুপ্তের শিষ্য মধুরাজ যোগী তৎকৃত 'গুরুনাথ পরামর্শ' নামক গ্রন্থে ভরত মুনির নাট্য শাস্ত্রের অভিনবগুপ্ত কৃত টীকা 'অভিনব ভারতী'-র প্রশংসাচ্ছলে বলেছেন—'আলোকং দিশতু দিশাম্ অলৌকিকং স নঃ শ্রীমান্ অভিনবগুপ্ত নাথ সূর্য্যঃ'[১] (শ্রীমান্ অভিনবগুপ্তনাথ রূপ সূর্য্য আমাদের দিগ্দর্শনার্থ অলৌকিক আলোক প্রদর্শন করুন)।

(৩) অভিনবগুপ্তের আর এক অনুগামী মহেশ্বরানন্দ (নামান্তর গোরক্ষ) তাঁর 'মহার্থ মঞ্জরী' নামক গ্রন্থে 'আচার্য্য অভিনবগুপ্ত নাথ পাদান্ ……'[২] (আচার্য্যপাদ অভিনবগুপ্ত নাথকে · ….)—এরূপ নাথান্ত নামের উল্লেখ করেছেন।

(৪) মধুরাজ যোগী তাঁর গুরুকে 'নাথ' বলেছেন। এটা 'গুরুনাথ পরামর্শ' নামক গ্রন্থের নাম থেকে বোঝা যায়। আর তিনি নিজেও 'যোগী' পদবীধারী (= নাথ)। অভিনবগুপ্তের নাথত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য প্রমাণও বিরল নয়। তন্মধ্যে তাঁর গুরু পরম্পরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর গুরু ছিলেন শম্ভুনাথ ; শম্ভুনাথের গুরু সোমদেব ; সোমদেবের গুরু সুমতিনাথ। শম্ভুনাথ ব্যতীত অন্যান্য অনেক গুরুর নিকটও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম যথা—বামনাথ,

---

১। গুরুনাথ পরামর্শ, ৫/৪।

২। মহার্থ মঞ্জরী, ২০২।

বিচিত্রনাথ, লক্ষ্মণগুপ্ত নাথ প্রভৃতি। পণ্ডিত মধুসূদন কৌল বলেন, লক্ষ্মণগুপ্ত নাথ অভিনবগুপ্তের পিতা। অবশ্য এমত সকলের সমর্থিত নয়। অভিনবগুপ্ত তাঁর কৃত 'তন্ত্রালোক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লক্ষ্মণগুপ্তনাথের নাম উল্লেখ করেছেন[১]। কিন্তু পিতা কিনা বলেন নি। তন্ত্রালোকে শম্ভুনাথের প্রতি যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হয়েছে, তাতে মনে হয় শম্ভুনাথই ছিলেন অভিনবগুপ্তের আসল গুরু অর্থাৎ তান্ত্রিক সাধনার দীক্ষাগুরু ও উপদেষ্টা। শ্লোকটি এই—জয়তাং জগদুদ্ধৃতিক্ষমোঽসৌ ভগবত্যাসহ শম্ভুনাথ একঃ। যদুদীরিতশাসনাংশুভির্মে প্রকটোঽয়ং গহনোঽপি শাস্ত্রমার্গঃ॥[২] (একক শম্ভুনাথই জগৎ উদ্ধার করতে সক্ষম। ভগবতী সহ শম্ভুনাথের জয় হোক, যাঁর নির্দেশের আলোকে গহন শাস্ত্রমার্গও আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেছে)। ভগবতী শব্দদ্বারা সম্ভবতঃ গুরু পত্নীকে লক্ষ্য করা হয়েছে। তন্ত্রালোকে[৩] ভট্টনাথ নামক অপর এক গুরুর উল্লেখও আছে।

অভিনবগুপ্তের গুরু পরম্পরা

সুমতিনাথ
|
সোমদেব
|
শম্ভুনাথ, লক্ষ্মণগুপ্ত নাথ, বিচিত্রনাথ, ভট্টনাথ প্রভৃতি
|
অভিনবগুপ্ত নাথ
|
মধুরাজ যোগী

এরা সবাই কাশ্মীরে প্রচলিত শৈবমতের আচার্য্য এবং তান্ত্রিক সাধক।

১। তন্ত্রালোক, ১২।৪১৪। তন্ত্রালোক বিষয়ক বিশাল গ্রন্থ। ৩৭ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। জয়রথ কৃত টীকা সহ বহুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

২। **ঐ গ্রন্থ**, ১.৩১।

৩। ঐ গ্রন্থ, ১।১৬; 'শ্রীভট্টনাথ চরণাব্জযুগাৎ……' ইত্যাদি।

এই গুরু পরম্পরা উর্ধক্রমে মচ্ছন্দ বা মীননাথ পর্য্যন্ত প্রসারিত। মৎস্যেন্দ্রনাথ থেকে সুমতিনাথ পর্য্যন্ত নাথাচার্য্যগণের নাম—

১। মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ বা তুর্য্যনাথ

২। তৎপুত্রগণ—অমরনাথ, অলিনাথ, বিন্ধ্যনাথ, গুড়িকানাথ প্রভৃতি

৩। উচ্ছুষ্ম, শবর প্রভৃতি দশজন।

৪। নিষ্ক্রিয়ানন্দনাথ, বিদ্যানাদ নাথ, শিবানন্দ নাথ[১] প্রভৃতি তারপরই সুমতিনাথ।

তন্ত্রালোকের ২৯তম আহ্নিকে খগেন্দ্রনাথ নামক অপর একজন তান্ত্রিক গুরুর উল্লেখ আছে। ইনি কৌলমার্গের গুহ্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে অভিজ্ঞ এবং তান্ত্রিক মণ্ডলে পূজিত ছিলেন। কিন্তু গুরুপরম্পরার কোথায় তাঁর স্থান একথা ঠিক বলা হয়নি। তবে তিনি যে বেশ প্রাচীন তা বোঝা যায়।

যে গুরুপরম্পরা দেখা গেল তা নাথ গুরুপরম্পরা। এই পরম্পরার অন্তর্গত অভিনবগুপ্ত নাথ। তাই তাঁর নাথত্ব সিদ্ধ হল। এবার অভিনবগুপ্তের অন্য একটি নাম বা উপাধির কথা আলোচনা করা যাক। অভিনবগুপ্তকে "যোগিনীভূ" বলা হয়েছে। এর অর্থ যোগিনী সম্ভূত। তাঁর মা যোগিনী* ছিলেন এটা স্পষ্ট।

১। তন্ত্রালোক, ৩।১৯২ এর টীকায় জয়রথ বলেন, শিবানন্দনাথ উত্তরপীঠ অর্থাৎ, কাশ্মীরে তন্ত্র শিক্ষা করেছিলেন ; 'উত্তরপীঠ লব্ধোপদেশাৎ শ্রীশিবানন্দ নাথাৎ……'। তাঁর নামান্তর অবতারক নাথ (তন্ত্রালোক, ৩।১৯৫, টীকা)। সম্ভবতঃ ইনি নূতন মত ও পথের অবতারণা করেছিলেন।

---

* যে নারী সাধনার ক্ষেত্রে যোগ-মার্গ অবলম্বন করেন তাঁকে যোগিনী বলা হয়। প্রাচীনকালে, সাধারণত, সন্ন্যাসাশ্রমে যোগ-মার্গ অবলম্বন করা হ'ত। তবে তখন, যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণরা গার্হস্থ্যাশ্রমে থেকেই যোগ-মার্গ অবলম্বন করতেন। এই যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণের কন্যাকেও যোগিনী বলা হ'ত। —সম্পাদক

কেউ কেউ এই সহজ সরল অর্থটা বাদ দিয়ে অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন[১]—

'Abhinavagupta is called Yoginibhu, because his parents followed the kaula method in their sex-union' (অভিনবগুপ্তকে যোগিনীভূ বলা হয়, কারণ তাঁর পিতামাতা যৌন সংসর্গে কৌল পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন)।

যৌন সংসর্গে প্রক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন করলেই কোন নারী যোগিনী হয়ে যান বলে আমাদের জানা নেই। আর ঐভাবে তার যোগিনী পরিচিতি ঘটবে কি করে? এ সব ত লোকের জানার কথা নয়। মৈথুনাদি যৌন ব্যাপার গুহ্য তত্ত্ব, প্রকাশ্য ঘটনা নয়। তাই বিশেষ যৌন প্রক্রিয়া দ্বারা কেউ যোগিনী হয়ে আছেন কিনা কে বলবে? প্রকাশ্য যোগাভ্যাস, যৌগিক বেশভূষা "অথবা যোগিনায় এব কুলে ভবতি ধীমতান্" অর্থাৎ যোগিকুলে* জন্ম—এগুলোই হচ্ছে যোগী ও যোগিনী পরিচিতির কারণ। অভিনবগুপ্ত-নাথের যুগে[২] দেশে যোগিনীর সংখ্যাও কম ছিলনা। মধুরাজ যোগীর "ধ্যানশ্লোকা" নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে অভিনবগুপ্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'যোগিনী সিদ্ধ সংঘে; আকীর্ণে মণ্ডপে আসীন[৩]........(যোগিনী ও সিদ্ধগণে

১। কান্তিচন্দ্র পাণ্ডে কৃত ইংরেজী গ্রন্থ—Abhinavaguta, P. 590 দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থে অভিনবগুপ্ত সম্পর্কে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটী Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi। থেকে প্রকাশিত। মূল্য ৭৫ টাকা মাত্র।

২। খৃষ্টীয় ১০ম—১১শ শতাব্দী।

৩। ধ্যানশ্লোকা, ১—৪।

---

* 'যোগিকুল' আসলে যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণকুল।

—সম্পাদক

আকীর্ণ মণ্ডপে উপবিষ্ট)। দেখতে পাচ্ছি, অভিনবগুপ্তের স্বকীয় পরিমণ্ডলেই যোগিনী ছিলেন বহু। ঐ যুগেই নাথ সাহিত্যের বিখ্যাত যোগিনীরানী ময়নামতী পূর্বভারতে বিরাজ করতেন। চাঁদ সদাগরও সমসাময়িক ব্যক্তি। পদ্মপুরাণে দেখি, কালীদহে চৌদ্দডিঙ্গা তল হওয়ার পর সর্বস্বান্ত, দিশাহারা চাঁদ সদাগর পথে এক শক্তিশালিনী যোগিনীর সাক্ষাৎ পান এবং যোগিনীর কৃপাতেই চাঁদ স্বগৃহে পৌছতে সমর্থ হন। গোর্খবিজয়েও যোগিনী প্রসঙ্গ আছে। কাজেই অভিনবগুপ্ত এরূপ কোন যোগিনীর গর্ভসম্ভূত হতে বাধা কি? যোগি-সমাজে "ভেক, বারহপন্থ" (দ্বাদশ প্রকার ভেকধারী বা গৃহত্যাগী যোগী) ছাড়াও "যোগী ঘরবারী" (ঘর-দুয়ারী বা গৃহস্থ যোগী)* যথেষ্ট ছিলেন। কোন ধর্মসম্প্রদায়ই গৃহস্থ বিহীন থাকতে পারেনা। অভিনবগুপ্তের মাকে জাত-যোগিনী ধরে নিলে তাঁর জন্মতঃ নাথত্বও সহজলভ্য হয়ে পড়ে। জাত যোগীই জাত যোগিনীকে বিয়ে করে থাকবেন।**

---

* গৃহস্থ-যোগীদের একটি অংশ যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজব্রাহ্মণ। প্রাচীনকালে (যখন গার্হস্থ্যাশ্রমে থেকে যোগ-সাধনার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণেরই ছিল) গৃহস্থ-যোগী বলতে যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণকেই বোঝাতো। পরবর্তীকালে, সন্ন্যাসী-যোগী-গুরুদের উদারতায়, অন্যান্য গৃহস্থদেরও অনেকে যোগ-দীক্ষা গ্রহণ করে গৃহস্থ-যোগী বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

** 'জাত-যোগী' বলতে যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ পুত্রকে এবং 'জাত-যোগিনী' বলতে যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ কন্যাকে বোঝায়। গৃহস্থ যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী যোগী উভয়েই 'নাথ' পদবী ব্যবহার করেছেন। —সম্পাদক

এ পর্যন্ত ইতিবাচক কিছু প্রমাণ উপস্থাপিত হল। এবার নেতিবাচক একটি প্রমাণ দেওয়া যাক। "অভিনবগুপ্ত নাথ" এই নামটি কেউ বলেন না, সবাই কেবল অভিনবগুপ্ত, অভিনব গুপ্ত করেন, যেন তিনি ছিলেন গুপ্তবংশীয় কোন সম্রাট। এই গোপনীয়তা মনে হয় তাঁর নাথত্বের সপক্ষে এক বড় সাক্ষ্য। কেউ চাননা যে খ্যাতিমান অভিনবগুপ্তের নাথ সম্প্রদায়ত্ব ব্যাপারটা জানাজানি হোক। তাই এটা চাপা ছিল। গুণী জ্ঞানী নাথদের ধামাচাপা দিয়ে রাখার একটা প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মেহারের সর্বানন্দ নাথকে শুধু সর্বানন্দ, নাথ তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ, অজিতনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতিকে[১] ঋষভদেব, অজিত, পার্শ্ব ইত্যাদি বলা হচ্ছে। ভারত ইতিহাসের নাথ রাজবংশগুলিকে চেপে রাখা হচ্ছে। কোন বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থে তাদের উল্লেখ নেই কেন? উদাহরণ, বঙ্গদেশীয় ত্রিপুরার "সামন্ত" রাজা লোকনাথ, ভবনাথ, পর্বনাথ প্রভৃতি[২]; কদলীরাজ্য এবং মহানাদের নাথ রাজবংশ, যেখানে নাথগুরু মীননাথ রাজত্ব করেছিলেন; পূর্ববঙ্গ (মেহের কুল) এবং উত্তরবঙ্গে (পাটিকেরা) রাণী ময়নামতী এবং তৎপুত্র রাজা গোপীচন্দ্র ইত্যাদি, নাথ শব্দটাই প্রভুবাচক, এটা খেয়াল রাখা উচিত। এর অনুকরণেই পরবর্তীকালে

১। ঋষভনাথ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, অভিনন্দননাথ, সুমতিনাথ, সুপার্শ্বনাথ, সুবিধিনাথ, শীতলনাথ, শ্রেয়াংসনাথ, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধর্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থুনাথ, অরনাথ, মল্লিনাথ, নেমিনাথ, অরিষ্টনেমিনাথ ও পার্শ্বনাথ— এই ১৯জন তীর্থঙ্কর নাথ উপাধিধারী। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানকে নাথ, নাথপুত্র ও নাথকুলেন্দু বলা হয়েছে (বড্ঢমান চরিউ, দীঘনিকায় অন্তর্গত পাসাদিক সুত্তং, শ্রবণ বেলগোলা শিলালিপি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

২। দ্রষ্টব্য গ্রন্থ: Epigraphia Indica, vol. 15: Tipperah Copper Plate Grant of Samanta Lokanatha.

শঙ্কর সম্প্রদায়ে "স্বামী" এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে "গোস্বামী" উপাধির প্রচলন হয়।

ইতি ও নেতিবাচক প্রমাণপত্র যা উল্লিখিত হল, তাতে আমরা অভিনবগুপ্তকে "অভিনবগুপ্ত নাথ"-এর সংক্ষেপ বলে ধরে নিতে পারি। তাঁর পূর্ণনাম (অভিনবগুপ্ত নাথ) ব্যবহার করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাই। তিনি নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিক সাধক এবং তন্ত্র, দর্শন এবং অলঙ্কার বিষয়ক বহু গ্রন্থের রচয়িতা।[১] কাশ্মীরে ঝিলম (বিতস্তা) নদীর তীরে তাঁর নিবাস ছিল। তিনি ১০ম-১১শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

জয়তু নাথাচার্য্য : শ্রীঅভিনব গুপ্ত নাথ।

১। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তন্ত্রালোক।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা

—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ , বি. টি.

জীবনের যৌবন-লগ্ন থেকেই, রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলা, আমার হৃদয়ে, একটা বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে—জাগিয়ে তুলেছে, আমার মনে, একট জটিল জিজ্ঞাসা। আমি ভেবেছি আর ভেবেছি। আমার কেবলই মনে হয়েছে,—ভগবানের পরম-পবিত্র-লীলা এমন ভাবে বর্ণিত হ'ল কেন?

রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-লীলায় আমরা দেখি,—রাধা আয়ানের ঘরনী। কৃষ্ণের কাছে রাধা পরস্ত্রী; রাধার কাছে কৃষ্ণ পরপুরুষ। আয়ান-ঘরণী রাধার, পরপুরুষ কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়, এই কাহিনীর প্রাণকেন্দ্র। শাশুড়ী জটিলা ও ননদী কুটিলা, এই অবৈধ প্রণয়ে, প্রতি নিয়ত বাধা প্রদান করেছেন, নিয়ত চেষ্টা চালিয়েছেন, রাধাকে কৃষ্ণ-বিমুখ করতে। স্বামী আয়ানের প্রতি রাধার অনুরাগ সৃষ্টি করতে, রাধাকে আদর্শ কুলবধূরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে, তাঁদের চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি। কিন্তু কিছুতেই, রাধাকে কৃষ্ণ-বিমুখ করা যায় নি; যায় নি তাঁকে আদর্শ কুলবধূরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

অনেককে বলতে শুনেছি,—রাধা-কৃষ্ণের এই প্রেম নিষ্কাম-প্রেম অর্থাৎ এই প্রেমে দেহের কোন সম্পর্ক নেই। দৈহিক-সম্পর্ক-হীন-প্রেম অবৈধ নয়—নয় নিন্দনীয়। কিন্তু এই যুক্তি যথেষ্ট নয়। স্বামী-ভিন্ন অপর পুরুষের প্রতি, শুধুমাত্র মনে মনে আকর্ষণ অনুভব করাও, স্ত্রীর পক্ষে, ভয়ানক পাপ বলে ধর্মে নির্দেশিত আছে। অনেকে বলতে পারেন,—ভগবানের লীলার ক্ষেত্রে আবার ন্যায়-অন্যায় কি? এই কথা বলে, বাইরের দিক থেকে, বিভিন্ন প্রশ্নকে আটকে রাখা

যায়; কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলের প্রশ্নের সদুত্তর না দিতে পারলে, এই প্রেম-লীলার প্রতি, প্রকৃত শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগ্রত করা যায় না।

আমার 'সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছি,—সাহিত্যে 'সুন্দরম্'ই আসল কথা; 'সুন্দরম্'কে অবলম্বন করে 'সত্যম্' প্রকাশিত হন সাহিত্যে। সেখানে আরো দেখিয়েছি,—যে সাহিত্যে 'শিবম্' সম্মানিত তাকে সুসাহিত্য, আর যে সাহিত্যে 'শিবম্' পদদলিত তাকে অপসাহিত্য বলা যেতে পারে।

নানা ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলায়, রাধার কৃষ্ণ-প্রেম ক্রমপরিণতি লাভ করেছে সাহিত্য বা কাব্য হিসেবে এই প্রেম-কাহিনী, নিঃসন্দেহে, অপূর্ব রসক্ষরণ করে থাকে। এটা স্বীকার করতেই হয় যে, পাঠক-হৃদয়কে এই কাহিনী, অতি সহজে, রসাবেশে আবিষ্ট করে। আবিষ্ট পাঠক-মন, এ'থেকে, একটা অকৃত্রিম আনন্দানুভূতি লাভ করে, এটাও স্বীকার্য। কাহিনীর অনবদ্যতা, বর্ণনার সাবলীলতা, অলঙ্করণের কারুকার্যতা রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম বিষয়ক কাব্যগুলোর কাব্য দেহকে একটা সুসজ্জিত, লাবণ্যময় সৌন্দর্যশ্রী দান করেছে, সন্দেহ নেই। কাজেই 'সুন্দরম' এখানে যথার্থ অবলম্বন হতে পেরেছেন।

মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে, অবৈধ-পরকিয়া-প্রেমের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, অস্বীকার করা যায় না। এই প্রবণতার বিকাশ ঘটলে, যাত্রা-পথে, যত অবরোধই গড়ে তোলা হোক না কেন, কোন কিছুতেই প্রেমিক-মানুষকে আটকে রাখা যায় না—এটাও সত্যি। কাজেই, খণ্ড হলেও, একটা সত্য এই কাহিনীর মধ্যে সহজেই আবিষ্কার করা চলে। তাই, 'সত্যম্' এখানে অপ্রকাশিত নন।

কিন্তু, আপাতদৃষ্টিতে, 'শিবম্' এখানে নিঃসন্দেহে পদদলিত হয়েছেন। বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হয়, অবৈধ পরকিয়া-

প্রেমকে, আদর্শ হিসেবে, এই প্রেম-লীলায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই আদর্শ অনুসৃত হলে, মানব-সমাজে, একটা বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বিশৃঙ্খল মনুষ্য-সমাজ মানুষের মঙ্গলকর নয়। বিশৃঙ্খল সমাজে মানুষ একটা সামগ্রিক বিনষ্টির দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলে।

কাজেই, যত সুন্দরই হোক না কেন, 'শিবম্'-নিন্দিত কোন কাব্য-সাহিত্য প্রশংসিত হতে পারে না। তবে কি, যে সমস্ত কাব্য-সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই অপসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত?

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার,—রাধা-কৃষ্ণের আপাত-অবৈধ-পরকিয়া-প্রেম-কাহিনী, যে সকল কাব্য-সাহিত্যে পাওয়া যায়, তার সবগুলোই ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। যে ধর্ম, পরকিয়া প্রেমকে অবৈধ বলেছে, নিন্দা করেছে; সামগ্রিক কল্যাণের জন্য, মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলের পাশব-প্রবৃত্তি-প্রসূত পরকিয়া-প্রেম-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, সমাজে, নানা বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে; সেই ধর্মেরই আদর্শ-গ্রন্থে এই রকম কাহিনী—এটা বিস্ময়কর নয় কি? আদর্শস্থানীয় ধর্ম-গ্রন্থে এই রকম পরকিয়া-প্রেমের গৌরব প্রচারিত হ'ল কেন—এমন জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক নয় কি? আমার অন্তঃকরণ রাধা-কৃষ্ণ- প্রেম-লীলার এই নৈতিক প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য ব্যাকুল হয়ে ফিরেছে। আমি কেবল ভেবেছি আর ভেবেছি। কিছু কিছু পড়াশুনাও করেছি। হঠাৎ চমকে গেছি, স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি পাঠ করে। স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন,—"ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে অন্ধের মত কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই ভারতের লোক সাতশ' বছর পরের দাসত্ব করছে।"

ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব। তাহলে, ধর্মীয় বিষয়ের যে বর্ণনা বিভিন্ন

ধর্ম-শাস্ত্রে রয়েছে, তার মধ্যে কি কোন নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে? এই প্রকৃত তত্ত্ব না জানলে কি কেবল দাসত্বই করতে হয়?

চিন্তার মোড় ঘোরে। দৃঢ় প্রত্যয় হয়, নিশ্চয় রাধা-কৃষ্ণের এই প্রেম-লীলার মধ্যে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। এটা নিছক মানব-মানবীর প্রেমের মতো প্রেম-বর্ণনা নয়।

কিন্তু কি সেই নিগূঢ় তত্ত্ব? এই প্রশ্ন আমার চিন্তাধারাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে। আবার স্বামী বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ' আমার সেই বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারাকে একটা সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান দেয়। 'ভক্তি-যোগ'-এর শেষ পরিচ্ছেদের আগের পরিচ্ছেদের নাম "মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমবর্ণনা"।

ভগবৎ-প্রেম অব্যক্ত। ভাষায় সেই প্রেমের বর্ণনা সম্ভব নয়। তবু সাধক ও উপাসকগণকে মাঝে মাঝে সেই প্রেমের আদর্শ ও লক্ষণ নির্দেশ করতে হয়। আর তা করতে গিয়ে তাঁরা ব্যবহার করেন মানবীয় ভাষা। ভিন্ন ভিন্ন মানবীয় প্রেমকে অব্যক্ত ভগবৎ-প্রেমের প্রতীকরূপে গ্রহণ করে তাঁরা তা ব্যক্ত করেন। তাই, 'ভাগবত' ও পদাবলী-সাহিত্যে বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলা, বোধ হয়, প্রতীকমাত্র।

সকল ধর্মের মত আমাদের হিন্দুধর্মের শাস্ত্রেরও তিনটি বিভাগ আছে—(১) দর্শন ভাগ, (২) পুরাণ ভাগ এবং (৩) অনুষ্ঠান ভাগ। দর্শন ভাগে আছে প্রকৃত তত্ত্ব। আর পুরাণ ভাগে সেই তত্ত্বকেই রূপকের আশ্রয়ে, সহজবোধ্য করে, প্রকাশ করা হয়েছে। এই কাজ করতে গিয়ে অনেক কল্পিত অলৌকিক কাহিনার সৃষ্টি করতে হয়েছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই রূপকের আশ্রয় সেই উদ্দেশ্যই, বোধ হয়, ভয়ানক ব্যাহত হয়েছে। কারণ, আমরা যাঁরা সাধারণ মানুষ তাঁরা মূল তত্ত্বকে বাদ দিয়ে কল্পিত অলৌকিক কাহিনীকেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি; আসল জিনিষকে বাদ দিয়ে তার বাইরের নকল

আবরণটাকেই মনে করে থাকি আসল বলে। বিগ্রহের চেয়ে পাণ্ডার পা-পূজোর দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশী।

'ভাগবত' পুরাণ। আর পরবর্তীকালের কৃষ্ণবিষয়ক বৈষ্ণব-সাহিত্য, 'ভাগবত'কে অনুসরণ করে লেখা। কাজেই, 'ভাগবতে' এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিত, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-বর্ণনা, আসলে, রূপকের আশ্রয়ে ভগবৎ-প্রেম-বিষয়ক নিগূঢ়-তত্ত্বের বর্ণনা। এই রূপকের আবরণ ভেদ করতে পারলে দেখা যাবে, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম ন্যায়-নীতি-আদর্শবোধ বর্জিত নয়। মানুষের সমাজে আমরা যাকে জঘন্য বলে নিন্দা করে থাকি, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম আসলে তা নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে,—রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলার মধ্যে, রূপকের আবরণে আবৃত, সেই প্রকৃত তত্ত্ব কি ?

হিন্দু-দর্শনে কয়েকটি বাদ রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান দুটি —(১) দ্বৈতবাদ ও (২) অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদে যা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,—ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক ; এই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকারও হতে পারেন তিনি ; তিনি সগুণ ; তিনিই পরমাত্মা; জীব ও জগৎ সৃষ্টি করে, তিনি প্রতিটি জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছেন ; জীবে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মই হচ্ছেন জীবাত্মা, আর সর্বাত্মক পরব্রহ্মই হচ্ছেন পরমাত্মা ; পরমাত্মাই জীবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবাত্মা হয়েছেন, কিন্তু তথাপি জীবাত্মার সত্তা পরমাত্মার থেকে আলাদা ; পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনের আকাঙ্ক্ষাই ভগবৎ-প্রেম। অদ্বৈতবাদে যা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,—ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব এক এবং অভিন্ন হলেও এঁদের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে ; ব্রহ্ম নিরাকার-নির্গুণ, আর ঈশ্বর সগুণ-সাকার, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা ; মায়া আরোপিত হলে ব্রহ্ম ঈশ্বর হন, আবার ঈশ্বরই অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে জীব হয়েছেন।

অদ্বৈতবাদের সাধন হচ্ছে,—জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিদূরিত করে জীবের ঈশ্বরত্ব লাভ এবং আরো জ্ঞানের দ্বারা মায়া অপসারিত করে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন-সত্তা লাভ। আর দ্বৈতবাদের সাধন হচ্ছে,—প্রেম-ভক্তির দ্বারা পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন ঘটানো।

এবারে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলার রূপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত-তত্ত্বের আভাস দানের প্রয়াস চালানো যেতে পারে।

রাধা কৃষ্ণ-প্রেম-লীলায় যে কয়টি চরিত্রের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় তাঁরা হচ্ছেন,—কৃষ্ণ, গোপিনী, রাধা, আয়ান, জটিলা, কুটিলা, বড়াইবুড়ি প্রভৃতি।

এখন এই কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা। কর্ষণ বা সাধনার দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায়। তাই তিনি কৃষ্ণ।

গোপিনীরা কারা? 'গো' শব্দের একটি অর্থ বাক্য। বাক্য পালন করেন যিনি তিনি গোপ। মানব-দেহ দ্বারা বাক্য পালিত হয়। মানব-দেহে আশ্রিত যে আত্মা তাই মানবাত্মা বা জীবাত্মা। মানবাত্মা বা জীবাত্মা,সাধারণত, দেহের সেবায় নিযুক্ত থাকেন —দেহের তৃপ্তিতেই তাঁর তৃপ্তি। কাজেই, মানবদেহ হচ্ছেন মানবাত্মার স্বামী। মানব-দেহের স্ত্রী বা ঘরনী হচ্ছেন মানবাত্মা বা জীবাত্মা। মানবদেহ গোপ, আর মানবাত্মা বা জীবাত্মা সেই গোপের ঘরনী গোপিনী।

মানব-দেহ, সাধারণত, মানবাত্মাকে সম্ভোগ করে থাকেন। কিন্তু মানব-মাত্রেরই কিছুটা চেতনা-শক্তি রয়েছে। তাই মানবাত্মা, মানব-দেহের সেবায় নিযুক্ত থেকেও পরমাত্মার প্রতি কিছুটা আকর্ষণ অনুভব করেন। তাই তো, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলায় দেখা যায়,—গোপিনীদের সম্ভোগ করার ক্ষমতা তাঁদের স্বামী গোপদের আছে; কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের প্রতিও গোপিনীরা কিছুটা অনুরক্ত।

রাধা কে ? রাধা হচ্ছেন রাধিকা। রাধিকা আসলে আরাধিকা। সাধকের আরাধিকা-জীবাত্মাই রাধিকা বা রাধা।

আয়ান কে ? প্রাগ্রসর সাধকের দেহ হচ্ছেন আয়ান। 'আয়ান' শব্দের একটি অর্থ উপস্থিতি। অগ্রগামী-সাধকের আরাধিকা-আত্মার কাছে, আশ্রয় হিসেবে, সাধক-দেহের উপস্থিতিটুকুই কেবল স্বীকৃত হয়। তাই, প্রাগ্রসর-সাধকের দেহ 'আয়ান'। আরাধিকা-আত্মা দেহের অসারতা উপলব্ধি করেন, উপলব্ধি করেন পরমাত্মার সাথে মিলনেই তাঁর প্রকৃত সার্থকতা। তাই, সাধক-দেহ আর সাধকাত্মাকে সম্ভোগ করতে পারেন না। আমরা রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলাতেও দেখছি—স্ত্রীসম্ভোগের ক্ষমতা রাধার স্বামী আয়ানের নেই; রাধা কৃষ্ণের সাথে মিলনের আশায় ব্যাকুল। অগ্রগামী সাধকের আত্মার লক্ষ্য যেমন পার্থিব দেহের প্রতি থাকে না, থাকে পরমাত্মার প্রতি; তেমনি রাধার লক্ষ্যও স্বামী আয়ানের প্রতি নয়—তাঁর লক্ষ্য কৃষ্ণের প্রতি নিবদ্ধ।

জটিলা-কুটিলা কারা ? সাধকের জটিল মন জটিলা, আর কুটিল স্বভাব কুটিলা। জটিল-মন দেহকে লালন-পালনে ব্যগ্র। তাই, জটিল-মন দেহের মাতা। আবার কুটিলা-স্বভাব জটিল-মন-প্রসূত। তাই, কুটিল-স্বভাব জটিল-মনের কন্যা, দেহের ভগ্নী। জটিল-মন ও কুটিল-স্বভাব সবসময়ই চান, আরাধিকা-জীবাত্মা দেহের পরিচর্যাতেই নিযুক্ত থাকুন। তাঁরা সবসময়ই ষড়যন্ত্র করেন, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন যাতে আরাধিকা-জীবাত্মা, কোনক্রমেই, পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে না পারেন। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলাতেও দেখা যায়,—শাশুড়ী জটিলা ও ননদী কুটিলা সবসময়ই ষড়যন্ত্র করছেন রাধিকার বিরুদ্ধে; তাঁরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন যাতে কৃষ্ণের সাথে রাধিকার মিলন না হয়।

বড়াই-বুড়ি কে ? বড়াই হচ্ছেন বড় মায়ি অর্থাৎ বড়মা বা দিদিমা। দিদিমা যেমন নাতি-নাতনীর প্রতি স্নেহপরায়ণা হয়ে তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির সমস্ত সুযোগ করে দেন, তেমনি সিদ্ধ-পুরুষ গুরুর সিদ্ধাত্মা সবসময় শিষ্যরূপ সাধকের আরাধিকা-জীবাত্মার অভীষ্ট সিদ্ধিতে অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে মিলনে শিষ্যের জীবাত্মাকে সহায়তা করেন। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলাতেও আমরা দেখি, বড়াই-বুড়ি রাধিকার প্রতি স্নেহশীলা হয়ে সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতাকে পাশ কাটিয়ে কৃষ্ণের সাথে মিলনে রাধিকাকে সহায়তা করছেন।

সাধনার ক্ষেত্রে পরমাত্মার প্রতি আরাধিকা-জীবাত্মার আকর্ষণ, পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনের পথে নানান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি এবং বহু প্রচেষ্টায়, বহু কলা-কৌশল অবলম্বনের পরে, গুরুর সহায়তায়, পরিণতিতে, পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনই রূপকের আবরণে, অপূর্ব কাব্যাকারে বর্ণিত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলায়। মানুষ, তা তিনি জাগতিক দিক থেকে পুরুষ বা নারী যাই হোন না কেন, তাঁর আত্মা বা জীবাত্মা নারীরূপে কল্পিত হয়েছেন এবং পরমাত্মা কল্পিত হয়েছেন একমাত্র পরমপুরুষরূপে। তাই তো, বোধ হয়, বলা হয়েছে,—বৃন্দাবনে একমাত্র কৃষ্ণই পুরুষ আর সব নারী।

নানা কারণে, মানব-সমাজে, অবৈধ-প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সাধারণত, পরকিয়া-প্রেমের আকর্ষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার প্রেম ও আকর্ষণ অতি তীব্র হলে পরমাত্মার প্রেম ও আকর্ষণও তীব্র হয় জীবাত্মার প্রতি। এই তীব্রতা বোঝাবার জন্যও, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলায় পরকিয়া-প্রেমের অবতারনা করা হয়ে থাকতে পারে।

দ্বৈতবাদের সাধনার চরম-স্তর রাস। সাধনার এই চরম-স্তরে উঠে বিভিন্ন সাধকাত্মা একই সঙ্গে পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়ে চিরস্থায়ী

অমৃত-মধুর প্রেমানন্দ-রসাস্বাদন করে থাকেন। রাসলীলাতেও একই সঙ্গে বহু রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলন বর্ণনা করা হয়েছে।

এই চরম-স্তরেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার দ্বৈত-সত্তা বর্তমান থাকে। দ্বৈত-সত্তা না থাকলে পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার প্রেম-ভক্তি প্রকাশের অবকাশ আর থাকে না, মিলনে অমৃত-মধুর প্রেমানন্দ-রসাস্বাদনের অবকাশও থাকে না আর।

সাধনার ক্ষেত্রে এর পরবর্তী-স্তর অদ্বৈতবাদে আছে। সেখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন-সত্তা-জ্ঞান জীবাত্মাকেই পরমাত্মায় রূপান্তরিত করে। এটাই সাধনার শেষ-স্তর। এই স্তরে থাকে না কোন অজ্ঞানতা, থাকে না কোন মায়া; অন্তর্হিত হয় ভেদজ্ঞানও; একমাত্র অভেদজ্ঞান বর্তমান থাকে। সাধকের কাছে তখন সব সমান হয়ে যায়—থাকে না সুখানুভূতি, থাকে না দুঃখানুভূতি; সব পরিস্থিতিতেই, সব অবস্থাতেই তাঁর সমান আনন্দ; একটা নির্বিকার মুক্ত-অবস্থা লাভ করেন তিনি।

দ্বৈতবাদে পরমাত্মাকে কান্তরূপে লাভ করার জন্য যে ভাব তাই রাধা-ভাব। এই রাধা-ভাব অবলম্বন করে সাধনা করে গেছেন নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু। এই ভাব অবলম্বন করে যাঁরা সাধনা করতে চান তাঁদের শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হতে হবে।

এই হ'ল মোটামুটিভাবে, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম লীলায়, রূপকাবরণে আবৃত প্রকৃত-ভগবৎ-প্রেম-তত্ত্ব। আর কোন কলুষতার কালিমা লক্ষ্য করা যাবে না এখানে। এখানে প্রচ্ছন্নভাবে যে তত্ত্ব আছে তা কোন খণ্ড সত্য নয়—তা অখণ্ড দার্শনিক সত্য। আর এই তত্ত্ব মানব-সমাজের মঙ্গলের পরিপন্থীও নয়। এই তত্ত্বকে প্রকৃত অনুসরণ করলে, মানুষ, অন্তত, স্বার্থান্ধ হয়ে পরস্পরে হানাহানিতে রত হবেন না; বরং নির্মল বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী হবেন মানুষ। আবার, পরমাত্মা বা ঈশ্বর

জগৎ-সংসারের সমস্ত কিছুতে ব্যাপ্ত বা অনুপ্রবিষ্ট। কাজেই, পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রেম প্রগাঢ় হলে, সামাগ্রিক ভাবে, জগৎ-সংসারের প্রতিই মানুষের বিশুদ্ধ-প্রেম গাঢ়তর হয়ে উঠবে; সমষ্টির মঙ্গলের জন্য মানুষের ব্যষ্টি-জীবন উৎসর্গীকৃত হবে।

সুতরাং দেখা গেল, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলা, যে সমস্ত কাব্য-সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে—ভাগবত, বৈষ্ণব-পদাবলী প্রভৃতি—সেগুলোতে 'সত্যম্' ও 'সুন্দরম্' এর সাথে সাথে 'শিবম্'ও অদ্ভুতভাবে সম্মানিত হয়েছেন। তাই, এগুলো অপসাহিত্য নয়, নয় শুধু সাহিত্য—এগুলো সত্যি সত্যি সুসাহিত্য পদবাচ্য হতে পেরেছে।

আমার "উপনিষদের 'ব্রহ্ম' আর বিজ্ঞানের 'শক্তি' কি এক?" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি উপনিষদের ব্রহ্মের স্বরূপ এবং বিজ্ঞানের শক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি,—বিজ্ঞানে যাকে শক্তি বা energy বলা হয়েছে, উপনিষদে তাকেই বলা হয়েছে পরব্রহ্ম; আর বিজ্ঞানে যাকে বস্তু বা matter বলা হয়েছে, উপনিষদে তাকেই বলা হয়েছে, নামব্রহ্ম।

বিজ্ঞানের এই energy বা শক্তির যে অখণ্ড-সত্তা তাই পরমাত্মা, তাই ব্রহ্ম, তাই ঈশ্বর। এই energy বা শক্তিই প্রত্যেকের মধ্যে জীবাত্মারূপে রয়েছেন, সমগ্র-জগৎ-ব্যাপী রয়েছেন পরমাত্মারূপে। ইনিই বৈষ্ণবদের বিষ্ণু বা কৃষ্ণ, ইনিই শৈবদের শিব, ইনিই শাক্তদের আদ্যাশক্তি, ইনিই গাণপত্যদের গণপতি, ইনিই সৌরদের সূর্য, ইনিই বৌদ্ধদের শূন্য, ইনিই ব্রাহ্মদের ব্রহ্ম, ইনিই বিজ্ঞানবাদীদের energy বা শক্তি। সর্বস্তরের সাধকই তাঁর ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করে, জগৎ-ব্যাপী অখণ্ড-শাশ্বত-শক্তির সাথে যোগ সাধন করে সচ্চিদানন্দ লাভ করেন, এই শক্তিকেই সমস্ত কিছুর মধ্যে আবিষ্কার করে জগৎ-

সংসারের কল্যাণের পথ বাতলে দেন—এটাই তো প্রকৃত-প্রস্তাবে ভগবৎ-সাধনা।

পরিশেষে কামনা করি,—মানুষের সর্বাত্মক-সাধনা সফল হোক, মানুষের মঙ্গল হোক, মানুষ শান্তিলাভ করুন। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

—:০:—

মহাদেবের সংসার

ডাঃ ভবনাথ সরকার

শিবের আরেক নাম রুদ্র। বেদে শিব প্রধানত রুদ্র নামেই উল্লিখিত। রুদ্রই যে শিব সে ইঙ্গিতও বেদে রয়েছে। যজুর্বেদে ঈশান রুদ্রকে নমস্কার জানিয়ে প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। এই ঈশানই পৌরাণিকযুগে হয়েছেন মহাদেব বা শিব। শিব সংহার কর্তা। অন্য দেবতার মত তাঁর জন্ম হয়নি। তিনি স্বয়ম্ভু। তাঁর আদি নেই—তিনি অনাদি। অমৃত পান করে তিনি অমরত্ব লাভ করেননি; বরং বদলে হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে তিনি হয়েছেন নীলকণ্ঠ। তিনি সংহার-কারী হলেও সংহারের পর আবার নতুন জীবন সৃষ্টি করেন। সে জন্য তাঁর নাম শঙ্কর। তিনি সৃষ্টির রক্ষকও। শিব ঐশ্বর্যশালী, স্বয়ং কুবের তাঁর ভাণ্ডারী; তবু তিনি উদাসীন, রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান। দিব্য বস্ত্রের বদলে তাঁর পরিধানে বাঘছাল, রত্নহারের পরিবর্তে তাঁর অঙ্গের ভূষণ হাড়মালা ও সর্প।

শিবের প্রথম বিবাহ হয় দক্ষপ্রজাতির কনিষ্ঠা কন্যা সতীর সাথে। ভৃগুর যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে যখন দক্ষ উপস্থিত হন তখন ধ্যানমগ্ন শিব তাঁকে সম্মান না দেখালে তিনি ক্রুদ্ধহন এবং শিবহীন যজ্ঞ করে শিবকে অপমানিত করতে চেষ্টা করেন। এই যজ্ঞে সতী পতি নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেন। শিবের কাছে খবর পৌঁছালে তিনি দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের জটা ছিঁড়ে ফেলেন। সেই জটা থেকে বীরভদ্রের জন্ম হয়। শিবের আদেশে বীরভদ্র ভূতপ্রেত সঙ্গে নিয়ে দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন।

দক্ষ শিবনিন্দা করেছিল বলে বীরভদ্র তার মুণ্ডচ্ছেদ করেন। অবশেষে দক্ষপত্নী প্রসূতির কাতর প্রার্থনায় দক্ষ দেহে ছাগমুণ্ড

সংযোজিত হয়। যজ্ঞস্থলে শিব সতীর শবদেহ দেখে শোকাকুল হন। তিনি পত্নীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে নৃত্য করতে সুরু করেন। শিবের তাণ্ডবনৃত্যে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়। তখন ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীদেহ একান্ন (মতান্তরে বাহান্ন) খণ্ডে বিভক্ত করেন। পৃথিবীতে পতিত সতী দেহের খণ্ডগুলি এখনো মহাপীঠ রূপে পূজিত হয়। সুতরাং শিবের প্রথম বিবাহে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি।

শিবের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় হিমালয় দুহিতা পার্বতীর সাথে। পুরাণমতে সতীই হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিবকে স্বামীরূপে লাভ করবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। সতীর বিরহে মহাদেবও তখন কঠোর তপস্যায় মগ্ন। অবশেষে দেবতাদের আদেশে মদন হরপার্বতীর মিলন করতে এসে শিবের কোপে পড়ে ভস্ম হন। তারপর শিব ও পার্বতীর মিলন হলে মদন পুনর্জন্ম লাভ করেন। উমা-মহেশ্বরের মিলন বড়ই রমণীয়। মহাদেব পার্বতীকে গল্পচ্ছলে তন্ত্র, যোগশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এই সব শাস্ত্রের বক্তা শিব এবং শ্রোতা পার্বতী। একবার পার্বতী কৌতুকভরে শিবের দুটো চোখ চেপে ধরেন। তাতে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং আলোর অভাবে সমস্ত জগং বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন জগং রক্ষার জন্য শিবের তৃতীয় নেত্রের উদ্ভব হয়ে। সেই থেকে শিবের তিন নেত্র।

শিবের দ্বিতীয় বিবাহ নিষ্ফল হয়নি। পার্বতীর গর্ভে শিবের দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে—কার্তিক ও গণেশ। অবশ্য ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ মতে কার্তিককে পার্বতী গর্ভে ধারণ করতে সক্ষম হননি। কৃত্তিকা নক্ষত্র তাঁকে পালন করেন বলে তাঁর নাম হয় কার্তিকেয়। পুত্রের অভাবে পার্বতীর মনোকষ্ট দূর করতে ভগবান বিষ্ণু গণেশকে সৃষ্টি

করেন। দেবতাদের মধ্যে শিবকে সংযমী দেবতা বলা হয়। তিনি পত্নীপরায়ণ বলে মেয়েরা শিবের মত পতি চায়। কিন্তু মধ্যযুগে রচিত 'শিবায়ন কাব্যে' শিবের কোচ পাড়ার কুচনীর সাথে প্রেম করবার কাহিনী রচিত হয়েছে। কোচবিহারের কোচ উপজাতিরা নিজেদের শিবের বংশধর বলে পরিচয় দেন। ভগবান রুদ্রের বংশধর রুদ্রজ-ব্রাহ্মণরাও শিব-সন্তান বলে পরিচিত।

শিবের আর একটি পুত্র হচ্ছে শাস্তা বা মহাশাস্তা। উত্তর ভারতে এই দেবতা অপরিচিত হলেও দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর ও তিরুনেলবেলি জেলায় এবং কেরলে ইনি বিশেষভাবে পূজিত। শাস্তা কেবল শিবের পুত্র নন। ইনি হরি-হর-সুত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের ফলে অমৃত উত্থিত হয়। এই অমৃত লাভের জন্য দেবতা ও অসুরের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কারণ অমৃত ভক্ষণ করলে অমরত্ব লাভ হবে। সুতরাং দেবাসুরের মধ্যে অমৃতের জন্য কাড়াকাড়ি সুরু হয়। অবশেষে শিবের মধ্যস্থতায় সকলে শান্ত হন। এই সময় ভগবান বিষ্ণু মোহিনীমূর্তি ধারণ করে অসুরদের মোহিত করলেন। দেবতা ও অসুরদের দুটি পৃথক পংক্তিতে বসিয়ে প্রথমে দেবতাদের অমৃত পরিবেশন করে তিনি যখন অসুরদের কাছে গেলেন তখন অমৃতভাণ্ড শূন্য। কেবল রাহু দেবতাদের মধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে অমৃত ভক্ষণ করে অমরত্ব লাভ করলে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে তার মস্তক ছেদন করলেন। অমর রাহুর দেহ দুভাগ হয়ে রাহু ও কেতু নামক দুটি অসুরের সৃষ্টি হ'ল।

এ দিকে বিষ্ণুর মোহিনীরূপে মুগ্ধ শিব পার্বতীকে ত্যাগ করে মোহিনীর সাথে একত্রে বাস করতে লাগলেন। অবশেষে শিবের ঔরসে মোহিনীরূপিনী বিষ্ণুর গর্ভে শাস্তা বা মহাশাস্তার জন্ম হল।

এই সময় পন্দলসের (ত্রিবাঙ্কুর) নিঃসন্তান রাজা মৃগয়ায় বের হয়ে পিতামাতা পরিত্যক্ত এই শিশুকে নির্জন বনে দেখতে পান এবং তাকে রাজপ্রাসাদে এনে পুত্রবৎ পালন করতে থাকেন। বালকের নানাবিধ অদ্ভুত শক্তি দেখে রাজকার্য ফেলে শিশুকে নিয়ে রাজা রাতদিন ভুলে থাকেন। রাণীর এটা সহ্য হয়না। মন্ত্রী এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকের আদর যত্ন দেখে ঈর্ষান্বিত হন। কিছুদিন ষড়যন্ত্র চলবার পর হঠাৎ শোনা যায় রাণী কঠিন পীড়ায় শয্যাগত। রোগ এমন যে তাঁকে বাঁচানো কঠিন। চিকিৎসকরা বিধান দেন, রাণীকে বাঁচানোর জন্য বাঘের দুধের প্রয়োজন। কিন্তু বাঘের দুধ আনবে কে? অবশেষে রাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাস্তা নিজেই বাঘের দুধ আনতে বনে গেলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা ভাবলেন শাস্তা আর ফিরবেন না। অকস্মাৎ দেখা গেল অরণ্যের সমস্ত হিংস্রপশুর এক বিরাট বাহিনী নগরের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে আর তাদের সামনে বাঘের পিঠে বসে আছেন শাস্তা। তাদের দেখে নগরবাসীদের ছুটাছুটি চিৎকার ও আর্তনাদ আরম্ভ হল। রাণীর অসুখ ভালো হতে আর এক মুহূর্তও লাগল না। পরে রাজার অনুরোধে শাস্তা তাঁর পশুবাহিনীকে বনে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু শাস্তা আর নগরে বাস করতে চাইলেন না। শাস্তার অনুরোধে রাজা পর্বতের নির্জন অরণ্যে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। আজও কেরলের শবরী পর্বতে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে এই ঘটনাকে স্মরণ করে উৎসব পালিত হয়।

হরিহর-পুত্র শাস্তা বা মহাশাস্তার বিশেষ-বিগ্রহ বর্তমানে পূজিত হয়। বটবৃক্ষের নীচে সিংহাসনে উপবিষ্ট কিরীটিধারী এই বিগ্রহের কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, দুই হস্তে তীর-ধনু।

———

॥ বঙ্গ-রঙ্গালয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ॥

আশুতোষ ভট্টাচার্য

"মেঘনাদবধ কাব্য" (১৮৬১ খ্রীঃ) মাইকেল মধুসূদন দত্তের (জানুয়ারি ১৮২৪ খ্রীঃ—২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রীঃ) এক অনন্যসাধারণ কাব্যকীর্তি। এই কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন কবির 'চিত্ত-ফুলবন-মধু' থেকে তিল তিল করে মধু আহরণ করে আপন প্রতিভার হিরণ্যদ্যুতি স্পর্শে তিনি যে 'মধুচক্র' রচনা করেছেন, 'গৌড়জন' তা থেকে 'নিরবধি আনন্দে সুধা পান' করে পরিতৃপ্ত। মধ্যযুগীয় একটানা গতানুগতিকতা থেকে বাংলাকাব্যকে মুক্তি দিয়ে তিনি কেবল আধুনিকতারই প্রবর্তন করেন নি, কাব্যের বহিরঙ্গ ও আন্তররূপেরও মৌল পরিবর্তন সাধন করেছেন। কাব্যটিতে কবি ছন্দ ও যতির বিপর্যয় ঘটিয়ে ওজোগুণান্বিত শব্দ ও ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি করে একদিকে যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার রূপান্তর ঘটিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত করেছেন। কাহিনী-বিন্যাসে, চরিত্র-চিত্রণে, ঘটনা-উপস্থাপনে, নাটকীয়তা-স্ফুরণে সর্বত্রই কবি স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

"মেঘনাদবধ কাব্য" বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বহুল প্রচারিত ও বহুজন পরিচিত কাব্য হলেও নাট্যগুণান্বিত কাব্য। সেইজন্য বঙ্গীয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে নিয়মিত অভিনয়ের উপযোগী পর্যাপ্ত বাংলানাটকের অভাবে ও নাট্যরসিক ক্রমবর্ধমান দর্শকদের চাহিদা মেটাতে যে যুগে রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষেরা বিভিন্ন উপন্যাস ও কাব্যের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, সে সময়ে "মেঘনাদবধ কাব্যে"র এই নাট্যলক্ষণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছিল। এরই ফলে কাব্যটি একাধিকবার নাটকাকারে গ্রথিত হয়ে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

* * * *

কলকাতা শহরের অন্যতম ধনী আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) দৌহিত্র বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্য-প্রযোজক শরৎচন্দ্র ঘোষ (?—১৮৮০ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল থিয়েটারে' (১৬ আগষ্ট ১৮৭৩ খ্রীঃ—৩১ মার্চ ১৯০১ খ্রীঃ) "মেঘনাদবধ কাব্যে"র নাট্যরূপ সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। ৯ বিডন ষ্ট্রীট, এখন যেখানে বিডন ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিস বিদ্যমান, সেখানেই এই থিয়েটার অবস্থিত ছিল। অমৃতলাল বসু বলেছেন,

> "......তৎকালে বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের মেঘনাদবধ নাটকাকারে প্রথম অভিনীত হয়।"[১]

এই থিয়েটারের কর্তৃপক্ষেরা সূচনালগ্নে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরামর্শে সমাজ-পরিত্যক্তা বারাঙ্গনাদের অভিনেত্রীরূপে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম সাদরে আহ্বান করে সে যুগের রক্ষণশীল সমাজ ও এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত বিদ্যোজ্জন সম্প্রদায়ের তীব্র সমালোচনা ও কঠোর কটূক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে অবিচল নিষ্ঠা ও দুঃসাহসিক মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য "মেঘনাদবধ কাব্য"কে নাট্যরূপ প্রদান করে মঞ্চস্থ করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সেই দুঃসাহসের কথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অভিনয়ের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শিশির বসু বলেছেন,

> "........নিছক চমকপ্রদ ঘটনা হিসাবে নয়, এক গুরুত্বপূর্ণ সূচনার কারণে এই কাব্যের নাট্যরূপ ও পরিবেশনা কৃতিত্বের দাবী

১। 'অমৃত-মদিরা', কার্তিক ১৩১০ সাল, পৃষ্ঠা—২৭৮।

করতে পারে। বেঙ্গল মঞ্চে 'মেঘনাদবধ' অভিনয় রচনা শৈলীর ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল রাজকৃষ্ণ রায় এবং গিরিশচন্দ্রকে ভঙ্গ অমিত্রক্ষার ছন্দে নাটক প্রণয়নে।"[২]

"মেঘনাদবধ কাব্য"কে নাটকাকারে গ্রথিত করে অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে'র দলছুটদের নিয়ে গঠিত 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী'। সে যুগের বিশিষ্ট অভিনেতা অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মণ, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি অনেকেই এই অপেরা কোম্পানীতে ছিলেন। এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—

"পর-বৎসর (১৮৭৫) ফেব্রুয়ারি মাসে 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নামে একটি দল বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন সম্মিলিত অভিনয় দেখান। এই দলটি 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' হইতে বিচ্ছিন্ন অভিনেতাদের সহযোগে গঠিত। গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীতে অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্ম্মণ, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি ছিলেন।

....

এই উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত অভিনয়গুলির মধ্যে একটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ; উহা মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'।"[৩]

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নাট্যরূপটির প্রথম অভিনয় রজনী ৬ই মার্চ

২। 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার', প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮০ সাল, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৩ খ্রীঃ, পৃষ্ঠা—২২।

৩। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', চতুর্থ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ সাল, পৃঃ—১৩৪।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, পুনরভিনীত হয় এক সপ্তাহ পরে ১৩ই মার্চে।[৪] প্রখ্যাত অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেঘনাদ' ও হরিদাস দাস (হরি বোষ্টম) 'লক্ষ্মণে'র চরিত্রে রূপদান করেন। এঁদের অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু বলেছেন,—

> "....কিরণচন্দ্র তাহাতে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সহযোগী লক্ষ্মণবেশী হরি বৈষ্ণবের সহিত জনসাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।"[৫]

প্রখ্যাত নট ও প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং বিশিষ্ট নট, নাট্যকার ও পরিচালক বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০ খ্রীঃ—২০ এপ্রিল ১৯০১ খ্রীঃ) এই নাটকে অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদানের পরে বিনোদিনী দাসীও বহুবার ঐ নাটকটিতে অভিনয় করেন। নিজের অভিনয় সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন,—

> "...আমি উক্ত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে সাতটী পার্ট একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছিলাম। ১ম চিত্রাঙ্গদা, ২য় প্রমীলা, ৩য় বারুনী, ৪র্থ রতি, ৫ম মায়া, ৬ষ্ঠ মহামায়া, ৭ম সীতা।"[৬]

ঐ আত্মজীবনীতেই আবার তিনি দু'বছর পরে 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' অভিনীত "মেঘনাদ বধ" প্রসঙ্গে বলেছেন,—

> "...'মেঘনাদ বধে' অমৃতলাল রাবণ সাজেন এবং আমি এখানেও সাতটি অংশ গ্রহণ করিতাম।"[৭]

৪। 'Englishman', 6. 3. 1375 ও 13.3. 1875 এবং 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', পৃষ্ঠা ১৩৪।

৫। 'অমৃত-মদিরা', পৃঃ = ১৭৯।

৬। 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', সুবর্ণরেখা সংস্করণ, ১৩৭৬ সাল, পৃঃ—২১।

৭। ,, ,, পৃঃ—২৮।

কিন্তু 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র পরিচালক ও সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ নট, নাট্যকার ও নাট্যাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিনোদিনীর প্রথম উক্তিকে সমর্থন করেন নি। তিনি বিনোদিনীর "আমার কথা"-র ভূমিকায় লিখেছেন,—

> "......বিনোদিনীর স্মরণ নাই, মেঘনাদের সাতটি ভূমিকা বিনোদিনীকে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনয় করিতে হয়, বেঙ্গল থিয়েটারে নয়। যাহা হউক সাতটি ভূমিকাই অতি সুন্দর হইয়াছিল।"[৮]

বিনোদিনী বেঙ্গলে প্রমীলার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে 'মেঘনাদবধে'র এক রাত্রির অভিনয় কাহিনীর উল্লেখ করেছেন।[৯] বেঙ্গল থিয়েটার একবার সদলবলে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে অভিনয় করতে গিয়েছিল। সকলের সঙ্গে বিনোদিনীও ছিলেন। মেঘনাদবধ অভিনয় হবে, প্রমীলার ভূমিকা ছিল তাঁর। ঘোড়ার উপরে বসে তাঁকে প্রমীলার অভিনয় করতে হত। রাজবাড়ীতে মাটি দিয়ে থিয়েটারের প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা হয়েছিল। ঘোড়ায় চড়ে অভিনয় করে প্রমীলাবেশী বিনোদিনী যেই মঞ্চের বাইরে প্রস্থান করতে যাবেন, মাটির ধাপ ভেঙে অমনি ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ল আর তার উপর থেকে বিনোদিনীও হঠাৎ ছিটকে পড়লেন প্রায় দু'হাত দূরে। আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাতে উঠে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন তিনি। অভিনয় শেষ হতে তখন অনেক দেরী। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও নট শরৎচন্দ্রের বড় ভাই চারুচন্দ্র ঘোষ বিনোদিনীকে ওষুধ খাওয়ালেন, হাঁটু থেকে পেট অবধি ভালো

৮। 'বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী', গিরিশ-গ্রন্থাবলী, সপ্তম ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, পৃষ্ঠা—৩০৩।

৯। 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', পৃষ্ঠা—২৫।

করে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। শরৎচন্দ্র সস্নেহে বললেন, "লক্ষ্মীটি! আজকের কাজটা কষ্ট করে উদ্ধার করে দাও।" তাঁর স্নেহভরা সান্ত্বনাবাক্যে বিনোদিনীর অর্ধেক ব্যথা যেন দূর হয়ে গেল। কোনক্রমে তিনি অভিনয় করলেন সেদিন। কিন্তু পরের দিন কলকাতায় ফিরে আসার পরে প্রায় মাসাধিককাল তিনি শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত "মেঘনাদবধের" নাট্যরূপটি পাওয়া যায় না। বোধ হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি কোনদিন ; পাণ্ডুলিপি আকারেই এর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যও বলেছেন,

"...সেই নাট্যরূপ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল মনে হয় না।"[১০]

বেঙ্গল থিয়েটারে "মেঘনাদবধ কাব্যে"র অভিনয় প্রয়াস যত দুঃসাহসিকতারই পরিচয় দিক না কেন, অভিনয় কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারে নি। সমকালীন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত ও প্রথম গিরিশ-জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই অসাফল্যের কারণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,—

> "...উক্ত থিয়েটারের অভিনয়ে পদ্যের মাধুরী অনেক স্থলে অক্ষুণ্ণ থাকিত না। এক প্রকার গদ্য করিয়া বলিবারই চেষ্টা হইত। উক্ত থিয়েটারের অভিনেতারা গৌরব করিতেন যে, তাঁহাদের অভিনয় স্বাভাবিক ও সুরবর্জ্জিত। কিন্তু পদ্য, গদ্য করিতে যাইলে যে একটা অস্বাভাবিক সুর আসে, এবং তাহাতে কাব্য-মাধুরীও নষ্ট হয়, ইহা তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না।

১০। গিরিশচন্দ্র ঘোষ : সাহিত্য-সাধনা 'গিরিশ-রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড. সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, মে ১৯৭১ খ্রীঃ, পৃষ্ঠা—২৯।

গদ্য করিবার চেষ্টায় অভিনয়েরও হানি জন্মে। যথাস্থানে ভাবানুযায়ী নিম্ন ও উচ্চস্বর প্রয়োগ করা যায় না। ...বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত "মেঘনাদবধ" নাটকে রামের ভূমিকা অতি সামান্য ছিল এবং পর পর দৃশ্য স্থাপনও নাটকীয় সুকৌশলে সংযোজিত হয় নাই। ...রামের ভূমিকা বেঙ্গল থিয়েটারে একরূপ পরিত্যক্ত হয়।"[১১]

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও উক্ত অভিনয়ের প্রতি কটূক্তি করেছেন। অভিনয়ের ব্যর্থতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে অবিনাশচন্দ্রের উল্লিখিত প্রথম কারণটির সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন,—

"....অভিনেতৃগণ মাইকেলের অপূর্ব ছন্দ এমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা করিয়া গদ্যের ন্যায় পড়িতেন যে কবিবরের তথায় যেন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতেছিল।"[১২]

উপরের উধৃতিগুলি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত "মেঘনাদবধ কাব্যে"র নাট্যরূপ ও তার অভিনয় ছিল নানাবিধ ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। এই ত্রুটিগুলিকে পর পর নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যেতে পারে,—

॥ এক ॥ "মেঘনাদবধ কাব্য"কে গদ্যরূপে অভিনয় করার সচেতন প্রয়াস। কাব্যকে গদ্যের ন্যায় অভিনয় করার জন্য অভিনয় হয়ে পড়েছিল কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক।

॥ দুই ॥ কাব্যকে সুরবর্জিত আবৃত্তি করার ফলে কাব্যিক মাধুর্য ও ছান্দিক ধ্বনিঝঙ্কারের ঘটেছিল সম্পূর্ণ বিলুপ্তি।

॥ তিন ॥ প্রতিনায়ক রামচন্দ্রের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শিত হয়নি। চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছিল সংক্ষিপ্তাকারে।

১১। গিরিশচন্দ্র ঘোষের "মেঘনাদ বধ", বসুমতী সংস্করণ, ভূমিকা।

১২। 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪৭ সাল, পৃষ্ঠা—৯২।

॥ চার ॥ দৃশ্য-পরিকল্পনা ছিল ত্রুটিপূর্ণ, সামঞ্জস্যহীন ও এলোমেলো। পর পর দৃশ্যগুলিকে সুসন্নিবেশিত করা হয়নি।

* * * *

বেঙ্গল থিয়েটার যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল, সেই সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪খ্রীঃ—৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ খ্রীঃ) পরিচালিত 'ন্যাশনাল থিয়েটার' (জুলাই ১৮৭৭ খ্রীঃ-১৮৮৬ খ্রীঃ) তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দেয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই ন্যাশনাল থিয়েটারই পূর্ববর্তী 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে'র সংস্কৃত রূপ। কেননা, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার উঠে গেলে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্র ঐ রঙ্গমঞ্চ শ্যালক দ্বারকানাথ দেব ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ কেদারনাথ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় লিজ নিয়ে তাঁর নাম ন্যাশনাল থিয়েটার রেখেছিলেন। কয়েকমাস পরে অবশ্য তিনি ছোট ভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষের আপত্তিতে থিয়েটারের মালিকানা শ্যালক দ্বারকানাথকে হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হন (অক্টোবর ১৮৭৭খ্রীঃ)। সমকালীন যুগে বেঙ্গল থিয়েটার ও ন্যাশনাল থিয়েটারের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বেঙ্গল থিয়েটারের নাট্যরূপ ও অভিনয়ের ত্রুটিগুলি গিরিশচন্দ্রকে নতুন করে "মেঘনাদবধ কাব্য"কে নাটকাকারে গ্রথিত করে অভিনয়ে প্রেরণা জুগিয়েছিল। অবিনাশচন্দ্র বলেছেন,—

> 'গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটার' লিজ লইয়া (১৮৭৭খ্রীঃ, জুলাই) গিরিশচন্দ্র নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্বের 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নাম দিলেন এবং অভিনয়ার্থে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' নির্ব্বাচিত করেন। 'মেঘনাদবধ' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বহু পূর্ব্বে 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত হইয়াছিল। উক্ত থিয়েটারে কাব্যখানি যেরূপভাবে নাট্যকারে

গঠিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে নাট্য-কৌশলের ত্রুটী দেখিয়া এবং অভিনয়-শিক্ষাদানও মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি সম্পূর্ণ নূতনভাবে 'মেঘনাদ বধ' অভিনয়ের সঙ্কল্প করেন।"[১৩]

এরই ফলশ্রুতি "মেঘনাদবধ কাব্যে"র নাট্যাকারে নব-রূপায়ন। প্রথম অভিনয় রজনী—১ ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নাট্যরূপটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা হলেন,—

রাম ও মেঘনাদ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ; লক্ষ্মণ—কেদারনাথ চৌধুরী; রাবণ—অমৃতলাল মিত্র; বিভীষণ ও মহাদেব—মতিলাল সুর; সুগ্রীব, মারীচ ও সারণ—অতুলচন্দ্র মিত্র (বেডৌল); হনুমান—যদুনাথ ভট্টাচার্য; ইন্দ্র—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়; কার্তিক ও দূত—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু); মদন—রামতারণ সান্যাল; মন্দোদরী—কাদম্বিনী; প্রমীলা—বিনোদিনী দাসী; চিত্রাঙ্গদা ও মায়া—লক্ষ্মীমণি দাসী; শচী—বসন্তকুমারী; রতি ও বাসন্তী—কুসুমকুমারী (খোঁড়া); নৃমুণ্ডমালিনী ও প্রভাসা—ক্ষেত্রমণি দেবী প্রভৃতি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাবণের ভূমিকাভিনেতা অমৃতলাল মিত্র এই নাট্যরূপটিতেই প্রথম মঞ্চে অবতীর্ণ হন। এর আগে তিনি যাত্রায় অভিনয় করতেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বর, অপূর্ব বাচনভঙ্গি ও সুন্দর চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁকে সাদরে ন্যাশনাল থিয়েটারে আহ্বান করে আনেন। বিনোদিনী দাসী বলেছেন,

"....সেইসময় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র মহাশয় আসিয়া অভিনয় কার্য্যে যোগ দেন। গিরিশবাবুর মুখে

১৩। 'গিরিশচন্দ্র', চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ, দে'জ পাবলিশিং সংস্করণ, ১৯৭৭খ্রীঃ, পৃষ্ঠা—১৩২।

শুনিয়া ছিলাম, যে অমৃত মিত্র আগে যাত্রার দলে এক্‌ট করিতেন। তাঁহার গলার সুন্দর স্বর শুনিয়া তিনি প্রথমে থিয়েটারে লইয়া আসেন।"[১৪]

ন্যাশনাল থিয়েটারের "মেঘনাদবধ" নাট্যরূপের অভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সকলেই প্রশংসার দাবী রাখেন। কিন্তু মেঘনাদ ও রামের দ্বৈত ভূমিকাভিনয়ে গিরিশচন্দ্র যে অনন্য সাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা সব কিছুকে অতিক্রম করে গেছে। প্রতিটি চরিত্রের অভিনয়, দৃশ্যপটসজ্জা ও দৃশ্য-পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার উক্তি,

"...আমরা ন্যাসান্যাল থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি,—আশাতীত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। অভিনেতৃগণের মধ্যে রাবণ, মেঘনাদ, রাম, লক্ষ্মণ, শিব, বিভীষণ এবং প্রমীলার অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মেঘনাদ ও রামের অংশ অভিনয় করেন। স্পষ্ট কথা বলিতে কি গিরিশ-বাবুর মত অভিনেতা বোধ করি বঙ্গ নাট্যশালায় নাই। বাবু কেদারনাথ চৌধুরী লক্ষ্মণের অংশ অভিনয় করেন, এই অংশটীও সুন্দররূপে অভিনয় হইয়াছিল। যিনি রাবণের অংশ অভিনয় করেন, তাঁহাকে আমরা চিনি না, কিন্তু তাঁহার অভিনয় দর্শনে আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও প্রমীলার চিতারোহণ দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। প্রমোদোদ্যান, যোগাসন পর্ব্বত ও শিবিরের দৃশ্যপট অতি চমৎকার হইয়াছে। শেষ দৃশ্যটী যৎকালে প্রমীলাসুন্দরী চিতায় প্রাণত্যাগ করিতে যান,

১৪। 'আমার কথা অন্যান্য রচনা', পৃষ্ঠা—২৮

তখন রাবণ, সারণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পদাতিক সৈন্য, দণ্ডধারী, পতাকীদল, বাদ্যকরগণ, প্রমীলা, বাসন্তী, নৃমুণ্ডমালিনী ও সখীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিয়াছিলেন,—এ দৃশ্যটী নূতন প্রকারের হইয়াছে, ইংরাজী ধরণের। বঙ্গ নাট্যশালায় আমরা এরূপ দৃশ্য কখন দেখি নাই। ন্যাসানাল থিয়েটার কোম্পানি যেরূপ অভিনয় করিতেছেন, শীঘ্রই যে ইঁহারা কলিকাতা নগরে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। প্রতিবারেই ইঁহাদিগের দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।"[১৫]

২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে "মেঘনাদবধে"র একটি অভিনয় হয়। ঐ অভিনয় দেখে বিস্মিত হয়ে 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন,

ন্যাসানাল থিয়েটার। ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে 'মেঘনাদ বধে'র অভিনয় দেখিতে গিয়া আমরা যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, অনেক দিন আমাদের ভাগ্যে সে প্রকার সুখ আর ঘটে নাই। রামচন্দ্র এবং মেঘনাদ, এই দুই রূপে নাট্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিনয় করেন। পাত্রদ্বয়ের চরিত্র, কার্য্য এবং ভাব সমস্তই বিভিন্ন, সুতরাং একই ব্যক্তির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিসদৃশ্যতা হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-দক্ষতায়, তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায়, এ দোষ দেখিয়াও আমরা মনে কিছু করিতে পারি নাই, দোষ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং তাঁহার রাম-রূপের অভিনয়ে বারংবার আমাদের কঠোর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ যখন পূজাগারে প্রবেশ করেন, তখন গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ-সম্ভব সৌম্যভাব দর্শনে আমরা মুগ্ধ হই ; আবার তৎপরক্ষণেই যখন

১৫। 'সমাচার চন্দ্রিকা', ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৭৭ খ্রীঃ।

সহসা রোষকষায়িত নেত্রে বীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বক্ষ প্রসারণ-পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র অভিনয়-পটুতার চরম সীমা দেখাইলেন, তাঁহার সে ভাব অদ্ভুত, বিস্ময়কর। তাহাতে আমরা মুগ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলণ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোন গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণা হয় না। গিরিশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন, আর এইরূপে আমাদের সুখ বর্দ্ধন করিয়া সাধুবাদ গ্রহণ করিতে থাকুন। গিরিশ বঙ্গের অলঙ্কার।

গিরিশচন্দ্র এক দোষের ভাগী হইতেছেন, অভিনয় মঞ্চে রাবণ সুখ্যাতির পাত্র হইয়াও তাঁহার সহিত তুলনায় আমাদের নিকট যথোচিত প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই, অন্যথা তিনিও সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার মুখ-ভঙ্গিমায় অভিনয়-দক্ষতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। একটা কথা বলিয়া দিই রাবণ সর্ব্বত্র যথাকর্ত্তব্য স্বরভঙ্গী করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণ স্বীয় অংশ যথাসময়ে শিখিতে পান নাই, অপ্রস্তুত ছিলেন, আমরা ইহা অবগত হইয়াছি। ভবিষ্যতের জন্য বলিয়া রাখি যে রামচন্দ্র সমীপে লক্ষ্মণের ধৈর্য্য এবং যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য ও ভক্তি প্রদর্শন কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণের মনে রাখিতে হইবে যে পিত্রাধিক জ্যেষ্ঠের সঙ্গে তিনি বনবাসী ভিখারী। মেঘনাদ মাতৃসদনে বিদায় গ্রহণকালে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণের অনেকস্থলে, তাহাই আদর্শ হওয়া উচিত। রাবণের সভায় প্রথমে যে দূত আসিয়াছিল, সে যদি অত তাড়াতাড়ি কথা না কহিত, তবে চমৎকার হইত, দূত সুন্দর কাঁদিয়াছিল।

অভিনেত্রীরা সকলেই ভাল, প্রমীলা সর্বোৎকৃষ্ট। সরমার গলা চিরিয়া না গেলে তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিতেন। নাট্যমঞ্চ হইতে অপসৃত হইবার সময় অভিনেত্রীরা একটু কোমল ভাবাবলম্বন করেন, এই আমাদের ইচ্ছা। প্রমীলা যেভাবে লাফাইয়া যান, তাহাতে রামায়ণের সার্থকতা হয় বটে, কিন্তু একটু রসভঙ্গ হয়। আর অভিনেত্রীদিগকে একটু ভাবব্যঞ্জকতা শিখাইতে হইবে, সে বিষয়ে এখনও ত্রুটি আছে।"[১৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের "মেঘনাদবধ" নাট্যরূপের ভূমিকায় বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত 'রামচন্দ্র' চরিত্রের নিন্দা করেছেন। অন্যত্র তিনি 'মেঘনাদ' ভূমিকার রূপারোপে বেঙ্গল থিয়েটার ও ন্যাশনাল থিয়েটারের পার্থক্য সম্পর্কে বলেছেন,—

"সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বেঙ্গল থিয়েটারে' 'মেঘনাদবধ' নাটকে মেঘনাদের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। যুদ্ধযাত্রাকালীন মন্দোদরীর নিকট বিদায়-দৃশ্যে, মাতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত 'মেঘনাদ'-বেশী কিরণবাবু "কেন মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে রক্ষোবৈরী" বলিয়া এমনই সবেগে তরবারী কোষমুক্ত করিতেন যে, সূতা কাটিয়া গিয়া একরাত্রে মন্দোদরীর হাতের তাবিজ ষ্টেজে পড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য গিরিশচন্দ্র তরবারী স্পর্শও করিতেন না। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুলা জননীকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত বীর ও মাতৃভক্ত সন্তানের যেরূপ বিনয়, গাম্ভীর্য্য এবং বীরত্বাভিমানের আবশ্যক, গিরিশচন্দ্র এই দৃশ্যে সেই রস অবতারণা করিতেন। আবার যজ্ঞাগার-দৃশ্যে যখন তিনি "ক্ষত্রকুলগ্লানি শত ধিক তোরে

১৬। 'সাধারণী', ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ খ্রীঃ, ২৯ মাঘ ১২৮৪সাল, ৯ম ভাগ, ১৫শ সংখ্যা।

লক্ষ্মণ" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন, তখন তাঁহার সেই শান্ত ও সৌম্য মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিত—বক্ষস্থল যেন দ্বিগুণ ফুলিয়া উঠিত। পলকের মধ্যে এই ভীষণ পরিবর্ত্তনে দর্শকগণ স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন।"[১৭]

* * * *

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র পাথুরিয়াঘাটার নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ৬ বিডন স্ট্রীটে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে'র জমিতে 'মিনার্ভা থিয়েটার' (মে ১৮৯২ খ্রীঃ—মার্চ ১৮৯৯ খ্রীঃ) নামে এক নতুন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গিরিশচন্দ্র এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় নগেন্দ্রভূষণকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন এবং 'সিটি থিয়েটার' পরিত্যাগ করে স্বয়ং নট, নাট্যকার ও নাট্যাধ্যক্ষ হিসাবে এখানে যোগদান করে প্রায় চার বৎসর (মে ১৮৯২ খ্রীঃ—মার্চ ১৮৯৬ খ্রীঃ)। অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সঙ্গে অনেক অভিনেতাই মিনার্ভায় চলে এসেছিলেন। এখানে তাঁর রচিত 'ম্যাকবেথ' (২৮ জানুয়ারি ১৮৯৩ খ্রীঃ), 'মুকুল-মুঞ্জরা' (৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ খ্রীঃ), 'আবু হোসেন' (২৫ মার্চ ১৮৯৩ খ্রীঃ), 'সপ্তমীতে বিসর্জন' (৭ অক্টোবর ১৮৯৩ খ্রীঃ), 'জনা' (২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩ খ্রীঃ), 'বড়দিনের বকশিস্' (২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৩ খ্রীঃ), 'স্বপ্নের ফুল' (১৭ নভেম্বর ১৮৯৪ খ্রীঃ), 'সভ্যতার পাণ্ডা' (২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৪ খ্রীঃ) 'করমেতিবাঈ' (১৮ মে ১৮৯৫ খ্রীঃ), 'ফণির মণি' (২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫ খ্রীঃ), 'পাঁচ কনে' (৫ জানুয়ারি ১৮৯৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি নতুন নাটক, গীতিনাট্য ও পঞ্চরং-এর সঙ্গে সঙ্গে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ' (২৩ মে ১৮৯৩ খ্রীঃ), 'প্রফুল্ল' (১৩ জুলাই ১৮৯৫ খ্রীঃ),

১৭। 'গিরিশচন্দ্র', চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা—১৩৪-১৩৫।

'মেঘনাদ বধ' (২৫ আগষ্ট ১৮৯৫ খ্রীঃ), 'পলাশীর যুদ্ধ' (৩০ নভেম্বর ১৮৯৫ খ্রীঃ) প্রভৃতি আগেকার লেখা মঞ্চসফল নাটক ও নাট্যরূপগুলিও সাফল্যের সাথে বার বার অভিনীত হয়। বস্তুতঃ মিনার্ভা থিয়েটারের সূচনালগ্নে গিরিশচন্দ্র যতদিন নাট্যাধ্যক্ষ ছিলেন, ততদিন মিনার্ভা থিয়েটারের ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের ইতিহাস।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মিনার্ভা থিয়েটারে "মেঘনাদ বধ" নাট্যরূপটি ২৫ আগষ্ট ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়। পূর্ববর্তী ন্যাশনাল থিয়েটারের ন্যায় গিরিশচন্দ্র এই অভিনয়েও যথারীতি রাম ও মেঘনাদের দ্বৈত ভূমিকায় রূপারোপ করেন। অন্যান্য ভূমিকায় কে কে অভিনয় করেছিলেন, তা জানা যায় না। তবে মেঘনাদ বধের অভিনয় যে এখানে একাধিকবার সংঘটিত হয়েছিল, এ বিষয়ে সকলেই একমত। এই অভিনয়ের মঞ্চ-পরিকল্পনা করেছেন প্রখ্যাত মঞ্চশিল্পী ধর্মদাস সুর ও নৃত্য-সংযোজনা করেছেন গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়-নৈপুণ্যে, প্রয়োগ-চাতুর্যে ও অভিনবত্বে মেঘনাদ বধের অভিনয় একদিকে যেমন দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; অন্যদিকে তেমনি প্রভূত ধনাগমে মিনার্ভা থিয়েটারের কোষাগারকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। এ সম্বন্ধে অবিনাশচন্দ্র বলেছেন,—

"'মেঘনাদ বধে'র অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল,—তৎসঙ্গে নাট্যশিল্পী ধর্ম্মদাসবাবু প্রদর্শিত স্বর্গ ও নরকের অপূর্ব্ব দৃশ্য এবং গোবর্দ্ধনবাবুর নৃত্য-সংযোজনার নূতনত্বে নাটকখানি আরও চমকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'প্রফুল্ল', এবং 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ে নূতন নাটকের ন্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল।"[১৮]

১৮। 'গিরিশচন্দ্র', অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা—২৮৪

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১ এপ্রিল ১৮৭৬ খ্রীঃ—৬ জানুয়ারি ১৯১৬খ্রীঃ) ৬৮ বিডন স্ট্রীটে অবস্থিত 'এমারেল্ড থিয়েটার' লিজ নিয়ে 'ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী' (এপ্রিল ১৮৯৭ খ্রীঃ – মে ১৯০৬ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৬ এপ্রিল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শুক্রবার গুডফ্রাইডের দিন উদ্বোধন রজনীতে এখানে অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত পৌরানিক নাটক 'নল-দময়ন্তী' ও জনপ্রিয় পঞ্চরং 'বেল্লিকবাজার'। প্রতিষ্ঠার বৎসরাধিক কাল পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্র তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে (দানিবাবু) নিয়ে ঐ থিয়েটারে যোগদান করেন। এঁদের আসার পর অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে দিয়ে "মেঘনাদ বধ" নাট্যরূপটি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়ে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এবং দর্শকদের ক্রমবর্ধমান সঙ্গীত-পিপাসা পরিতৃপ্ত করতে "বীর সাজে আজি সাজে রক্ষকুল-কামিনী" ও "এত কেন গরব লো তোর ঢ'লে ফুল গড়িয়ে গেলি" গান দুটি রচনা করে দেন। অমরেন্দ্রনাথ রচিত এই গান দুটি সম্বন্ধে রমাপতি দত্ত বলেছেন,

> "....গান দুইটী এত লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে, সেই হইতে অদ্যাবধি যখনই যেখানে 'মেঘনাদ বধ' অভিনীত হইয়াছে, প্রত্যেক অভিনয়েই অমরেন্দ্রনাথের গান দুইটী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এমন কি, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ও গিরিশচন্দ্র কর্তৃক গ্রথিত 'মেঘনাদ বধ' নাটকের মুদ্রিত সংস্করণেও, যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক গান দুইটী সংযুক্ত হইয়াছে।"[১৯]

ক্লাসিক থিয়েটারে "মেঘনাদ বধ" অভিনীত হয়েছিল জুলাই মাসের মাঝামাঝি। অভিনয় করেছেন,—

১৯। 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ সাল, পৃষ্ঠা—১৯১।

রাম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ ; লক্ষ্মণ—মহেন্দ্রলাল বসু ; রাবণ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য; মেঘনাদ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত; বিভীষণ—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; হনুমান—অঘোরনাথ পাঠক ; প্রমীলা—প্রমদাসুন্দরী ; নৃমুণ্ডমালিনী—পান্নারাণী প্রভৃতি।

লক্ষ্মণের ভূমিকাভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু একজন উচ্চমানের অভিনেতা ছিলেন। তাঁর বাস্তবানুগ অভিনয়, কণ্ঠস্বরের বিশুদ্ধতা, চরিত্রোপযোগী অঙ্গ-সঞ্চালন ও ভাবপ্রকাশ অতি সহজেই দর্শকচিত্ত জয় করতে পারত। তাঁর তিরোধানের পর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র বলেছেন,—

"'মেঘনাদে' লক্ষ্মণ"রূপে মহাদেবকে সমরে আহ্বান, রামের নিকট বিদায় গ্রহণ ও যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিতকে আক্রমণ—এ সকলের অভিনয় আমি স্মৃতি থাকিতে ভুলিব না।"[২০]

ক্লাসিক থিয়েটারে "মেঘনাদ বধে"র অভিনয় শুরুর কিছু দিনের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় মহেন্দ্রলাল ক্লাসিক থিয়েটার পরিত্যাগ করে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করলে দানিবাবু লক্ষ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে "মেঘনাদ বধ" পুনরভিনীত হলে অবশ্য দেখা যায়, মহেন্দ্রলাল আবার পূর্বেকার লক্ষ্মণের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রাম ও মেঘনাদের চরিত্রে এবারেও অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ। প্রত্যেক ভূমিকাভিনেতা বিশেষ করে মেঘনাদের রূপসজ্জায় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়-প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে রমাপতি দত্ত বলেছেন,

"...প্রত্যেক ভূমিকাই খুব কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইল। তবে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগার দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' পড়িয়া গেল। তাঁহার মত রঙ্গমঞ্চোপযোগী আকৃতি-বিশিষ্ট নট অদ্যাবধি কোন রঙ্গালয়ে অভিনয় করেন নাই। তিনি

২০। মহেন্দ্রলাল বসু, গিরিশ-গ্রন্থাবলী, নবম ভাগ, পৃষ্ঠা—৩০৯।

ষ্টেজে অবতীর্ণ হইলে মনে হইত, যথার্থই যেন তাঁহার শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া রঙ্গপীঠ আলোকিত করিতেছে। সেই সুঠাম সুন্দর মূর্ত্তি যখন ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া লক্ষ্মণকে ধিক্কার দিত, দর্শকগণ চক্ষের সম্মুখে নিমেষ মধ্যে সেই সৌম্য মুখমণ্ডল রোষারক্তিম রূপে পরিণত দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া যাইতেন; আবার সেই মেঘনাদই যখন বিভীষণকে কক্ষদ্বারে দ্বাররক্ষীরূপে দণ্ডায়মান দেখিয়া হতাশা ও গঞ্জনাব্যঞ্জক সুরে বলিতেন,—

"এতক্ষণে
জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষপুরে।"

তখন সকলে ভুলিয়া যাইতেন যে, এটা অভিনয়,—ত্রেতাযুগের মেঘনাদ নহে। যৌবনে গিরিশচন্দ্র এই ভূমিকায় অভিনয় করিয়া 'বঙ্গের গ্যারিক' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহারা মেঘনাদরূপী অমরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, অমরেন্দ্রনাথ এই ভূমিকার অভিনয়ে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তাই কবি অমরেন্দ্র-তিরোধানে অতি খেদে গাহিয়াছিলেন,—

"মেঘনাদ সিংহনাদে ব্যাপি রঙ্গস্থলে,
লক্ষ্মণে শাসিবে কেবা একা যজ্ঞস্থলে?
রোধি' অস্ত্র ঝনৎকার,
কোদণ্ডের সে টঙ্কার,
"লঙ্কার পঙ্কজ রবি যাবে অস্তাচলে।"[২১]

২১। 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', পৃষ্ঠা—১৯২-১৯৩।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও (৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩ খ্রীঃ—১৭ নভেম্বর ১৯৩১ খ্রীঃ) "মেঘনাদবধ কাব্যে"র একটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক এই নাট্যরূপটি ২৭ জানুয়ারি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনষ্টিট্যুট রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় শুরু হয় সন্ধ্যা ছ'টায় এবং শেষ হয় রাত ন'টায়। এটি পরিচালনা করেছেন নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন,—

রাবণ—ক্ষেত্রমোহণ মুখোপাধ্যায় বি. এ.; মেঘনাদ—দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; বিভীষণ—নৃপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি. এ; রাম—কিরণচন্দ্র দত্ত; লক্ষ্মণ—প্রসন্নকুমার ঘোষাল বি. এ; সারণ ও চিত্ররথ—বিজয়চন্দ্র দত্ত বি. এ; দূত—প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস বি. এ; হনুমান ও প্রভাসা—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়; চিত্রাঙ্গদা—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; প্রমীলা—শ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই নাট্যানুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উদ্বোধন রজনীতে তিনি বলেছেন,

"It was a matter of sincere congratulation that for the first time in the history of Bengali Drama so many young graduates and under-graduates of Calcutta had come forward to take part in a performance like this; the super-vision and direction could not have been in better hands and he believed that these per-formances would in future determine and guide the National Stage."[২৩]

২৩। 'পঁচাত্তর বছরের নাট্য ইতিহাস', ধীরেন্দ্রনাথ বিশী, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের স্মারক গ্রন্থ PLATINUM JUBILEE 1891-1966, Page—174।

রাজা প্যারীমোহনের এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষির মত সেদিন অভিনয়-মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছিলেন, উত্তরকালে তা সত্যে পরিণত হয়েছিল। বস্তুত, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের "মেঘনাদ বধ" অভিনয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পূর্ববর্তী আর কোনও অভিনয়েই একদিকে যেমন অভিনেতা ও দর্শকমণ্ডলী মধ্যে এত শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হয়নি, অন্যদিকে তেমনি এর পর থেকেই অভিনয়-ক্ষেত্রে আরম্ভ হয় ইনস্টিট্যুটের গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণযুগের ইতিহাস। মনে রাখতে হবে, এখানকার অভিনয়ের মাধ্যমেই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ নট ও নাট্য-পরিচালক লোকোত্তর প্রতিভাধর নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর (২ অক্টোবর ১৮৮৯ খ্রীঃ—২৯ জুন ১৯৫৯ খ্রীঃ) আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের "মেঘনাদ বধ" নাট্যরূপের অভিনয় আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করেছিল। এই সাফল্যই এখানকার সভ্যদের পরবর্তীকালে এর পুনরভিনয়ে অনুপ্রাণিত করেছিল। দ্বিতীয় রজনীর অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য দর্শকমণ্ডলীমধ্যে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ। ডঃ সুকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন,—

> "...The success of the function was so great that the performance had to be respected a second time in the presence of Sir John Woodbourn, K. C. S. I., the Lieutenant Governor of Bengal, at a distinguished gathering."[২৪]

এই অভিনয় দেখে ছোটলাট অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি

২৪। 'A Short History', PLATINUM JUBILEE 1891-1966 স্মারক গ্রন্থ, Page—43।

অভিনয়ে কতখানি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে ধীরেন্দ্রনাথ বিশী সুন্দর একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

"...স্যার উডবার্ণ অভিনয়ের প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ছোট একটি ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। "মেঘনাদ বধে" শ্রীরামচন্দ্রের একটি প্রার্থনার দৃশ্য আছে। সেই দৃশ্যটির অভিনয়কালে স্যার উডবার্ণ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেন, রাম প্রার্থনা করছেন। শোনামাত্র স্যার উডবার্ণ ভক্তিভরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। সমবেত দর্শকবৃন্দও তাঁর দেখাদেখি আসন থেকে উঠে পড়েন।"[২৫]

এই অভিনয় ছোটলাটের খুব ভালো লেগেছিল বলেই তিনি আলিপুরে অবস্থিত তাঁর বেলভেডিয়ার প্রাসাদ-উদ্যানে ইন্‌ষ্টিট্যুটের শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে এক সম্মেলনে আপ্যায়িত করেছেন।

বেঙ্গল থিয়েটারের নাট্যরূপের মত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাট্যরূপটিও বোধ হয় মুদ্রিত হয়নি কোনদিন। পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই হারিয়ে গেছে মহাকালের অদৃশ্য ইঙ্গিতে।

———

২৫। 'পঁচাত্তর বছরের নাট্য ইতিহাস', PLATINUM JUBILEE Page—174।

ভাগবত প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ

'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'। মহাভারতে নেই এমন জিনিষ নেই ভারতবর্ষে। এই মহাভারতের যিনি রচয়িতা সেই মহামুনি বেদব্যাস সম্পর্কেও কথাটি ঘুরিয়ে বলা যায়—ভারতীয় ঐতিহ্যের, তার শাস্ত্র-ধ্যান-চিন্তার এমন কোন প্রসঙ্গ নেই যা বেদব্যাস কোন না কোনভাবে প্রকাশ করেননি। ভারতআত্মার মর্মবাণী প্রকাশিত এবং বিধৃত হয়েছে বেদব্যাসের সৃষ্টির মধ্যে। মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভারত ঐতিহ্যের এক অবিস্মরণীয় কিংবদন্তী পুরুষ, এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বৈদিক ক্রিয়া কর্মের শুদ্ধতা আনার উদ্দেশ্যে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে তিনিই ঋক, যজু, সাম, অথর্ব এই চারভাগে বিভক্ত করলেন—তাই তো তাঁর নাম হল বেদব্যাস। আর সর্ব শ্রেণীর মানুষের সহজ প্রবেশলাভের জন্য বৈদিক জ্ঞান ভাণ্ডারকেই তিনি প্রকাশ করলেন—অন্যরূপে মহাভারত রচনা করে, মহাভারতকে বলা হয় পঞ্চম বেদ। মানুষের মনের মোহান্ধকার দূর করার উদ্দেশ্যেই ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেছিলেন। আর এই মহাভারতের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে সর্ব উপনিষদের সার শ্রীমদভগবদগীতা। তাছাড়া তিনি পুরাণাদি রচনা করে আর্যসভ্যতার নানাদিক উদ্ঘাটিত করেছেন। বেদান্ত ব্রহ্মসূত্রেরও তিনিই রচয়িতা।

কিন্তু এত করেও ব্যাসদেবের অন্তরে প্রশান্তি নেই, প্রসন্নতা নেই। একটা অতৃপ্তি অসন্তোষের ভাব তাঁর অন্তরে সদাজাগ্রত। একদিন অশান্তহৃদয়ে সরস্বতী নদীতীরে তিনি চিন্তাকুল হৃদয়ে বিচরণ করছেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁর

অন্তরের অতৃপ্তির কথা দেবর্ষিকে জানালেন এবং এই অসন্তোষের কারণ ও তা দূরীকরণের উপায় জানতে চাইলেন। দেবর্ষি ব্যাসদেবকে জানালেন—তুমি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছ সন্দেহ নাই, এমনকি শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিসৃত বাণী গীতাও তুমি প্রকাশ করেছ। কিন্তু গীতা যাঁর বাণী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম রমণীয় লীলাকাহিনী তুমি কোথাও তেমন করে প্রকাশ করনি—তাই তোমার মনের এই অতৃপ্তি, অসন্তোষ। শ্রীহরির গুণকর্মলীলা বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করলেই তোমার মনের সব অতৃপ্তি দূর হবে, মনে অপার সন্তোষ ও আনন্দ আসবে এবং নিখিল জগৎবাসীরও পরম কল্যাণ সাধিত হবে। এই বলে দেবর্ষি নারদ তাঁর নিজের পূর্বজীবন কাহিনী বর্ণনা করে শোনালেন কিরূপে শ্রীভগবানের গুণকীর্তন ও লীলাস্মরণ করে তাঁর পরম কল্যাণ সাধিত হয়েছিল, দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বেদব্যাসকে দিলেন চতুঃশ্লোকী যা তিনি পেয়েছিলেন ব্রহ্মার কাছ থেকে। ব্রহ্মা পেয়েছিলেন স্বয়ং নারায়ণের কাছ থেকে। দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে বাসুদেবমন্ত্র ও চতুঃশ্লোকী পেয়ে মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন এবং তাঁর লীলা প্রত্যক্ষ করে রচনা করলেন শ্রীমদ্‌ভাগবত।

শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি তো হল কিন্তু এই পরম রহস্যময় রসমাধুরী জগতে প্রচারিত হবে কিরূপে, তেমন যোগ্য পাত্র কোথায় যিনি জগতে এই হরিকথা প্রচার করবেন। ব্যাসদেব তেমন একটি পুত্রসন্তানের জন্য তপস্যা করলেন। সন্তান এলো মাতৃগর্ভে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হলনা। সুদীর্ঘ ষোড়শবর্ষকাল অতিক্রান্ত হল ঐ সন্তানের মাতৃগর্ভে। তখন গর্ভবতী মাতার অবস্থা দেখে ব্যাসদেব গর্ভস্থ শিশুকে ভূমিষ্ঠ হবার আদেশ করলেন। সন্তান পিতাকে জানালেন পৃথিবী মায়াশূন্য করতে। মায়াশূন্য ধরণীতে আবির্ভূত হলেন শুকদেব এবং গৃহত্যাগ করে তপস্যায় বহির্গত হলেন আজন্মব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব। তাঁকে ফিরিয়ে

আনতে পিতা ব্যাসদেব তাঁর পশ্চাতে ধাবিত হলেন। জলাশয়ে নগ্ন দেহে স্নানরতা অপ্সরাগণ ব্যাসদেবকে দেখে লজ্জা নিবারণের জন্য ব্যস্ত হলেন। কিন্তু পূর্বগামী ষোড়শ বর্ষীয় দিগম্বর শুকদেবকে দেখে অপ্সরাদের লজ্জা হল না। ব্যাসদেব বিস্মিত হলেন। অপ্সরাগণ জানালো—শুকদেব ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা, তাঁর নারী-পুরুষ ভেদজ্ঞান নাই, তাই রমণীদের লজ্জারও কারণ নাই। কিন্তু ব্যাসদেব বয়োবৃদ্ধ হলেও এবং মহাভারতাদি গ্রন্থের রচয়িতা হলেও স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাই অপ্সরাদের এত লজ্জা তাঁকে দেখে। ব্যাসদেব লজ্জা পেলেন এবং ফিরে এলেন তপোবনে।

ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন শুকদেব অর্ধবাহ্যদশায় শুনতে পেলেন পিতা ব্যাসদেবের কণ্ঠনিসৃত ভাগবতের একটি শ্লোক :—

অহো বকী যং স্তনকাল কূটং....ইত্যাদি—অর্থাৎ অহো কী আশ্চর্য! যে দুষ্টা পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার জন্য বিষ লিপ্ত স্তন্য তাঁকে পান করিয়েছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকেও ধাত্রী গতি দান করলেন, তখন তিনি ভিন্ন জগতে এমন দয়ালু আর কে আছেন যে তাঁর ভজনা করব।

অনুসন্ধানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কে জানতে পেরে শুকদেব ফিরে এলেন পিতার তপোবনে এবং পরম আগ্রহে পিতার কাছ থেকে ভাগবত রস আস্বাদন করলেন। ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেবকে ব্যাসদেব দিলেন ভাগবতীয় তত্ত্বরস, লীলামাধুর্য। ব্রহ্মজ্ঞানী হলেন ভক্তিরসে সঞ্জীবিত।

এদিকে আরেকটি ঘটনা ঘটলো। রাজ চক্রবর্তী মহারাজ পরীক্ষিৎ দ্বাপরের শেষে হস্তিনাপুরে রাজসিংহাসনে আসীন। তিনি অভিমন্যুর পুত্র, অর্জুনের পৌত্র। পরীক্ষিৎ আজন্ম কৃষ্ণভক্ত। এমন কি মাতৃজঠরে অবস্থানকালেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের দুর্লভতম মহাসৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অশ্বত্থামা যখন উত্তরার গর্ভ নষ্ট

করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দিয়ে সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমিত করে পরীক্ষিংকে রক্ষা করেছিলেন এবং অঙ্গুষ্ঠমাত্ররূপ ভগবান অচ্যুতকে দর্শনের সৌভাগ্যলাভ হয়েছিল তাঁর মাতৃগর্ভে থেকেই। ভূমিষ্ঠ হবার পর তিনি যাকেই দেখছেন তাকেই তিনি গর্ভে দৃষ্ট পুরুষ কিনা অনুসন্ধান করেছিলেন। 'পরি ঈক্ষন্তে' অর্থাৎ চারিদিকে অন্বেষণ করেছিলেন তাই তাঁর নাম হল পরীক্ষিৎ। বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত বলে তাঁকে বলা হয় 'বিষ্ণুরাত'। বড় সদাচারী ধর্মপরায়ণ সম্রাট তিনি। তাঁর রাজ্যে কলির স্থান নেই। কলিও তৎপর স্থানলাভ করতে। একদিন মৃগয়ায় গিয়ে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে শমীক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন তিনি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। ঋষি তখন ধ্যানস্থ। পিপাসার জল প্রার্থনা করেও না পেয়ে ক্ষুব্ধ বিস্মিত রাজা ঋষির গলায় একটা মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে প্রস্থান করলেন। ঋষিপুত্র শৃঙ্গী খেলার সঙ্গীদের কাছে পিতৃঅবমাননার এই ঘটনা জেনে অভিশাপ দিলেন—আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে সর্পদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। পিতা-পুত্রকে এই শাপ প্রত্যাহার করতে বললেন। কিন্তু ঋষি বালক অবিচল। এই অভিশাপ কার্যকরী হবেই।

এই অলঙ্ঘ্য অভিশাপের কথা জেনে মহারাজ পরীক্ষিৎ ঐহিক সর্বসুখ বিসর্জন দিয়ে পুত্র জনমেজয় হস্তে রাজ্যভার অর্পন করলেন আর গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করলেন নিরন্তর হরিকথা শুনবেন এই অন্তিমবাসনা নিয়ে। কিন্তু তেমন যোগ্য ব্যক্তির দর্শন না পেয়ে অন্তরে আকুল প্রার্থনা নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং তাঁর গঙ্গাতীরে প্রায়োপ-বেশনের কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল এবং মহর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি এমনকি স্বয়ং বেদব্যাস আর নারদও উপস্থিত হলেন সেখানে। এমন

সৌভাগ্য মহারাজার জীবনে আর ঘটেনি। প্রতিকারহীন ব্রহ্মশাপের নিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় সকলেই মুহ্যমান। এমন সময় এক শ্যামবর্ণ আয়তলোচন তেজঃপুঞ্জ কলেবর, দিগম্বর, পরম রমণীয় ঋষিবালকের আবির্ভাব ঘটলো সেখানে। সকলের বিস্ময় দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর প্রতি। ইনিই পরম ভাগবত 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' মহামুনি শ্রীশুকদেব। সমবেত দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষিবৃন্দ পরম সমাদরে বরণ করে নিলেন এই সর্বজ্ঞ পুরুষকে। রাজ চক্রবর্তী মহারাজ পরীক্ষিৎ চরণ বন্দনা করলেন তাঁর। পরীক্ষিতের আশা ও আনন্দ সীমাহীন। 'লোক সুমঙ্গল' হরিকথা শ্রবণের প্রার্থনা জানালেন তাঁকে আর জানতে চাইলেন—

কথয়স্ব মহাভাগ ! যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্॥

—হে মহাভাগ যেরূপে আমি বিষয় সঙ্গরহিত মনকে অখিলবিশ্বের পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সমর্পন করে নিজ দেহ বিসর্জন করতে পারি সেই উপায় আমাকে বলে দিন। বস্তুতঃ মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রার্থনা ও জিজ্ঞাসাই সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রশ্ন ও আলোচ্য বিষয়। আর এই প্রশ্ন শুধু মহারাজ পরীক্ষিতের নয় এই প্রশ্ন সমস্ত মানুষেরই অন্তরের চিরকালের জিজ্ঞাসা।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ও সমবেত মুনিঋষিগণ শ্রীশুকমুখ নির্গলিত এই ভাগবতীকথা শুনেছিলেন—আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের বা কলিযুগারম্ভের ত্রিশ বৎসর পরে—ভাদ্রমাসের শুক্লানবমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত সাতদিন। আর এই পাঁচ হাজার বছরেও সেই ভাগবতীকথা পুরানো হলনা। এমনি এক শাশ্বত শক্তি ও সম্পদ নিহিত রয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধের মধ্যে। অনুমান করা হয় গঙ্গা ও যমুনার মিলন ক্ষেত্র প্রয়াগতীর্থের বিস্তীর্ণ তটভূমিতে

গঙ্গাতটে (মতান্তরে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে) মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ভাগবতকথা শুনেছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিতের পরম সৌভাগ্য যে তিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়েছিলেন তা নাহলে শুকমুখে এই হরিকথামৃত শ্রবণের সৌভাগ্য তো হোত না। তাই আমরা দেখি নিদারুণ অভিশাপও কখনো কখনো পরম আশীর্বাদরূপে মানুষের জীবনে পরম সম্পদ বহন করে নিয়ে আসে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যথার্থ ই 'বিষ্ণুরাত'—বিষ্ণুকর্তৃক রক্ষিত। তাই তিনি এমন অমৃত পানের দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করলেন। কিন্তু আমরা পরবর্তী পাঁচ হাজার বছরের এবং অনাগত আরো সহস্র সহস্র বা লক্ষ কোটি বৎসরের মনুষ্য সম্প্রদায় কিরূপে সেই অমৃতকথা শ্রবণের সুযোগ পেলাম?

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন সভায় অগণিত মুনিঋষি সকলেই তো তন্ময় হয়ে সেই হরিকথা শ্রবণ করলেন কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ও রক্ষণ ধারণের কোন উপায় তাঁদের ছিলনা। তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগল—এই অমূল্য সম্পদ রক্ষার উপায় কি? সর্বান্তর্যামী শুকদেব তখন শ্রীউগ্রশ্রবাসূতের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন —এঁর কাছে সব রেখে গেলাম—এঁর কাছ থেকেই আপনারা সব পাবেন। এই শ্রুতিধর সূতমুনির দ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবত রক্ষিত হল। এমন কি শুকদেব কখন কোন ভঙ্গীতে কোন কথাটি বলেছেন, কখন মৃদুহাস্য করেছেন সব কিছুই সূতমুনির শুদ্ধহৃদয়ে চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ, রক্ষিত হয়ে রইল। পরে নৈমিষ্যারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ যখন যজ্ঞ করছিলেন তখন এই রোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ঋষিগণের প্রার্থনায় সমগ্র ভাগবত কীর্তন করেছিলেন; এইভাবে জগতে শ্রবণমঙ্গল হরিকথা—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার হল। তা না হলে শ্রীশুকদেবের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ

কালক্রমে এই পরম সম্পদ অমৃতরসধারা জগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত। ভগবদিচ্ছায় ভাগবতীকথা এইরূপে জগতে চিরতরে রক্ষিত হল।

ভক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময় বিগ্রহরূপেই গ্রহণ করেন এবং পরম ভক্তিভরে পূজা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধকে শ্রীভগবানের দ্বাদশটি অবয়ব বলে তাঁরা মনে করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল, তৃতীয়-চতুর্থ স্কন্ধ তাঁর দুই উরু। পঞ্চম-ষষ্ঠ তাঁর পার্শ্বদেশ, সপ্তম-অষ্টম দুই বাহু, নবম তাঁর হৃদয়, দশম তাঁর অধরের মধুর হাসি, একাদশ কপাল এবং দ্বাদশ মস্তক। আর দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক এই ভাগবত—

'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং'—বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপরিণত সুপক্ক গলিত মধুর ফল।

সূতমুনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপে কীর্তন করেছেন।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু পুরানানামিদং তথা॥
ক্ষেত্রণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥

হে দ্বিজগণ! নদীসমূহের মাধ্য যেমন গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে যেমন অচ্যুত, বৈষ্ণবদের মধ্যে যেমন শম্ভু, পুরাণ সমূহের মধ্যে সেইরূপ ভাগবত শ্রেষ্ঠ। সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে কাশী যেমন সর্বোত্তম, পুরাণ-সমূহের মধ্যে ভাগবতও তেমনি সর্বোত্তম।

আর ভাগবতী কথার বক্তা, শ্রোতা এমনকি প্রশ্নকর্তা এই তিন শ্রেণীর মানুষকেই কিরূপে পবিত্র করে শ্রীমদ্ভাগবত, এ সম্পর্কে মহামুনি শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখনিসৃত বাণী চিরস্মরণীয়—

বাসুদেব কথা প্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনতিহি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদসলিলং যথা॥

অর্থাৎ তাঁর পাদোদ্ভূতা গঙ্গার ন্যায় বাসুদেব কথাও ইহার বক্তা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতা তিন ব্যক্তিকেই পবিত্র করে।

আচার্যগণ বলেন গীতার যেখানে শেষ ভাগবতের সুরু সেখান থেকেই। গীতায় শ্রীভগবানের সর্বশেষ বাণী 'মামেকং শরণং ব্রজ'। 'মামেকং' অর্থাৎ একমাত্র শ্রীভগবানেরই শরণ নেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে পরম প্রিয় অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত মানুষকে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম থেকেই শ্রীভগবানের স্বরূপ পরিচয় দিয়েছেন এবং কিরূপে তাঁর চরণে শরণ নেওয়া যায় তার কাহিনী বর্ণনা করেছেন অগণিত ভক্তের জাগ্রত জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে। ভাগবতে সেই 'অচ্যুতোদার কথা' প্রসঙ্গ মন্দাকিনী ধারার ন্যায় প্রবাহিত। রসিক, ভাবুক, ভক্তগণ এই অমৃত পান করে জীবন সফল, সার্থক করেন। গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিতের প্রার্থনা ছিল মহামুনি শুকদেবের কাছে—বিষয়সঙ্গরহিত মনকে কিরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমর্পন করে নিজদেহ বিসর্জন দিতে পারবেন। সাতদিন ব্যাপী শ্রবণ মঙ্গল হরিকথা শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ পুনরায় বললেন—

"অনু জানিহি মাং ব্রহ্মণ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্ত কামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজম্যসূন॥"

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্, আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করব এবং বিষয়কামনা বর্জিতচিত্তকে শ্রীকৃষ্ণ নিবেশিত করে প্রাণ পরিত্যাগ করব।

ঐকান্তিকী নিষ্ঠা নিয়ে শ্রবণমঙ্গল হরিকথা শ্রবণের ফলশ্রুতি ইহাই। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর মনকে সর্বপ্রকার বিষয় থেকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়েছেন এবং সমগ্র মন ভগবানে সমর্পন করে প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। সাতদিন পূর্বে শ্রীশুকদেবের চরণে যে প্রার্থনা করেছিলেন সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে আজ। মহারাজ

পরীক্ষিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত। তিনি যথার্থই "বিষ্ণুরাত"।

তিনি পরম ভাগ্যবান। তাই সাতদিন ভাগবত শ্রবণেই তাঁর বিষয়বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়েছিল এবং একমনা হয়ে ভগবানের চরণে আশ্রয় নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ বদ্ধ জীবের পক্ষে তা তো সম্ভব নয়। বহু জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি ও সাধনভজনের ফলে যদি হরিকথা শ্রবণের যথার্থ আগ্রহ জন্মে তাহলেই আমরা বাসুদেব চরণে আত্মসমর্পন করতে সক্ষম হব। মহতের সেবা দ্বারা তাঁদের কৃপালাভ করতে পারলেই 'বাসুদেব কথারুচি' আমাদের চিত্তে আসতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশেষ শ্লোকটি স্মরণ করে আমরা এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের উপসংহার করি—

নাম সংকীর্ত্তনং যস্য সর্বপাপ প্রণাশনং।
প্রণাম দুঃখ শমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥

যাঁর নামসংকীর্তন সর্বপাপের বিনাশক এবং যাঁকে প্রণাম করলে সর্ব দুঃখের অবসান হয়ে থাকে আমি সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

জয়তু শ্রীমদ্ভাগবতম্।
জয়তু মহামুনি শুকদেব।
জয়তু বিষ্ণুরাত পরীক্ষিত মহারাজ।

———

উপনয়ন

শ্রীকল্যাণী মল্লিক

অধুনা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বংশ জাতিগত পরিচয় দিবার সময়ে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলেন। গৃহস্থ নাথেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজা পার্বণাদি ও পারলৌকিক ক্রিয়া পালন করেন। কয়েকটি কথা এ প্রসঙ্গে জ্ঞাপন করিলে আশাকরি কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। উপবীতের যথার্থ অর্থ উপনয়ন কালে গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। কেবল উপবীত ধারণ করিলে ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না, কার্যাতঃ যাহা পালনীয় তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

উপনয়ন—উপবীতের নয়টি সূত্র। তিনটি সূত্রে এক দণ্ডী। মোট তিনদণ্ডী। মনুসংহিতায় ইহার অর্থ অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডী স উচ্যতে॥

অর্থাৎ বাক্‌সংযম, মনে যে সঙ্কল্পাদি উঠে তাহার সংযম এবং শারীরিক বাহ্য আচরণেও সংযম যাঁহার অন্তরে নিহিত তাঁহাকেই "ত্রিদণ্ডী" বলা যায়।

সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্‌।
তৎ সূত্রং বিদিতং যেন, স বিপ্র বেদপারগঃ॥

অর্থাৎ "পরমপদে"র সূচক বলিয়া তাহাকে সূত্র বলা হয়। যিনি এই ব্রহ্মসত্যের যথার্থ মর্ম জ্ঞাত আছেন তিনিই বেদাবিৎ বিপ্র। দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ সমতত্ত্ব 'পরমপদে'র উল্লেখ বারংবার নাথ সাহিত্যে পাইয়াছি।

যেন সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।
তৎ সূত্রং ধারয়েদ্‌ যোগী যোগজিৎ তত্ত্বজ্ঞানবান্‌॥

অর্থাৎ মণিগণ যেমন একসূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

যে সূত্রের দ্বারা অর্থাৎ যাঁহার শক্তির দ্বারা গ্রথিত সেই সূত্রকেই তত্ত্বজ্ঞানী যোগিগণ ধারণ করেন। ইহাই যজ্ঞসূত্র ধারণের চরম আদর্শ।

উপনয়ন ও তৎফলে আজন্ম উপবীত ধারণ যে কঠোর কর্তব্য পালন ও ইহাতে নিষ্টার প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

তৎসহ গায়ত্রী মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিলে ও মর্মার্থ গ্রহণ করিলে আমরা সকলে অমৃতের পুত্র নূতন আলোক পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারব। সেই শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধম্ সপাপবিদ্ধম নাথস্বরূপকে হৃদয়ে উপলব্ধি করব। অতএব বলি—

"ওঁ ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গরূপে অবস্থিত সেই দ্যোতনাত্মক পুরুষের সর্বলোক-প্রার্থনীয় জ্যোঃতিকে আমরা ধ্যান করি। সেই অন্তর্যামী যেন আমাদের বুদ্ধিসকল প্রকৃষ্টরূপে চালনা করেন।

ওঁ তৎ সৎ ॥

আত্মা-পরমাত্মার বাস্তবিক পরিচয়

বি. কে. স্বপ্না

পদার্থ বিজ্ঞানের এই যুগে যে কোন সিদ্ধান্তকে স্বীকার করার পূর্বে তার অনেক প্রয়োগ দেখা হয় যাতে নাকি নির্ধারিত সিদ্ধান্তের সত্যতাকে সুনিশ্চিত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। এইজন্য বিজ্ঞান নিজের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে ভিন্ন ভিন্ন নবীনতম জিনিষকে আবিষ্কার করছে। যেমন অণুশক্তি বিদ্যুৎ-শক্তি যাতে করে বিজ্ঞানের তীব্রবেগী বিকাশ মানুষকে জুটিয়ে দিয়েছে অনেক কিছু ভৌতিক সুখ-সুবিধা।

কিন্তু এতকিছু ভৌতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে অন্যদিকে চারিত্রিক পতন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় কলহ এবং সর্বোপরি বিশ্ব অশান্তি। সঙ্গে সঙ্গে এনে দিচ্ছে কর্মে এবং জীবনে কৃত্রিমতার ছাপ। সাধারণ মানব হয়ে উঠছে দানব।

এই জটিলতম মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে পুনরায় দানব থেকে মানব এবং মানব থেকে দেবতায় রূপান্তরিত কিভাবে হওয়া যায় তার পথ দেখান। "সহজ রাজযোগ"-ই সেই পথ যাতে দানব মানবে এবং মানব দেবতায় রূপান্তরিত হয়।

এই যোগ অথবা Silence-এর দ্বারা আমরা এমন সমাজ তথা দুনিয়া গড়তে পারি যাতে প্রেম, স্নেহ, শান্তি, আনন্দ প্রকৃতরূপে পেতে পারি।

যেমন Science দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন হয়, তেমনি এই Silence দ্বারা চরিত্রের পরিবর্তনও হয়।

এই জন্য প্রথমেই দরকার আত্মার এবং পরমাত্মার বাস্তবিক পরিচয়। চোখের দুই ভ্রূর মধ্যে আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক আলোক

বিন্দুর মত বিরাজ করেন। এই আত্মার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ আর চেতনাশক্তি ভরা রয়েছে। যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা পাখা চালান, আলো জ্বালান, হিটার জ্বালান প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করা যায় তেমনিত এক আত্মশক্তি দ্বারাই মন, বুদ্ধি, সংস্কার, স্মৃতি, মনন, অনুভূতি প্রভৃতি ক্রিয়াশীল হয়। তাছাড়া ঐ একই আত্মশক্তির দ্বারা কতকগুলো গুণেরও প্রকাশ হয়, যেমন,—(১) অন্তর্মুখতা (২) সহনশীলতা (৩) মধুরতা (৪) শীতলতা (৫) হর্ষিতমুখতা (৬) সেবা।

মনে রাখতে হবে এই স্থূল শরীরের মালিক আত্মা বাস্তবক্ষেত্রে পরমধাম নিবাসী। সেই আত্মাই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য এই শরীরের আধার নিয়েছেন। এই আত্মার পিতার নাম পরমপিতা পরমাত্মা শিব। তিনিও আত্মার মত জ্যোতিস্বরূপ। তবে তফাৎ এই যে তাঁর কোন নিজস্ব সূক্ষ্ম অথবা স্থূল শরীর নেই। তিনি অব্যক্ত অপরিবর্তনীয়, অকর্মা, অজন্মা, অভোক্তা। তিনিই একমাত্র সর্বগুণের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

তিনিই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। তিনি নিরাকার, নির্বিকার, নিরহংকার। তিনি সদা মুক্ত, সদা পবিত্র। তিনিই ভাগ্যবিধাতা। তিনিই সৃষ্টিতে কল্পের মধ্যে একবারই এসে নিজের পরিচয় দেন। তাই তাঁকে বলা হয় শম্ভু অথবা স্বয়ম্ভূ। আত্মা যখন বারবার শরীর পরিবর্তনের দ্বারা অনাদিস্বরূপ বিস্মৃত হয়। তখনই পরমাত্মা এসে মধুর মিলনের মধ্যে যোগ-অগ্নির দ্বারা অনাদি সংস্কারের পরিবর্তন আনেন।

ওম্ শান্তি।

মানব কি চায়

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, বিত্থারত্ন

মানব কি চায়? এ প্রশ্নের সহজ ও সরল উত্তর হইতেছে মানব চায় সুখ ও শান্তি। সুখ ও শান্তি যদিও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, তথাপি আমরা সুখ ও শান্তিকে পৃথক করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। দৈহিক ও পারিবারিক স্বচ্ছন্দতাই সুখ এবং মনের প্রসন্নভাব ও নিরুদ্বেগ অবস্থাই শান্তি।

ক্ষুধা পাইয়াছে, কিন্তু আহার্য্য কই? বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিবার পর সাধারণ আহার জুটিল, ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল। কিন্তু এই কি সুখ? কত লোকে কত ভাল ভাল দ্রব্য আহার করে, আমি তো পাইলাম না। অদৃষ্টকে গালি দিলাম, ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইলাম, দেবতা প্রসন্ন হইলেন; উত্তম আহার্য্য জুটিয়া গেল। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও আমি তো প্রসন্ন হইতে পারিলাম না। কত লোকে প্রত্যহ ঐরূপ উত্তম আহার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। আমার ভাগ্যে তাহা জুটে না কেন? আবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া চলিলাম। কত দেবতার দুয়ারে মাথা ঠুকিলাম, মানত করিলাম, পূজা দিলাম। দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া বাসনা পূরণ করিলেন। কিন্তু আমি তো সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না; আরও উত্তম উত্তম ভোগ্যবস্তুর জন্য দিনের পর দিন লালসা বাড়িয়াই চলিল। সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলাম—আহারে সুখ নাই।

পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছি, বিশ্রামের প্রয়োজন। ভগ্ন কুটিরে শয্যা পাতিয়া ঐ শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। পরিশ্রমের কিছু লাঘব হইল; কিন্তু, এই কি আবাস সুখ—এই কি শয্যা সুখ? কত লোকে কত উত্তম উত্তম অট্টালিকায় বাস করে, কত রকম উত্তম উত্তম শয্যায়

শয়ন করে। আর আমার জন্য বিধাতার বিধান এই সামান্য শয্যা আর ভগ্ন কুটির। তবে কিরূপে বলিব যে আমি সুখী! ভাগ্যগুণে একদিন ঐরূপ একটি অট্টালিকার মালিক হইলাম। অট্টালিকাটিকে আসবাব পত্রে উত্তমরূপে সাজাইলাম, দাস দাসীতে গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইল। লোকে বলিতে লাগিল, আমি খুব সুখী। সুখ বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু, আমি তো পরিপূর্ণ সুখী হইতে পারিলাম না। লালসা বাড়িয়া গেল। রাজপ্রাসাদ তো করিতে পারিলাম না। প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান, পুষ্করিণী তো হইল না। পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিলাম—না, বিহারেও সুখ নাই।

কোন মেলায় বা জন সভায় অথবা কোন নিমন্ত্রণ বাটীতে যাইতে হইবে। তথায় বহু লোকের সমাগম হইবে। সুতরাং সাধ্যমত উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু হায়! এ কী দেখিলাম; বহু লোকে আমাপেক্ষা কত সুন্দর সুন্দর, কত দামী দামী বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে। মনে বড় দুঃখ হইল, আমার এই সামান্য বসন ভূষণ উহাদের বসন ভূষণের তুলনায় কত তুচ্ছ—কত নগণ্য।

অল্পদিনের মধ্যে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইল। পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও অলঙ্কারের আতিশয্য বহু গুণে বাড়াইতে সক্ষম হইলাম। এ ব্যাপারে আমার সমতুল বড় একটা কাহাকেও দেখা যায় না। মনে হইল, এ ব্যাপারে অন্তত আমি সুখী। কিন্তু কই, আমি তো প্রকৃত সুখী হইতে পারিলাম না। একদিন এক রাজ পরিবারের অলঙ্কার ও বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাহাদের সহিত তুলনা করিয়া নিজেকে কত ছোট মনে হইল। সুখের পরিবর্তে দুঃখই বাড়িল। পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইলাম,—না, অলঙ্কার ও বেশভূষার পারিপাট্যেও সুখ নাই।

দূরান্তরে যাইতে হইবে, পয়সা নাই, কষ্ট স্বীকার করিয়া পদ ব্রজেই চলিলাম। যাহারা ধনী—যাহাদের পয়সা আছে তাহারা ট্রামে বাসে যাওয়া-আসা করিতেছে; তাহারা কত সুখী। আমার সুখ কোথায়? অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল, এখন ট্রামে বাসে যাতায়াত করি, কখনও বা ট্যাক্সিতেও চড়িয়া যাই। নিজেকে কিছুটা সুখী বলিয়া মনে হইল। কিন্তু, ইহাই কি প্রকৃত সুখ? না। কত লোকে আপনাপন গাড়ী চড়িয়া যাতায়াত করিতেছে। ট্রাম বাসে ভীড়ের চাপ তাহাদের সহ্য করিতে হইতেছে না। তাহারাই তো প্রকৃত সুখী অদৃষ্টের দোহাই দিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। ভাগ্যদেবী প্রসন্না হইলেন। আমারও গাড়ী হইল। ট্রাম বাসের ভীড়ের চাপ আর সহ্য করিতে হয় না। ভাবিলাম, এবার আমি নিশ্চয়ই সুখী। গাড়ী করিয়া বহুদূরে ভ্রমণে গিয়াছি, সহসা গাড়ীটি বিকল হইয়া গেল, কষ্টের অবধি রহিল না। কই গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়াও তো প্রকৃত সুখী হইতে পারিলাম না। অতএব, সিদ্ধান্ত করিতে হইল যানবাহন, গাড়ী-ঘোড়ায় ভ্রমণেও সুখ নাই।

আহার-বিহার, ভোগ-বিলাস, গাড়ী-ঘোড়া, ধন-ঐশ্বর্য্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, রাজতুল্য সম্মান সবই তো পাইয়াছি। কই, সম্রাট্ তো হইতে পারিলাম না। লালসা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। রক্ত বীজের রক্তবিন্দু জাত অসুর গঠনের মত কামনা বাসনা দিনের পর দিন একটি একটি করিয়া মনের মধ্যে উদিত হইয়া দুঃখই বাড়াইয়া দিতে লাগিল। কোন কিছুই স্থায়ী সুখ, প্রকৃত সুখ আনিয়া দিতে সমর্থ হইল না। তবে প্রকৃত সুখ কোথায়? স্থায়ী সুখ কিসে?

নিরালায় বসিয়া ভাবিতেছি, সহসা জ্ঞান গুরু দর্শন দিয়া বলিলেন,—ওরে, ধনৈশ্বর্য্য ভোগবিলসের সুখ প্রকৃত সুখ নয়। যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহা স্বল্পকাল স্থায়ী তাহা কখনও প্রকৃত সুখ আনিয়া দিতে পারে না।

তুমি আত্মতৃপ্ত হইতে যত্নবান হও। আত্মতৃপ্ততাই প্রকৃত সুখ আনিয়া দিতে সক্ষম। ভাবিলাম সত্যই তো ঈশ্বর যখন যেখানে যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন, তাঁহাকে বরণ করিয়া লওয়া, মানিয়া লওয়া, স্বীকার করিয়া লওয়াই কর্তব্য। এই আত্মতৃপ্তিই সুখ। আমি যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই তো পাইয়াছি। যাহা পাইবার, তাহা অবশ্যই পাইব। আমার তো কিছুরই অভাব নাই। এই সন্তোষ ভাব, মনের এই আত্মতৃপ্ত অবস্থাই প্রকৃত সুখ আনিয়া দিতে সক্ষম। কত দরিদ্র ব্যক্তি আজ অনাহারে-অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে। আমার তো দুই বেলা দুই মুঠা শাকান্ন জুটিতেছে। তবে আমি সুখী বৈ কি! কতলোক সামান্য চালাঘরে বাস করে। কতলোক পথে, ফুটপাতে, বারান্দার নিচে দিন যাপন করিতেছে। আর আমি তো, ভগ্নহউক, গৃহে বাস করিতেছি। আমি সুখী বৈ কি! কতলোক নগ্নাবস্থায়, কত দরিদ্র জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া দিন যাপন করিতেছে, আর আমার তো পোষাক পরিচ্ছদের অভাব নাই। তাহা হইলে আমি সুখী বৈ কি! পূর্ণ স্বাস্থ্য, অটুট যৌবনই তো দেহের শ্রীবৃদ্ধি করে। দেহের সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে। ঈশ্বরানুগ্রহে আমি যখন যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমি সুখে আছি। এই আত্মতৃপ্ততাই প্রকৃত সুখ।

সুখ মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু শান্তি? না,—শান্তি অত সহজলভ্য নয়। শান্তি বহুদূরে। ধন জন স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া সুখেই দিন কাটাইতেছি। মনে হইল বেশ শান্তিতেই আছি। একদিন ছেলেটি প্রতিবেশী এক বালকের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে ঝগড়া-মারামারি বাধাইয়া দিল। সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া গেলাম। পরস্পরের বিরুদ্ধে আনিত উভয়ের অভিযোগ শুনিবার পর নিজের ছেলেটিকে কাছে টানিয়া লইয়া প্রতিবেশীর ছেলেটির গালে একটি চড় মারিয়া

গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলাম। নিজের ছেলেটির দোষ দেখিয়াও দেখিলাম না। ছেলেটিকে বাড়ীতে লইয়া আসিতে আসিতে মন্তব্য করিলাম,—না, এ ছোট লোকের পাড়ায় আর শান্তিতে বাস করা চলিবে না। অল্পক্ষণ পরেই ঐ বালকটির অভিভাবক স্বদলবলে দরজায় আসিয়া চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের কত অপ্রিয় কথা বলিলাম। কত অপ্রিয় কথা শুনিতেও হইল। বালকটিকে মারার অপরাধে তাহাদের নিকট ক্ষমাও চাহিতে হইল। গোলমাল মিটিল বটে ; কিন্তু—মনের শান্তি তো ফিরিয়া আসিল না। বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিলাম। হায় শান্তি! তুমি কোথায়? কতদূরে?

ইলিশমাছ! হ্যাঁ, একটা বড় ইলিশমাছ বেশ মোটা দামে কিনিয়া দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া বাড়ী ফিরিতেছি, আর মনে মনে ভাবিতেছি, বেটা দাম বেশী লইয়া ঠকাইয়া দিল না তো? মাছটা পচা হইবে না তো? এইসব ভাবিতে ভাবিতে মাছটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম মাছটা সত্যই পচা কি না। ঠিক ঐ সময়ই দুই তিন জন পথচারী ঐ পথে আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে বলিয়া উঠিল। 'কি মশাই, হঠাৎ বড়লোক হয়েছেন না কি?' আমি বলিলাম, 'তার মানে?' 'মানে বুঝলেন না? পয়সা হয়েছে, গোটা ইলিশমাছ কিনেছেন—কিনুন, তো অত গরম কিসের?' রাগিয়া বলিলাম, 'গরম কি দেখালাম?' 'গরম দেখালেন না? তবে মাছটা আমাদের মুখের সামনে তুলে ধরলেন কেন?' অপর এক পথচারী বলিয়া উঠিল, 'চুরির পয়সায়, না হয় উপরি রোজগারের পয়সায় ওরকম লাট সাহেবী সবাই দেখাতে পারে।' বলিয়া ফেলিলাম, 'মুখ সামলে কথা বলবে, চুরির পয়সা! দুই গালে চার চড় দিয়ে বাঁদরামি ছুটিয়ে দেব।' লোকটি হাত গুটাইয়া আগাইয়া আসিল, আমিও প্রস্তুত। এমন সময় অপর এক ব্যক্তি আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কি হয়েছে মশাই'?' আমি কিছু বলিবার আগেই ঐ লোকটি বলিয়া উঠিল, 'দেখুন না মশাই, যে বাজার পড়েছে, তাতে দুবেলা ভাত-ডালের পয়সা জোগাড় করা লোকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তোর পয়সার গরম হ'য়েছে, গোটা ইলিশ কিনেছিস্ ভাল কথা, তো আমাদের মুখের সামনে তুলে তুলে দেখাবার কি দরকার? আমরা কি গোটা ইলিশ কখন দেখিনি; না খাইনি?' আমি বলিলাম, 'না মশাই, মাছটা পচা কিনা তাই দেখছিলাম, আর এ লোকটা···।' আমাকে বাধা দিয়া প্রথম পথচারীটি বলিল, 'দেখার কি আছে? দেখেই তো কিনেছ, এখন কথা ঘুরিয়ে সাধু সাজা হচ্ছে।' অপর সঙ্গী বলিয়া উঠিল, 'বাড়ী নিয়ে গিয়ে শো কেসে ঝুলিয়ে রেখে দিনরাত দেখ্‌গে। খেয়ে ফেল্‌লে কালতো আর দেখবে না, আর কেনবার পয়সাও জুটবে না'। রাগে শরীর টগ্‌বগ্ করিয়া ফুলিয়া উঠিল। মনে হইল, লোকটির মাথাটা গুঁড়া করিয়া দিই। কিন্তু, প্রতিপক্ষ দলে ভারী। তাই আর কথা কাটাকাটি না করিয়া রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলাম। পয়সা দিয়া জিনিষ কিনিয়া ভালমন্দ খাইব, তাহাতেও শান্তি নাই, লোকের চোখ টাটাইবে, নানান কথা শুনাইবে।

ঘটনাটি আমার জীবনে ঘটিয়াছিল বহুদিন পূর্বে। তথাপি ঘটনাটি মধ্যে মধ্যে মনে পড়িলেই রাগে শরীর জ্বলিয়া উঠিত। মনে হইত ব্যাটাকে যদি এখন হাতের কাছে পাইতাম, তবে উচিত শিক্ষা দিয়া দিতাম। মন শান্ত হইতে বেশ কিছু সময় লাগিত। সামান্য একটি ইলিশ মাছ যে মনের শান্তি এইরূপভাবে নষ্ট করিতে পারে, তাহা কোনদিনই ভাবি নাই। ঘটনাটি ভুলিয়া গিয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না। ঘটনাটি ভুলিয়া গেলে আপনাদের জন্য এ গল্প লিখিতে পারিতাম না। এখনও ঐ ইলিশ মাছ কেনার ঘটনাটি মধ্যে মধ্যে মনে পড়িয়া যায়; তবে ক্রোধে শরীর আর জ্বলিয়া উঠে না।

মনের শান্তি নষ্ট হয়না। কেন হয় না, এবার সেই কথাই বলিবার চেষ্টা করি।

কিসে শান্তি পাওয়া যায় বসিয়া ভাবিতেছি। জ্ঞানগুরু বলিয়া দিলেন,—আত্মসমালোচনা, আত্মদোষানুসন্ধান, আত্মনির্য্যাতনই স্থায়ী শান্তি আনয়ন করিয়া দিতে সক্ষম। তুমি আত্মসমালোচক হও, আত্ম-দোষানুসন্ধানী হও, আত্ম নির্য্যাতনী হও, শান্তি পাইবে। প্রতিটি কার্যে, প্রতিটি ঘটনায় আমরা অপরের কার্য্যের, অপরের বাক্যের সমালোচনা করিয়া তাহাদের দোষ অন্বেষণে সোচ্চার হইয়া উঠি। একবারও নিজের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া দেখিনা—কাজটা ভাল করিলাম কি না। একবারও চিন্তা করিয়া দেখিনা যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা আমার বলা উচিত হইয়াছে কি না। আমরা এইরূপই স্বার্থপর। ক্রোধের উদ্রেক হইলে আমরা অপরকে গালিগালাজ করিয়া, মারধর করিয়া গায়ের জ্বালা মিটাই। অপরের শান্তি হরণ করি। নিজে শান্তি পাইব কিরূপে! প্রত্যহ রাত্রে শয্যা গ্রহণের সময় শয্যায় বসিয়া চিন্তা করিতে হইবে যে, আজ আমি যাহা যাহা করিয়াছি, তাহাতে কি অপরের কোন ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে কি অপরের মনে কোন আঘাত দিয়াছি? যদি এইরূপ কিছু করিয়া থাকি, যদি এইরূপ কিছু বলিয়া থাকি তাহা হইলে ইষ্ট দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইতে হইবে,—হে দেব, আমার জীবনে আজ যে সকল অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছে, কাল যেন আর সেইরূপটি না ঘটে। আজ যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়া, যে সকল অপ্রিয় কথা বলিয়া অপরের মনে আঘাত দিয়াছি; আগামী কাল আর যেন সেইরূপ কিছু না করি। প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া পুনরায় প্রার্থনা করিতে হইবে। হে প্রভু, কাল আমার জীবনে যে সকল অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছে, যে সকল অপ্রিয় বাক্য বলিয়া অপরের মনে আঘাত দিয়াছি, আজ যেন আর সেরূপ

কিছু করিতে না হয়। কাহারও উপর ক্রোধের উদ্রেক হইলে নিজের গালে চপেটাঘাত করিয়া আত্মনির্য্যাতন করিতে হইবে। এইরূপ আত্মসমালোচক, এইরূপ আত্মদোষানুসন্ধানী, এইরূপ আত্মনির্য্যাতন-কারী হইতে পারিলে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যাইবে। শান্তি বহুদূরে নয়। শান্তি আমার অন্তরে চির বিরাজমান।

———

তোমাকেই ডেকেছে মানুষ

অধ্যাপক উমাপদ নাথ

দাউ দাউ অগ্নি জ্বলে, বৈশ্বানর মহাক্রুদ্ধ শিবে
অস্ফালিছে উষ্ণাকাশে। ঘাসের বুকের প্রাণকণা
অগ্নি-অণু শুধু যেন, পিপাসার স্বচ্ছ ঠাণ্ডা নীরে
গলিত লাভার থাবা : মাথার চাঁদোয়া বিষফণা।

আগুন আগুন, জ্বলো। নির্বিচারে পুড়াও জঞ্জাল।
পুড়িয়ো না শুধু ঘর, জননীর জ্যান্ত প্রাণভূমি
নিয়ো না নিশ্বাসে কেড়ে। মাটির ফাটলে তাল তাল
ঢালো তব বিষোত্তাপ, গুপ্তপাপ নাও ওষ্ঠে চুমি'।

ভারন্যুব্জ পৃথিবী যে। বহিরঙ্গে বিদ্রোহের জ্বালা,
অন্তরে অশান্তি আর মাঠে মাঠে আগুনের চাষ।
পণ্য নয়, ফুল্কি শুধু সৃষ্টি করে ব্যস্ত কর্মশালা :
জ্বলন্ত বনের মাঝে অগ্নিপায়ী মানুষের বাস।

আগুন এসেছ তুমি ? তোমাকেই ডেকেছে মানুষ।
তোমার প্রলম্ব জিভে চেটে চেটে সর্বস্ব সবার
শূন্য কর সর্বপ্রাণ, মত্ততার ফুলন্ত ফানুষ
নষ্ট হোক, জন্ম হোক পরিশ্রান্ত শান্ত শূন্যতার।

সেই শূন্য সৃষ্টিময় মনের গানের দীপ জ্বেলে
স্নিগ্ধতায় ভরে দেবে এ-বিশ্ব শেফালিরঙ ঢেলে।

পূজোর খুশী

অরুণাপ্রভা দেবনাথ

দিকে দিকে সোরগোল বাজে কাশী ঢাকঢোল
উৎসবে মুখর ধরণী,
একটি বছর শেষে এসেছে আবার হেসে
ভগবতী জগৎ-জননী।
দশভুজা দুর্গার নেই সীমা করুণার
দয়াময়ী, দয়ারসাগর,
মা মোদের মৃন্ময়ী তবু সে যে চিন্ময়ী
অনন্ত রূপ-শোভা তার।
ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে মন্দিরে মন্দিরে
ভীড়ে শত সহস্রজনে,
হেরিয়া মায়ের মুখ যন্ত্রণা-জ্বালা-দুখ
ঘুচাইবে যত আছে মনে।
নব নব সাজ পড়ে সারাদিন রাত ধরে
ঘুরে সবে পাড়ায় পাড়ায়,
পূজোর খুশীতে আজ ভুলে গিয়ে সবকাজ
হেসে খেলে সময় কাটায়।
বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দ নাহি ধরে
মৃদু হাসি সকলের মুখে,
ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে খুসীর আবেগ নিয়ে
মিলায় সবাই বুক বুকে।
এমন সুখের দিন সোনাঝরা রঙীন
আসে নাকো কভু বারে বার,
মা'র শুভ আগমনে জেগেছে বাঙালী মনে
আজ মহাখুশীর জোয়ার।

অনন্যা অনুরূপা

ধীরেন দেবনাথ, এম-এস-সি, বি-এড

[১]

অনুরূপার বাবা অপরেশ নাথ কলকাতার এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কেরাণীর চাকরী করে বছর দুই হয় অবসর নিয়েছেন। অপরেশ বাবুর দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। ছেলেরা অনুরূপার বড়। অনুরাধা সর্বকনিষ্ঠা। চার ছেলে মেয়ের মধ্যে অনুরূপার প্রতি অপরেশ বাবুর টান্‌টা যেন একটু বেশীই। এর কারণও অবশ্য আছে। অপরেশ বাবুর স্ত্রী মলিনা দেবী যখন ইহধাম ত্যাগ করেন তখন অনুরূপার কতই বা আর বয়স—তের কী চৌদ্দ। প্রিয়তমার আকস্মিক বিয়োগে তিনি যখন নিঃসঙ্গ, বিরহবেদনাহত—অনুরূপাই তখন সংসারের হালটি বেশ শক্ত হাতেই চেপে ধরে। অনুরূপা অবতীর্ণ হয় এক আদর্শ গৃহিণীর ভূমিকায়। হাসিমুখে সংসারের সকল কাজ-কর্ম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করে নিজের পড়াশুনাও চালিয়ে যেতে থাকে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে। এই ক্ষুদ্র বালিকা কখনই তার বাবাকে তার মায়ের অভাব বুঝতে দেয়না। অনুরূপার জন্যই তিনি কখনও মুখ কালো করে থাকতে পারেন না। কখনও চোখে জল দেখলে ও অভিমানের সুরে বলে, "তুমি যদি চোখে জল আনো বাবা তাহলে আমরা কী করব ?" অপরেশ বাবু তৎক্ষণাৎ চোখের জল মুছে মুখে মৃদুহাসি টেনে অপত্য স্নেহে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, "কোথায় কাঁদছি পাগলী ? দেখ্‌তো, আমার চোখে জল আছে না কি ? তোর জন্যে এই বুড়ো ছেলেটার কাঁদবার কী আর জো আছে ?" এহেন মেয়ের প্রতি বাবার স্নেহ-মমতা যে একটু বেশীই থাকবে তাতে আশ্চর্যের আর কী আছে।

অপরেশ বাবুর দুই ছেলেই গ্রাজুয়েট। বড় ছেলে সুশান্ত এলাহাবাদে এক ব্যাঙ্ক অফিসার। বছর চারেক হয় বিয়ে হয়েছে এলাহাবাদে প্রবাসী এক বাঙালী ডাক্তারের এক পরমাসুন্দরী ও উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের সাথে। বিয়ের আগে ও প্রতিমাসেই কিছু না কিছু পাঠাত। কিন্তু বিয়ের পর তা' পুরোপুরি বন্ধ। শুধু যে টাকা পাঠানই বন্ধ হয়েছে তাই নয়—যোগাযোগও। আর ছোট ছেলে সুকান্ত বর্তমানে 'চৌধুরী টি কোম্পানী'র ম্যানেজিং ডাইরেকটর। সুকান্ত কিভাবে বা কার অনুগ্রহে এই সর্বোচ্চ পদটি প্রাপ্ত হল, সে এক বিরাট ইতিহাস।

[২]

অন্তরার বয়স যখন মাত্র এক বছর তখন একদিন রাতে অন্তরার মা মধুমালা ও বাবা সুমন্ত্র চৌধুরীর মধ্যে এক ভীষণ ঝগড়া হয়। ঝগড়াটা ছিল মধুমালার চরিত্র নিয়ে। সুমন্ত্রবাবুর বক্তব্য হ'ল—মধুমালার সাথে তারই এক কলেজ বন্ধু সুজিতের অবৈধ সম্পর্ক আছে। সুজিত নাকি এখনও তার অনুপস্থিতিতে নিয়মিত ওবাড়ীতে আসে। অন্তরা নাকি সুজিতেরই ঔরশজাত সন্তান ইত্যাদি। তবে, সুমন্ত্র চৌধুরীর চরিত্রও যে ধোওয়া তুলসী পাতার মত পবিত্র —একথাই বা কে হলপ করে বলতে পারে? কিন্তু সে বিতর্কে এখন যেতে চাইনা।

মধুমালার বাবা ধূর্জটি দত্ত সুমন্ত্রবাবুর অফিসেরই একজন কর্মী। সুমন্ত্রবাবুর স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় হাসপাতালে দুর্ভাগ্যবশতঃ মারা যান। সুমন্ত্রবাবু স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে কিছুটা মনমরা হয়ে পড়েন। এই সুযোগে মধুমালার বাবা নিজের পদোন্নতি ও মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে একদিন সুমন্ত্রবাবুকে সান্ত্বনার বাণী শুনাতে গিয়ে নিজের মেয়ের গুণ কীর্তন শুরু করেন এবং সুমন্ত্রবাবুকে তার মেয়েকে বিয়ে

করতেও অনুরোধ করেন। সুমন্ত্রবাবু মধুমালাকে দেখে বিয়েতে সম্মতি দেন। ধূর্জটিবাবু স্কুল শিক্ষক সুজিতকে কথা দিয়েও স্বার্থ-পরের মত শেষ পর্যন্ত মধুমালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে সুমন্ত্রবাবুর হাতে তুলে দেন একপ্রকার জোর করেই।

মধুমালা-সুজিতের মধ্যে একদিন ভালবাসা ছিল ঠিকই—কিন্তু সে ভালবাসায় কলঙ্ক ছিল না। এমন কি, বিয়ের পর মধুমালা সুজিতকে ভুলতে না পারলেও এক মুহূর্তের জন্যও তার সাহচার্য কামনা করেনি। আর সুজিতও ভাগ্য-বিড়ম্বনাকে মেনে নিয়ে, মধুমালার সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করেই কোনদিন মনের ভুলেও সুমন্ত্র চৌধুরীর বাড়ীর ধুলো মাড়ায়নি। চরিত্রের চরম অবমাননা সহ্য করতে না পেরে মধুমালা ঐ রাতেই ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

বিপত্নীক সুমন্ত্রবাবু এঘটনার কিছুদিন পরেই 'নাইটক্লাবে' পরিচিত সুন্দরী এক ক্যাবারে ড্যান্সারকে বিয়ে করে ঘরে আনেন। একবার তিনি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কয়েকদিনের জন্য মাদ্রাজ যান। আর তার অনুপস্থিতির সেই সুযোগে এই নবপরিণীতা স্ত্রী একরাতে তার আসল প্রেমিকের নির্দেশে প্রায় লাখ দুয়েক টাকার অলংকার ও নগদ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। পরে অবশ্য পুলিশ একে বোম্বের এক বিলাসবহুল হোটেলের বার থেকে গ্রেফতার করে। লজ্জিত-অপমানিত সুমন্ত্রবাবু এর পর আর ছাতনা তলায় যায়নি।

এদিকে ঝি-চাকরদের সেবা-যত্নে অন্তরা বড় হয়ে উঠতে থাকে আস্তে আস্তে। মা-হারা অন্তরার প্রতি সুমন্ত্রবাবুর স্নেহ-মমতার মাত্রা ইতিমধ্যে আগের থেকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। নামী দামী ইংরেজী-স্কুলে পড়িয়ে কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে মেয়েকে তিনি খাঁটি ইংরেজ করে তোলেন। অন্তরারও আবদারের আর শেষ নেই। সুমন্ত্রবাবুও ওর কোন চাহিদা অপূর্ণ রাখেন না।

ব্যারিষ্টার অঞ্জন মল্লিক সুমন্ত্র চৌধুরীর বাল্য বন্ধু। তারই ব্যারিষ্টার পুত্র উন্মীলনের সাথে একদিন অন্তরার বিয়ে হয়ে গেল বেশ জাক্‌জমকের সাথে। বিয়ের পর 'হানিমুন' করতে ওরা চলে যায় ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে। এই কাশ্মীরেই এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় উন্মীলন মারা যায়—কিন্তু অন্তরা বেঁচে যায় ভাগ্যক্রমে। অন্তরার এই অকাল বৈধব্যের কথা সুমন্ত্রবাবু পুরোপুরি গোপন করে যান। অন্তরাও এই ঘটনায় ভীষণভাবে ভেঙে পড়ে। উন্মীলনের স্মৃতি ওর মন থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য সুমন্ত্রবাবু যার পর নাই চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। সর্বদা খুশী রাখতে—মেয়েকে তিনি নিজের সাথে নিয়ে যান সিনেমা, থিয়েটার, বার প্রভৃতি আনন্দদায়ক জায়াগাগুলোতে। অন্তরাও ক্রমে ক্রমে অতীতের বিষণ্ণ স্মৃতিকে ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবনকে উপভোগ করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আজকাল মনেপ্রাণে সে যেন চিরকুমারী। সুমন্ত্রবাবুও মেয়ের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। কারণ, তিনি সব সময়ই চান অন্তরা যেন সুখী হয়। আর অন্তরাকে সুখী করার একমাত্র উপায়—ওকে আবার বিয়ে দেওয়া। তাই একাজটিকে তিনি সহজে সেরে না ফেলে অন্য পথ অবলম্বন পুর্বক মেয়েকে দিয়ে তার পছন্দমত পাত্র নির্বাচনের এক সুচতুর কৌশল আবিষ্কার করেন।

[৩]

বি. এ. পাশ করে সুকান্ত যখন হন্নে হয়ে চাকরী খুঁজছে তখন হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের প্রতি ওর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনটি আর পাঁচটি বিজ্ঞাপনের মত নয়—একটু স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনটিতে লেখাছিল—

"Chowdhuri Tea Company wants an Executive Officer for its Calcutta Head Office. The candidate

must be unmarried, beautiful to look at, fair, tall, smart, graduate and strong in English".

সাক্ষাতের দিন বেলা দশটায় চৌরঙ্গীর সাতাশ নম্বর বাড়ীটার সামনে আসতেই সুকান্ত দেখতে পেল বাড়ীর সামনে, রাস্তার উপরে অগণিত প্রার্থীর ভীড়। যেন একটা ছোটখাট মেলা বসেছে। সবাই নিজ নিজ বিদ্যা জাহির করতে সদাব্যস্ত। প্রায় সকলেই সাহেবী পোষাকে সুসজ্জিত। কারো কারো মুখে আবার অনর্গল ভুল ইংরেজীর বোমা ফুটছে। যেহেতু আচার-আচরণ, মৌখিক পরীক্ষাই প্রার্থী বাছাইয়ের একমাত্র মানদণ্ড, সেহেতু অনেকেইকথা-বার্তায়, হাঁটা-চলায় একটা কৃত্রিম smartness আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। লম্বা হবার জন্য অনেকে আবার হাই হিলের জুতোও পরেছে! আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মেকআপেরতো কথাই নেই। দামী সেন্টের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। সুকান্ত ঐসব কৃত্রিমতার আশ্রয় না নিয়ে এক প্রকার এক ঘরে হওয়া মানুষের মত একটু দূরে একটা কৃষ্ণচূড়াগাছের তলায় গিয়ে বসে পড়ল। ও যখন বুঝতে পারল, এতগুলো কেতাদুরস্ত ছেলের মধ্যে ওর ভাগ্যে সিঁকে ছেঁড়ার সম্ভাবনা শতকরা একভাগও নেই তখন মিথ্যে ভাঁড়ামীর প্রয়োজনটাই বা কী। তবে সাধারণ পোষাকেও ও যে অসাধারণ সুন্দর তা' বোধহয় অনেকেই মনে মনে স্বীকার না করে পারেনি।

বেলা ঠিক এগারটার সময় গাঢ় নীল রঙের একটা ambassador গাড়ী এসে গেটের সমনে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নেমে এলেন জনতিনেক ভদ্রলোক ও আনুমানিক উনিশ-কুড়ি বছরের প্যান্ট-সার্ট পরা অতি আধুনিকা একটি সুন্দরী তরুণী। চারজনেই লিফটে চারতলায় উঠে গেলেন। এর প্রায় মিনিট কুড়ি পরে শুরু হ'ল ঐতিহাসিক অগ্নিপরীক্ষা। দারোয়ান এক এক জন করে প্রার্থী ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আর এক এক

মিনিট পরেই আবার তারা ফিরে আসছে। সুকান্তর পালা এলো একেবারে শেষের দিকে। ইনটারভিউ রুমে ঢুকতেই সুকান্তর দৃষ্টি পড়ল সেই তরুণী মেয়েটির দিকে। মেয়েটির গায়ের রঙ পাকা আপেলের মত টকটকে লাল, ববছাট চুল। প্লাক্ করা ভ্রূ। কাজল কালো দুটি আয়ত চোখ। হঠাৎ দেখলে পশ্চিমী কোন বিদেশিনী ব'লেই মনে হবে। মেয়েটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ইংরেজীতে কতগুলো প্রশ্ন ওর দিকে ছুড়ে দিল। সুকান্তও একের পর এক প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ভুলভাবে দিয়ে গেল। অন্য তিনজন ভদ্রলোক সারাক্ষণ প্রায় নিশ্চুপই ছিলেন। একজন ওর সার্টিফিকেটগুলো বেশ যত্নসহকারে দেখলেন। অন্যান্যদের তুলনায় ওকে সম্ভবতঃ একটু বেশীই প্রশ্ন করা হয়েছিল। ওর প্রশ্নোত্তর গুলোতে সকলেই যে খুশী তা' সুকান্ত সহজেই বুঝতে পারছিল।

গতকাল যা' ছিল কল্পনা আজ তা' বাস্তবসত্য। আর ভাগ্যলক্ষ্মী যার গলে অগ্নিপরীক্ষার বিজয়মালা পরিয়ে দিলেন সে আর কেউই নয় —শ্রীমান সুকান্ত নাথ, বি. এ. (অনার্স)।

সুকান্তর চাকরীর খবরে বাড়ীর সকলেই খুব আনন্দিত। কিন্তু, এত আনন্দের মাঝেও যার মনের গহনে বিষাদের করুণ ছায়া তিনি সুকান্তর বাবা—অপরেশ বাবু। অপরেশ বাবুর আশংকা, সুকান্তও পাছে সুশান্তর মত তাদের ভুলে যায়।

সুকান্ত দু'দিন পরেই তার শুভকাজে যোগ দিল। প্রথমদিন অফিসেই টি কোম্পানীর মালিক সুমন্ত্র চৌধুরী ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন প্রাণপ্রিয় তনয়া অন্তরার। এর পর প্রায় প্রতিদিনই অন্তরা অফিসে আসে এবং সুকান্তর সাথে আলাপ জমাতে থাকে। যেদিন আসতে পারেনা সেদিন টেলিফোনে কথা হয়।

একদিন কথা প্রসঙ্গে সুকান্ত যখন জানতে পারে মিস্ অন্তরা চৌধুরীই তার নিয়োগকর্ত্রী তখন ও অন্তরার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ না করে পারে না। অন্তরার ইচ্ছায় কিছুদিনের মধ্যেই ওর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয় অন্তরাদের বাড়ীতেই। ক্রমে ক্রমে ওর সাথে অন্তরার মেলামেশা গভীর হতে গভীরে যেতে থাকে। শুরু হয় দু'জনার নিয়মিত 'নাইট ক্লাবে' যাতায়াত; গভীর রাতে নেশা করে বাড়ীতে ফেরার পালা। এমন কি, দুজনে প্রায় মাসখানেক দার্জিলিং ও মুসৌরীতে বেড়িয়েও আসে। অন্তরার জীবনাকাশে সুকান্ত যেন এক শাশ্বত ধূমকেতু।

অন্তরার অনুগ্রহেই সুকান্ত আজ এক্সিকিউটিভ অফিসার থেকে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটর। সুকান্ত আজ সেদিনের বিজ্ঞাপনটিতে 'unmarried' কথাটি লেখা কেন ছিল তা' মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে। আরো উপলব্ধি করতে পারছে—সেদিনের দেওয়া বিজ্ঞাপনটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

অন্তরার ইচ্ছানুসারে একদিন হঠাৎ বিলেতী কায়দায় ওর সাথে সুকান্তর বিয়ে হয়ে যায় ব্যালে ড্যান্স আর হুইস্কি ড্রিঙ্কিংয়ের মধ্য দিয়ে। বিয়ের পর সুকান্ত ওকে নিয়ে নিজ বাড়ীতে যেতে চাইলে ও বেঁকে বসে। সুমন্ত্রবাবু ও সুকান্তর অনেক অনুরোধে শেষপর্যন্ত 'রা' মেলে। শাড়ী পড়তে অনভ্যস্ত অন্যা কোন প্রকারে একটা শাড়ী সোনার অঙ্গে জড়িয়ে সুকান্তর সাথে শ্বশুর বাড়ী যায়। ঘরে ঢুকে সকলের সামনেই ও বলে ফেলে, "This is a nest of pegions". সুকান্ত অনুনয়ের সুরে বলে, "Please stop darling!" অন্তরার দম্ভভরা উক্তিটির মানে অবশ্য আর চাপা থাকে না। উপস্থিত সকলেই নববধূর আচরণে দুঃখ পেয়ে চলে যান। অপরেশ বাবুকে প্রণাম না করে 'হ্যাণ্ড সেক্' করার জন্য যেই অন্তরা হাত বাড়িয়ে দেয়, অমনি তিনি চোখবুজে চিৎকার করে বলে ওঠেন, "সুকান্ত, তোর বউকে আমার সামনে থেকে নিয়ে যা।" সুকান্ত

বাবাকে প্রণাম করে বউকে নিয়ে সেই যে চলে গেল তারপর আর কোনদিন এবাড়ী মুখো হয়নি।

[৪]

অনুরূপার আশা ছিল, ছোটদা বড়দার মত হবে না। কিন্তু, বাস্তবে ও যখন দেখল—কেউ কারও চেয়ে কম যায়না, তখন দাদাদের সাহায্যের আশা ত্যাগ করে জীবন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। স্কুল জীবনেই অনুরূপার টুইশানির অভ্যাস ছিল। এবার তার সংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়ে দিল। সকাল-সন্ধ্যায় ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে যা' পায় তা' দিয়েই অতিকষ্টে নিজের ও বোনের পড়াশুনার খরচ সহ সংসারের সমস্ত খরচই চালায়। সত্যিকথা বলতে কী, তিনটি প্রাণীর জীবন যাত্রা নির্বাহের সকল ব্যয়ভার আজ অনুরূপার কাঁধে।

এম. এস-সি-তে ভর্তি হবার কিছু দিনের মধ্যেই অনুরূপার সাথে পরিচয় ঘটে ওরই এক সহপাঠি অতনু মিত্রর। অতনু পিতৃ-মাতৃহীন; মামার কাছে মানুষ; পদার্থবিদ্যা অনার্সের ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট। ওর সাথে অনুরূপার প্রায় প্রতিদিনই পড়াশুনার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই অনুরূপার সাথে অতনুর একটা নিবিড় প্রণয় গড়ে ওঠে। দুজনেই দুজনকে মনে মনে ভালোবাসে কিন্তু কেউই ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করতে পারে না। অতনু মাঝে মাঝে অনুরূপাদের বাড়ীতে বেড়াতেও আসে। অপরেশ বাবুর সাথে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার নিয়ে আলোচনাও হয়। মিষ্টভাষী, সুপুরুষ এই ছেলেটিকে অপরেশবাবুর বেশ ভাল লাগে। তিনি মাঝে মাঝে ভাবেন, অতনুর মত একটি ছেলের হাতে যদি অনুরূপাকে তুলে দিতে পারতেন তাহলে তিনি সকল দুঃখ ভুলে গিয়ে হয়ত চিরশান্তি লাভ করতেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে অপরেশ বাবু অনুরূপাকে বললেন, "অতনুকে তোর কেমন লাগে মা রূপা?" অনুরূপার চট্‌পট্‌ প্রশ্ন, "কেন বাবা?" অপরেশ বাবু একটু কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "না—মানে, অতনু সম্বন্ধে তোর মনোভাবটা কী?" অনুরূপার উত্তর, "চমৎকার।" কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর অপরেশবাবু আবার বললেন, "তোর যদি একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারতাম তা'হলে……………।" কথা শেষ না হতেই অনুরূপা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, "তুমি কী আমাকে বিদায় করলে বাঁচ বাবা? সারাটা জীবন তোমার কাছে কী থাকতে পারি না? আমাদের দেশের কত মেয়েরই তো বিয়ে হয়না, তাই বলে কী তারা অক্ষম, অসহায়? একদিন যে মেয়েরা ছিল ঘরের কোণে, ছিল অবলা—আজ তারাই আবার হয়ে উঠছে সবলা, স্বনির্ভর। তারা যদি পারে আমিই বা কেন পারব না? তোমার দুটি পায় পড়ি, আমাকে তাড়িয়ে দিওনা। তোমাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাবেনা বাবা।" "তা কি হয় হয় মা? মেয়ে হয়ে যখন্ জন্মেছিস তখন স্বামীর ঘরে তো একদিন তোকে যেতেই হবে। মেয়ের প্রতি পিতার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হ'ল—মেয়েকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে পরিণত বয়সে তাকে উপযুক্ত পাত্রে পাত্রস্থ করা। আমি আমার সেই কর্তব্য পালন করতে পারছি কই? আমি অক্ষম, দায়িত্বহীন, অভাগা; আমার অনেক থাকতেও আজ আমি নিঃস্ব, রিক্ত। তা' না হলে দু'দুটো উপার্জনক্ষম ছেলে থাকতে আজ তোকে এত অমানবিক দুঃখ-কষ্ট সয়ে দুটো পয়সা রোজগার করে সংসার চালাতে হয়। তুই কোথায় থাকবি রাজরাণী হয়ে তা না, তুই আজ ভিখারিণী। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভুলে, ভোগবিলাস ত্যাগ করে, নিজেকে তিলেতিলে ক্ষয় করে তুই চলেছিস্ তিনটি প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা করতে। এটা আমার কাছে যে কত বড় আঘাত তা'

আমি ছাড়া কেউই জানে না। তুই মেয়ে হয়ে যা' করলি তা কোন ছেলে পারবে কিনা সন্দেহ। তোর মত মেয়ে যদি প্রতি ঘরে ঘরে জন্মাত তাহলে এ দেশ, এ পৃথিবীর রূপটাই যেত পাল্টে।" এই বলে অপরেশ বাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন। অনুরূপা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিজের আঁচলে বৃদ্ধ বাবার দু'চোখ মুছে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "তুমি দাদাদের জন্য মিছেই দুঃখ কর। এটা যুগের হাওয়া। এতে দাদাদের কোন দোষ নেই। এর জন্য যে দায়ী সে হ'ল—পচা-গলা এই বিকৃত সমাজ। সমাজের তথাকথিত বিত্তবানদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন যতদিন না হচ্ছে ততদিন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব; মুক্তি নেই তোমার আমার মত সাধারণ মানুষের। আর আমি যা করছি তাতে আমার কষ্ট হয়না এতটুকু। কষ্ট বলতে আমি কিছু জানিনা। এটা তোমাদের প্রতি সন্তান হয়ে আমার নিছক মানবিক কর্তব্য। জীবনে কোন প্রতিকূলতার কাছেই পরাজয় স্বীকার করিনি আর করবোও না। এজীবনে আমি একটা কথাই জেনেছি,—Life is nothing but struggle. জীবন সংগ্রামে আমিও একজন সংগ্রামী। আর জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার মোক্ষম হাতিয়ার হ'ল—ত্যাগ, সাধনা, দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করার ক্ষমতা, নির্ভীকতা ইত্যাদি। কারণ, সোনা পুড়ে পুড়েইতো খাঁটি হয়।"

এরপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে অপরেশবাবু আবার অতনুর কথায় ফিরে আসেন। তিনি বলেন, "জানিস্ মা, অতনু অনেক কথার মাঝে ও কী যেন একটা কথা বলতে চেয়েও বলতে পারে না।" একথা শুনে অনুরূপা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "আমি কিন্তু জানি বাবা ও কী বলতে চায়।" "কী কথা মা?" অনুরূপা শান্ত গলায় বলে, "তোমার কাছে কোন কথা কোনদিন লুকোইনি বাবা, আজও লুকোবোনা। অতনুর কাছে আমি পড়াশুনার ব্যাপারে ভীষণ ঋণী।

ও আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। ওর ইচ্ছে আমি ওর জীবনে আসি। কিন্তু সমস্যা হ'ল, আমি ব্রাহ্মণ কন্যা আর ও.........। এই অসম বর্ণের জন্যই ও ওর মনের কথা তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারেনা। পাছে তুমি দুঃখ পাও, মনে কিছু কর।" "না না, এতে মনে করার কী আছে? তা' ছাড়া আমিতো অতনুকে নিজের সন্তানের মতই স্নেহ করি, ভালোবাসি। আমিতো চিরদিনই মানুষকে মানুষ বলেই জানি। কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র এই ভেদাভেদতো আমার মধ্যে কোনদিনই ছিলনা, আর এখনও নেই। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেই ব্রাহ্মণ হয় না; আবার শূদ্রের ঘরে জন্ম হলেই শূদ্র হয়ে যায় না। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পরিচয় জন্মে নয়, কর্মে। কর্মের জন্যই ব্রাহ্মণ হয় শূদ্র, শূদ্র হয় ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রেও তো এর ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। তথাকথিত বর্ণবিদ্বেষ হিন্দুজাতির অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত বর্ণভেদভুলে সর্বতোভাবে হিন্দুজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। আর একাজে তোর মত নারীরাই পারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে। আমার দিক থেকে কোন বাধা নেই। তুই অতনুকে কথা দে; তার ইচ্ছা পূর্ণ কর।" "তা হয় না বাবা।" "কেন হয় না? তাহলে তুই কী ওকে ভালোবাসিস্ না? তাহলে তুইও কী ঘৃণ্য বর্ণ বৈষম্যে বিশ্বাসী?" "না বাবা, আমিও তোমার মত বর্ণভেদে বিশ্বাসী নই। আমিও তোমার মত মানুষকে মানুষ বলেই জানি। কে কোন বর্ণের তা' খুঁজতে যাই না। তা' ছাড়া অতনুকে আমি ভালওবাসি। তবুও আমি ওর জীবনের সাথে আমার জীবনকে মিলিয়ে দিতে পারছি না। কারণ, বিয়েটা আমার কাছে নিছক ভোগ-বিলাসের বস্তু ছাড়া কিছু নয়। বিয়ে হলেই মনে আসে যেন বিরাট পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন মানুষকে করে তোলে স্বার্থপর; ভুলিয়ে দেয় আপনজনকে। অতনুকে আমি একথা বুঝিয়েও বলেছি।

তবে, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, জীবনে কোনদিন যদি স্বামীরূপে কাউকে বরণ করতেই হয় তাহলে অতনুকেই করব। কিন্তু আজ নয় বাবা।" অপরেশবাবু অনুরূপার কথার প্রতিবাদ না করে শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

[৫]

ছোটবোন অনুরাধা এখন বি. এ. ক্লাশের ছাত্রী। একদিন ঘটনাচক্রে কলেজ ষ্ট্রীটের একটি বইয়ের দোকানে ওর সাথে পরিচয় হয়—রাকেশ তলোয়ার নামে একটি অবাঙালী যুবকের। এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই ওদের মধ্যে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে ভালোবাসা। অনুরূপা এসব কিছুই জানত না। অনুরাধা প্রতিদিনের মত আজও কলেজে গিয়েছে, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। অনুরূপা মনে করল ও হয়ত কোন বান্ধবীর বাড়ীতে গিয়ে থাকবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে পড়ল, ও তো কোনদিন কোথাও না বলে যায় না বা থাকেনা। ব্যাপারটা ওর কাছে কেমন গোলমেলে মনে হ'ল। পরদিন কলেজে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে, অনুরাধা গতকাল কলেজেই আসেনি। অনুরূপার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠল। আর কাল বিলম্ব না করে ও থানায় গিয়ে ডায়রী করল। শুরু হ'ল পুলিশী অনুসন্ধান। চারিদিকে যখন এইভাবে খোঁজাখুঁজি চলল তখন একদিন পিওন অনুরূপার নামে একটা খামের চিঠি দিয়ে গেল। কম্পিত হস্তে অনুরূপা চিঠিটা খুলেই পড়তে শুরু করল—

দিদি,

এ অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়ে জানি তুই অবাক হবি। এভাবে আমার আকস্মিক গৃহত্যাগ নিশ্চয়ই তুই ক্ষমার চোখে দেখবি না। কিন্তু, এছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, নিজের সুখ-স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আমার জন্য

তুই যা' করেছিস্ সেজন্য আমি তোর কাছে কৃতজ্ঞ, চিরঋণী। তবে, আমি তোর মত আদর্শবাদী নই বা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, হতাশাগ্রস্থও নই। তোর ঐ টানাটানির সংসারে থেকে আমি আমার জীবনকে মূল্যহীন করে দিতে পারি না। জীবন আমার কাছে মহামূল্যবান। জানি তুই বিয়েতে মত দিবিনা। তাই আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি। আমি চাই জীবনকে উপভোগ করতে। চাই ঘর, চাই সংসার, চাই সন্তান, সুখ-শান্তি। আর তাইতো রাকেশের লোভনীয় হাতছানিকে আমি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারিনি। রাকেশের জীবনে আসা যে কোন মেয়ের কাছে স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। ওর বাবা কোটিপতি। কলকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর, আহমেদাবাদ, বম্বে প্রভৃতি স্থানে ওদের মিল-কারখানা আছে; আছে ব্যবসাও। কলকাতার বালীগঞ্জে আছে ওদের পাঁচতলা নিজস্ব বাড়ী। সে বাড়ীতে আমি রাকেশের সাথে অনেকবার গেছিও। এখন ওদের বোম্বের বাড়ীতেই আছি। শীঘ্রই আমাদের আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হবে। আজ বারবার বাবাকে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে তোকেও। আশীর্বাদ করিস—জীবনে যেন সুখী হতে পারি। ইতি—

তোর স্নেহের রাধা

চিঠি পড়ে অনুরূপা রাগে-দুঃখে থর থর করে কাঁপতে লাগল। সর্বাঙ্গ যেন ওর অবশ হয়ে আসছে; মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন ওর মাথার উপর ভেঙে পড়তে চাইছে; চারিদিক থেকে দৈত্যের মত অন্ধকার যেন ওর দিকে ছুটে আসছে; যেন মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। অনুরূপা কী যে করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। যা' স্বপ্নেও কোন দিন ভাবেনি, তাই হ'ল আজ বাস্তব। নীরব নিস্তব্ধ মূর্তির মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবার কাছে ছুটে

গিয়ে ছেলেমানুষের মত হাউ-হাউ করে ও কেঁদে ফেলল। অপরেশ বাবু সবশুনে শুধু মাত্র একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

অনুরূপা এখন কলকাতার এক নামকরা মহিলা কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। অতনুও কলেজ অধ্যাপক। আজ তিন-চারদিন যাবৎ অপরেশবাবুর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ডাক্তার অপরেশবাবুকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে বললেন। ডাক্তারের নির্দেশে হাঁটা চলা, জোরে কথা বলা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হ'ল।

একদিন রাত আনুমানিক দুটোর সময় হঠাৎ অপরেশবাবু 'মলিনা আমি আসছি'—বলে বিকট চিৎকার করে ওঠেন। চিৎকারে অনুরূপার ঘুম ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ও দেখতে পায়, বাবা মুখ থুবড়ে বিছানায় পড়ে আছে। বাবাকে তুলে বিছনায় শুইয়ে দিয়ে 'বাবা' বলে ডাকে—কিন্তু কোন সাড়া নেই। হার্ট বিট্ পরীক্ষা করতে গিয়েই অনুরূপা কান্নায় ভেঙে পড়ে। চির দুঃখী অপরেশবাবু ইহধামের সকল মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসার বাঁধন ছিন্ন করে, সকল ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্তি পেয়ে, মহাপ্রস্থানের পথে পরমশান্তিধামে চলে গেলেন। প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই এলো। চোখের জল ফেলল। অনুরূপাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাল। কিন্তু অনুরূপার চোখের জল থামল না।

পরদিন অতনু খবর পেয়ে ছুটে এলো। ওকে দেখে অনুরূপার অশ্রুজলের বাঁধ যেন ভেঙে পড়ল। অতনুকে জড়িয়ে ধরে ও বিস্তর কাঁদল। দীর্ঘদিন পরে আজই প্রথম ও অতনু-র শরীর স্পর্শ করল। অতনু অনুরূপার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "কেঁদোনা লক্ষ্মীটি। বাবা-মা কী চিরদিন কারো বেঁচে থাকে? মনকে বাঁধতে চেষ্টা কর।" "কী করে মনকে বাঁধব অতনু! মন যে আর বাঁধ মানতে চায় না। সবাই আমাকে একা ফেলে চলে গেল।" অনুরূপার মুখে কান্নাভেজা প্রলাপ।

[৬]

অতনুর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার জন্য আমেরিকার নিউইয়র্ক ষ্টেট ইউনিভার্সিটি ইতিমধ্যে অতনুকে ডেকে পাঠাল। ফ্লাইটের দিন ১২ই এপ্রিল দমদম বিমান বন্দরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিল অনুরূপাও। ওয়েটিংরুমে অতনুর সাথে ওর অনেক কথা হ'ল। এদিকে বিমান ছাড়ার সময় প্রায় হয়ে এলো। অতনু অনুরূপার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে শুধু বলল, "জীবনে তোমাকে—শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি রূপা। তুমি ছাড়া আর কোন নারীর স্থান নেই এজীবনে। যদি কোনদিন আমাকে তোমার প্রয়োজন হয় তাহলে একটিবার জানিও। আমি সকল কাজের মাঝেও তোমার কাছে ছুটে আসব।"

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দৈত্যাকার বিমানটি বিকট শব্দ করে অতনুকে নিয়ে মাটি ছেড়ে শূন্যে উড়ল। অনুরূপা অপলক নেত্রে শুধু উড়ন্ত বিমানটির দিকে চেয়ে রইল। ক্রমে ক্রমে বিমানটি চলে গেল ওর দৃষ্টির আড়ালে। ওর দুই কপোলে নীরবে বইতে লাগল বিরহবেদনার বিগলিত অশ্রুর ফল্গুধারা।

অনুরূপা আজ নিঃসঙ্গ—একাকিনী। প্রতিকূলতার সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে করে ও আজ বড় ক্লান্ত; আঘাতের পর আঘাত সয়ে সয়ে ও আজ আহত। আপনজনেরা সবাই চলে গেছে একে একে। কিন্তু, যে মানুষটি আপন না হয়েও সদা সর্বদা ছায়ারমত কাছে কাছে থেকে আপন হতে চেয়েছে, বিপদে আপদে বন্ধুর মত দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে, দুঃখের দিনে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছে, সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোওবেসেছে, সে মানুষটিও আজ চলে গেল দূরে—বহুদূরে।
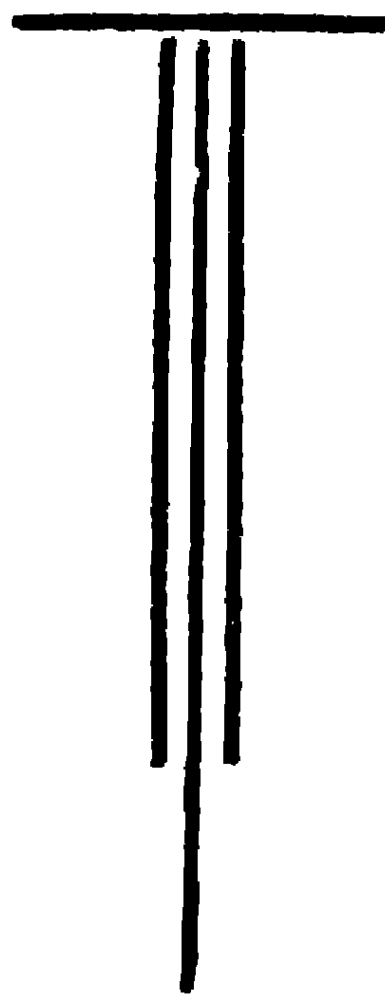
———

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

ডঃ বলরাম দেবনাথ
আই, আই, টি.
কোয়ার্টার নং—সি. ৬০
পোঃ খড়্গপুর
জিঃ মেদিনীপুর

শ্রীউৎপল কুমার নাথ
প্রযত্নে উপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
২৮/১ পণ্ডিত কালিময় ঘটক লেন
পোঃ রাণাঘাট
জিঃ নদীয়া

শ্রীসরোজিৎ দালাল
ভাইস্ চেয়ারম্যান
টাকী মিউনিসিপ্যালিটী
গ্রাঃ রজীপুর
পোঃ হাসনাবাদ
জিঃ ২৪ পরগণা

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ পণ্ডিত
৩/২ রামলোচন সায়র ষ্ট্রীট
পোঃ বেলুড় মঠ
জিঃ হাওড়া

শ্রীঅরুণ দেবনাথ
১৩১/১ চাঁদমারী রোড
পোঃ কাঁচড়াপাড়া
জিঃ ২৪ পরগণা

শ্রীধীরেন দেবনাথ
এ-৮/১৭৫ কল্যাণী
পোঃ কল্যাণী
জিঃ নদীয়া

শ্রীমতী অরুণাপ্রভা দেবনাথ
এ-৮/১৭৫ কল্যাণী
পোঃ কল্যাণী
জিঃ নদীয়া

শারদীয় শৈবভারতী প্রকাশনায় যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই সাদর অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

—শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

পাত্র-পাত্রী

২৩/১এ, ষ্টিয়াস´ লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

পাত্রী—(২৬) (৪'-১১"), বি. এ পাশ নম্র স্বভাব, সুশ্রী, সুস্বাস্থ্য এবং ফর্সা। উপযুক্ত পাত্র চাই। K. C. Nath, Bansdroni Place, P.O.—Bansdroni, Dist—24-Pgs. Pin—743501

পাত্রী—(২৫) বি. এ, (৫') সুশ্রী, শ্যামবর্ণা সর্বপ্রকার গৃহকর্ম নিপুনা, সুচীশিল্প জানে। উপার্জনক্ষম পাত্র চাই। ঘটকও যোগাযোগ করিতে পারেন। শ্রীরবীন্দ্রকুমার নাথ, ২৫ নং পক্কই পাকা রোড, বেহালা, কলিকাতা-৬১।

পাত্রী—(২১) (৫'-১") বি. এ, মধ্যমবর্ণা, উত্তম মুখশ্রীযুক্তা গৃহকর্ম ও সূচী শিল্পে নিপুণা, সঙ্গীতজ্ঞা। উপার্জনশীল পাত্র চাই। শ্রীসন্তোষকুমার নাথ, ৫১৫, ডায়মণ্ড হারবার রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪।

পাত্রীদ্বয়—(৩০ এবং ২২) উচ্চতা যথাক্রমে (৫'-৪" এবং ৫'-১") শিক্ষার মান যথাক্রমে অষ্টম এবং ৭ম শ্রেণী। উভয় ক্ষেত্রেই রং মধ্যম কিন্তু উত্তম মুখশ্রীযুক্তা। বনেদী পরিবার। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, পাগলা গোস্বামী পাড়া, শান্তিপুর, নদীয়া।

পাত্রী—(২৩) বি. এ, প্রকৃত সুন্দরী, (৫'-৪") মাঝারী গড়ন, রং ফর্সা, উপযুক্ত ব্যবসায়ী বা চাকুরে পাত্র চাই। কেশব মজুমদার, ১/৩৪, শহীদ নগর, ঢাকুরিয়া, কলি-৩১।

পাত্র—(৩৮) চাকুরে। সুশ্রী, S.F. পাশ বয়স্কা পাত্রী চাই। ফটোসহ যোগাযোগ করুন। শ্রীরাধেশ্যাম দেবনাথ, ৭২, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট। বড়বাজার কলিকাতা-৭০০০৭০।

পাত্রী—১৮ বৎসর বয়স্কা উচ্চতা ৫', ফর্সা, উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারিণী এবং রবীন্দ্র ও নজরুল গীতে পারদর্শিনী। সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। Pramatharath Majumdar, Dispencery Lane, Ranaghat, Nadia.

পাত্রী—(২০), (৫'-৩"), বি. এ. দ্বিতীয় বর্ষ পাঠরতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, গৃহকর্মে ও সূচীশিল্পে নিপুণা, সঙ্গীতজ্ঞা। বৃশ্চিকরাশি, দেবগণ, শিবগোত্র, অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালী জিলার সেনবাগ থানার অন্তর্গত রাজারামপুর গ্রামের বিশিষ্ট বনেদী বংশের কন্যা। পাত্রীর পিতার বর্তমানে কলিকাতায় যাদবপুরে নিজ বাটী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশিষ্ট পদে কর্মরত। পাত্রীর কাকা ইঞ্জিনিয়ার ও পঃ বঃ সরকারে কলিকাতায় কর্মরত। মাতুলকুলও নোয়াখালীর বিশেষ বনেদী বংশজাত বর্তমানে কালনায় স্থায়ী বসবাসকারী। পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল, সৎ বংশজাত পাত্র চাই। শ্রীমানিক ভৌমিক (পাত্রীর মাতুল), ২৯, ফ্রেণ্ডস্ রো, যাদবপুর, কলিকাতা-৭৫।

পাত্রী—(২১) (৫'-১") স্কুল ফাইন্যাল অনুত্তীর্ণা, গীটারে ২য় বর্ষ। গায়ের রং ফর্সা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। যোগাযোগ করুন—শ্রীমদনমোহন নাথ, ৩৮, বি. এল. লাল রোড, কলিকাতা-৫৭।

পাত্রী—(২১) (৫'-৩") ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাশ, গায়ের রং ফর্সা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শ্রীমন্মথ নাথ নাথ, গ্রাম—নোনাখেরী, পোঃ—ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা।

পাত্রী—(২৫) উচ্চতা ৫'-২" মধ্যমবর্ণা, লাবণ্যময়ী, বি. কম দিয়াছে। গানবাজ জানা, গৃহকর্মে নিপুনা, গৃহশিক্ষিকা। পিতা বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত নাথবংশের। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। কলিকাতায় ত্রিতল বাটি আছে। ভ্রাতারা অবিবাহিত এ্যাকাউন্ট্যান্ট / মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। সুচাকুরে পাত্র চাই। দাবী-দাওয়া যথাসম্ভব মিটানো হবে। লিখুন—নীলপদ নাথ। ২৬পি জুবিলী পার্ক। কলিকাতা-৩৩ ফোন নং ৪২-৩৫৫৫।

পাত্র—(৩৪) (৫'-৫") ডাক্তার, B. Sc, (Dist), M. B. B. S.। রং ফর্সা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। শিক্ষিত সুন্দরী পাত্রী চাই। শ্রীসোমরঞ্জন দেবনাথ, C/o ইউনাইটেড ক্লথ ষ্টোর্স। ৭৬, সেন্ট্রাল রোড (উমেশ ভবন) আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)।

———

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন একশত টাকা দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কার্তিক ১৩৯০

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

শ্রীশ্রীশিবগীতা

দ্বিতীয়োঽধ্যায়

বৈরাগ্যোপদেশঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অগস্ত্য উবাচ

কিং নিষীদসি রাজেন্দ্র কান্তা কস্য বিচার্য্যতাম্।
জড়ঃ কিং নু বিজানাতি দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ॥ ৫

নির্লেপঃ পরিপূর্ণশ্চ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
আত্মা ন জায়তে নৈব ম্রিয়তে ন চ দুঃখভাক্॥ ৬

সূর্য্যোঽসৌ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুষ্ট্বেন ব্যবস্থিতঃ।
তথাপি চাক্ষুষৈর্দোষৈর্ন কদাচিদ্বিলিপ্যতে॥ ৭

সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপি তদ্বদ্দৃশ্যৈর্নলিপ্যতে।
দেহোঽপিমলপিণ্ডোঽয়ং মুক্তজীবো জড়াত্মকঃ॥ ৮

দহ্যতে বহ্নিনা কাষ্ঠৈঃ শিবাদ্যৈর্ভক্ষ্যতেঽপি বা।
তথাপি নৈব জানাতি বিরহে তস্য কা ব্যথা॥ ৯

অনুবাদ ঃ—

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈরাগ্যোপদেশ

অগস্ত্য বললেন—হে রাজেন্দ্র! এমন বিষণ্ণভাবে অবস্থান করেছেন কেন? বিচার করে দেখুন, কে কার প্রিয়তমা? এই দেহ যে পঞ্চভূতময় তা কে না জানে? ৫ ॥ যিনি নির্লিপ্ত, পবিপূর্ণ ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সেই আত্মার জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নেই; তিনি কিছুতেই দুঃখভাগী হন না। ৬ ॥ এই সূর্য্য সর্বলোকের চক্ষুরূপে অবস্থান করছেন, তথাপি তিনি চাক্ষুষদোষে বিলিপ্ত হচ্ছেন না। ৭ ॥ সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মাও দৃশ্যমান-দোষ দ্বারা লিপ্ত হন না। মৃত্যু হলে এই মলপিণ্ডময় জড়দেহ কাষ্ঠাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় অথবা শৃগালাদি কর্তৃক ভক্ষিত হয়; তথাপি সেই দেহ-বিরহেব ব্যথা কেউই জানতে পারেন না। ৮—৯ ॥

অনুবাদক—সু. নাথ

সম্পাদকীয়

শারদীয়া-দুর্গা-পূজাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত বাঙালী-হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব সমাপ্ত। বিজয়া-দশমীতে বিশ্বমাতার মৃণ্ময়ী-মূর্তির বিসর্জনের পর বাঙালী-হিন্দু-সমাজে নেমে এসেছে মাতৃ-বিরহের বিষাদ-ছায়া। বিষাদেব দিনে বিষাদগ্রস্ত সকলে পরস্পব প্রীতির বন্ধনে আবদদ্ধ হবার প্রযোজনীযতা বেশী করে অনুভব করে। সম্ভবত সেই কারণেই, বাঙালী-হিন্দু-সমাজে, বিজয়ার বিসর্জনের পর পরস্পর কোলাকোলিব মাধ্যমে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনেব রীতি প্রচলিত। সেই চিরাচরিত বীতিকে অনুসবণ কবেই, শৈবভারতীব পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, শুভানুধ্যায়ী, কর্মকর্তা সকলের প্রতি জানাই ঈশ্বরী-বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আর একটা কারণে হিন্দু-সমাজে, বিশেষত রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-সমাজে শোকের ছায়া-পাত ঘটেছে। কারণ হাওড়া পণ্ডিত-সমাজের প্রাক্তন সহ-সভাপতি, 'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী'ব প্রতিষ্ঠাতা এবং শৈব ও শাক্ত সাধক পণ্ডিত-প্রবর মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্যেব মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। একনিষ্ঠ এই সাধকের তিরোধানে রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-সমাজ তথা সমগ্র হিন্দু-সমাজ হারিয়েছে একজন আদর্শ পথ-প্রদর্শককে। কাজেই আসুন, আমরা সেই মহাসাধকের সাধনোচিত-নিত্যধাম-নিবাসী বিদেহী-আত্মার প্রতি আমাদেব অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি এবং চলার পথে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

সামনে কালীপূজা ও দেওযালী। সেই কালীপূজা ও দেওয়ালী উপলক্ষে, হিন্দু-সমাজে, আর একবার উৎসব পালিত হবে। উৎসব

বেদনাকে ভুলতে সাহায্য করবে। তাই আসুন, আমরা সকলে আগামী উৎসবে সামিল হয়ে, অমানিশার ঘনান্ধকারে আমাদের গৃহাঙ্গণ-সমূহকে আলোক-মালায় সজ্জিত করে জগজ্জননী মহাকালীর কাছে প্রার্থনা করি—হে জগদম্বা! আমাদের অন্তরে জ্ঞানলোক প্রজ্বলিত কর যাতে আমরা তোমার ভয়ঙ্করী-মূর্তির মধ্যে শুভঙ্করী-মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি; আমাদের শরীরে শুভ-শক্তি সঞ্চারিত কর যাতে আমরা আমাদের বেদনা-মথিত অন্ধকারময় জীবনে আনন্দের আলোক-সজ্জা করতে পারি।

———

কালী কৈবল্যদায়িনী

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন

শিবশক্তিংশিবাভিন্নাং মাতরং প্রণমাম্যহম্।

হিন্দুব উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে দেবী কালিকা এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই কালী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার পূর্বে শক্তি উপাসনা—তথা মাতৃপূজাব উৎস সম্বন্ধে কিছু বলার প্রযোজন বোধে অগ্রে সেই পথই অনুসবণ করিতেছি।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করিবার পূর্বে ঐ অঞ্চলে একটি উন্নত ধরণের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। ঐ সভ্যতার সাধাবণ নাম ছিল সিন্ধু সভ্যতা এবং ধর্মীয় সংস্কৃতিব সাধাবণ নাম ছিল সিন্ধুধর্ম। Sir John Marshall এ সম্পর্কে মন্তবা করিতে গিযা বলিয়াছেন, "Five thousand years ago when the Aryans were even heard of, India was enjoying an advanced and singularly uniform civilization of her own, closely akin, but in some respect even superior to that of contemporary Egypt or Mesopotamia." Dr. J H. Hutton তাঁহাব 'Caste in India' নামক পুস্তকে ঐ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রাক্ ঋগ্বেদীয় হিন্দুধর্ম বলিযা অভিহিত কবাই অধিক সমীচীন বলিয়া মন্তব্য করিযা বলিয়াছেন,—"The culture of the early civilization of Northern India may perhaps be most convenietly described as Pre-Rigvedic Hinduism. Even if this culture disappeared entirely from the Indus Vally, it may well have

survived across the Jamuna with sufficient vigour to react to the Rigvedic Aryans whose religious beliefs ultimately submerged in its own philosophies.

পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলে খনন কার্য্যের ফলে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তৎকালে ঐ অঞ্চলে মাতৃপূজা—তথা শক্তি উপাসনা প্রচলিত থাকার নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রাক্ ঋগ্বেদীয় যুগে সিন্ধু অঞ্চলে দার্শনিক পটভূমিকার উপর যে সকল ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাদের মধ্যে 'ত্রিকারণ তত্ত্ব'ই (Tri-cause Theory) ছিল প্রধান ধর্মমত, যাহা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় অজতত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে ও জনক-জননী তত্ত্বে—তথা উমা-মহেশ্বর তত্ত্বে। অপরাপর মতবাদের মধ্যে 'চক্রংম' (Evolution of a serpent power in a Human Body) যাহার প্রতিফলন আমরা তান্ত্রিক সাধন ধারায় ষটচক্র ভেদ নামক সাধনার মধ্যে পাই। এবং 'অমৃততত্ত্ব' (Theory of Immortality) বা 'চিরজীবত্ব' (Doctrine of Eternal Life) লাভের সাধনতত্ত্ব, যাহা বর্তমানে যোগসাধনা নামে পরিচিত। বর্তমানে শৈবতন্ত্রে উক্ত তিনটি মতবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

ইহারই সমসাময়িক কালে উত্তর পূর্ব ভারতে আর একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, তাহাকে বলা হইত ব্রাত্য সভ্যতা। প্রধান দেবতা ছিলেন একব্রাত্য। উক্ত সভ্যতার মধ্যেও মাতৃপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত দ্রাবিড় সভ্যতার মধ্যেও দেবী পূজা প্রচলিত থাকার নিদর্শন বিরল নয়। দক্ষিণ ভারতের প্রধান দেবদেবী হইলেন গণেশ, লক্ষ্মী ও কুমারী।

বৈদিক সংস্কৃতিতে পুরুষ দেবতার উপাসনা প্রাধান্য লাভ করিলেও বৈদিক সাহিত্যের স্থানে স্থানে স্ত্রীদেবতার উপাসনারও নিদর্শন মিলে অনেকে মনে করেন উহা সিন্ধু সভ্যতার দান। এবং ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত, সামবেদের রাত্রিসূক্ত এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের সর্পরাজ্ঞী-সূক্ত দেবীপূজা—তথা শক্তি উপাসনার ইঙ্গিতবহ। ইহা ব্যতীত ঋগ্বেদে ভুবনেশ্বরী, বিশ্বদুর্গা, অগ্নিদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা আরও কয়েকটি দেবীর উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের সিন্ধুদুর্গা নামটি সিন্ধু অঞ্চলের দুর্গা, ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভিন্ন, কেন—উপনিষদের এই দার্শনিক সিদ্ধান্তটির সন্ধান প্রাগবৈদিক সিন্ধু সভ্যতার যুগের কয়েকটি মূর্ত্তির তত্ত্ব বিচারেও পাওয়া গিয়াছে। বাজসনেয়ী সংহিতার অম্বিকা এবং অদিতিদেবী কোথায়ও রুদ্রদেবের ভগ্নী এবং কোথায়ও বা রুদ্রদেবের স্ত্রীরূপে কথিতা সাংখ্যায়ণ গৃহ্যসূত্রে ভদ্রকালী দেবীর নাম পাওয়া যায়।

তন্ত্রে দেবী পূজারই প্রচলন অধিক। একটি বাক্যে পাই "গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা" অর্থাৎ বঙ্গদেশই তন্ত্র সাধনার—তথা দেবী উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু বা উৎপত্তিস্থান। শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্য শক্তিবাদের একখানি সর্বজনমান্য প্রামাণিক গ্রন্থ। এই চণ্ডী মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের অংশ বিশেষ। উক্তগ্রন্থে মেধস্ বা মেধা নামক ঋষি-রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির নিকট দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। বঙ্গদেশের চট্টল শহর হইতে কিছু দূরে করালডাঙ্গা পাহাড়ে মেধস্ ঋষির আশ্রম বর্তমান। মার্কণ্ডেয় ছিলেন একাধারে ঋষি, মুনি ও মহাযোগী। প্রাচীনকালে চট্টগ্রামের ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলে যোগ সাধনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে মেধস্ ঋষি ও মার্কণ্ডেয় মহামুনিকে বাঙ্গালী বলিয়া দাবী করিবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান। কালিকা দেবী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আমি আর এক জন

ঋষির নাম করিব, যাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শন মতবাদের সহিত কালী মাতার সম্বন্ধ বিদ্যমান। এই ঋষি হইতেছেন সাঙ্খ্য দর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি কপিল। বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সাগর দ্বীপে মহর্ষি কপিলের আশ্রম বর্ত্তমান। অনেক ঐতিহাসিকের মতে কপিলও ছিলেন বাঙ্গালী। ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশেই সাঙ্খ্যদর্শনের প্রভাব অধিক।

এবার কালীর কথায় আসি। পৌরাণিক কাহিনীমতে প্রজাপতি দক্ষকন্যা সতীর দশমহাবিদ্যার প্রথম বিদ্যা 'কালী'। যথা,—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সর্ব ধর্ম সমন্বয় মানসে প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞে বিশ্বের সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল, নিমন্ত্রণ জানান হয় নাই কেবল নিজ কন্যা সতী ও জামাতা শিবকে। 'বিনা নিমন্ত্রণে কন্যার পিতৃগৃহে যাইতে বাধা নাই' নারদের এই উক্তি মত সতী পিতৃগৃহে যাইতে চাহিলে শিব প্রথমে অনুমতি দেন নাই। নিরুপায় হইয়া সতী শিবকে এক একটি করিয়া তাঁহার দশটি যোগ বিভূতিরূপ দেখাইয়া ঐ যজ্ঞে যাইবার অনুমতি আদায় করিয়া লইলেন। উক্ত দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালীই হইলেন প্রথম ও প্রধান দেবী।

এবার শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের কথায় আসি। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাই মহামায়ারূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্তা। কিন্তু পরমাত্মায় যখন গুণ আরোপিত হয়, তখন পরমাত্মা হ'ন সগুণ। পরমাত্মার এই সগুণ অবস্থাই মহামায়া। যুক্তি ও তর্কের বিচারে পরমাত্মা ও মহামায়াকে পৃথক বলিয়া অনুমিত হইলেও যাঁহারা সাধক পুরুষ, যাঁহারা আত্মজ্ঞ, যাঁহারা ব্রহ্মদর্শী তাঁহাদের নিকট পরমাত্মা ও মহামায়া অভিন্ন।

বেদান্তমতে মায়ার পৃথক সত্ত্বা নাই, মায়া ব্রহ্মেই কল্পিত। এই মায়াকে নাশ করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি। সাঙ্খ্যদর্শন মতে প্রকৃতিকে পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই অর্থাৎ কর্ম হইতে জ্ঞানকে পৃথক করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি হয়। বস্তুতঃ পক্ষে যতক্ষণ সাধনা আছে, যতক্ষণ ভোগবিলাস আছে, যতক্ষণ দেহজ্ঞান আছে, যতক্ষণ কামনা-বাসনা আছে, ততক্ষণ সাধ্যও আছে। এই অবস্থায় আত্মা মহামায়া রূপেই অভিব্যক্তা। কিন্তু যখন আত্মার—'আত্-মা'র স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, অর্থাৎ আমিই সেই চৈতন্য স্বরূপ আত্মা এই বোধ জন্মে, তখন পরমাত্মা ও মহামায়ায় আর কোন ভেদ থাকে না। তখন পরমাত্মা হ'ন পরমাত্মীয়।

মহামায়া ত্রিগুণা; রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মেধস্ ঋষি মহামায়ার বর্ণনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১।৪৫ মন্ত্রে বলিতেছেন—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥"

মহামায়া নিত্যা, এই জগৎই তাঁহার মূর্তি, তিনি সর্বত্রই পরিব্যাপ্তা, তথাপি মহামায়া বহুরূপে আত্ম প্রকটিতা। তাই মহামায়ার বহুরূপ। এই বহুরূপের মধ্যে কালীরূপে মহামায়ার এক বিশেষ আত্মপ্রকাশ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তরচরিতে দেখা যায় যে শুম্ভ ও নিশুম্ভ কর্তৃক পরাজিত ও স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া দেবগণ হিমালয়ে মহামায়ার স্তব করিতেছিলেন। এমন সময় দেবী পার্বতী গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন?" এমন সময় পার্বতীর দেহকোষ হইতে তাঁহারই মত এক অনিন্দ্যসুন্দরী দেবী আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, "দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন। পার্বতীর দেহকোষ হইতে কৌষিকী বিনির্গত হইয়া আসিলে পার্বতী কালো হইয়া গেলেন

এবং তখন তিনি কালিকা নাম ধারণ করিলেন। "কলিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল-কৃতাশ্রয়া।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মূলদেবী পার্বতীই 'কালী' নাম ধারণ করিলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তর চরিতের অন্যত্র দেখা যায় যে তমোগুণান্বিত চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ কবিবার নিমিত্ত দেবী কৌষিকীর ললাট দেশ হইতে তমোগুণ সম্পন্না করাল বদনা, ভয়ঙ্করা, অসি, পাশ ও খটাঙ্গহস্তা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃতা, রক্তবর্ণ ও কোটরাগত চক্ষু-বিশিষ্টা, লোলুপরসনা। এক কালীর আত্মপ্রকাশ। কালীপূজা তাই তামসিক পূজা, অর্থাৎ মহামায়ার তামসী মূর্তির আরাধনা। কিন্তু, কেন?

গুণ ত্রিবিধ; সত্ব, রজঃ, ও তমঃ। কিন্তু এই তিনগুণের লয় না হইলে জীব ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। সাধন মার্গে সত্বগুণাধিক্য সাধকই প্রথমে সত্বগুণকে লয় করেন তাঁহার রজোগুণের মধ্যে। পরে সেই সত্বগুণ মিশ্রিত রজোগুণকে লয় লয় করেন তাঁহার তমোগুণের মধ্যে। এখন এহেন তমোগুণকে মহামায়ায় লয় করিতে সমর্থ হইলেই সাধক মহামায়ার বা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন। এই গুণত্রয়ের বিলোপ সাধনই কালী সাধনা।

তমঃ কি? না, অজ্ঞান অন্ধকার। এই অন্ধকারের স্বরূপটুকুর সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। জ্যোতির কেন্দ্রীভূত অবস্থায় যখন চোখ ঝলসাইয়া যায়, তখন আর কিছুই দেখা যায় না, তখন সবই অন্ধকার মনে হয়। এই অবস্থাটাই তমঃ। জ্যোতির আধার স্বরূপা জ্যোতির্ময়ী মায়ের জ্যোতিঃ আমরা দেখিতে সমর্থ হইনা, আমরা মাকে কালো রূপেই দেখি। তাই মা আমাদের কাছে তমোগুণান্বিতা কালী। এই তমের পরেই সেই সৎচিৎ আনন্দঘন জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। 'তমসঃ পরস্তাৎ।'

এবার মূল কালীর কথায় আসি। সাঙ্খ্যদর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি কপিল "ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ" বলিয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলেও প্রকৃতি ও জ্ঞ পুরুষকে স্বীকার করিয়াছেন। সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতিই প্রধান, পুরুষ গৌণ। সাঙ্খ্যদর্শনের মূল তত্ত্বের দেবীরূপই হইল 'কালী'। সাঙ্খ্যের এই প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, কিন্তু অন্ধা; পুরুষ জ্ঞান স্বরূপ, কিন্তু অকর্তা। পুরুষ তাই শবরূপ শিবরূপে শায়িত। প্রকৃতি এককভাবে জাগতিক কার্য সম্পাদন করিতে পারেন না। তাই তিনি জ্ঞানস্বরূপ শবরূপী শিবের বক্ষস্থলাশ্রয়া হইয়া জাগতিক কার্য্যসকল অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

"শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।"

এইবার লোলজিহ্বা, নরশির-খড়্গ-বরাভয় হস্তা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা শবশিবারূঢ়া কালীমূর্তির দিকে একবার তাকাইয়া দেখা যা'ক। দেবী বিশ্বপ্রসবিনী—জগৎ সৃষ্টি কারিনী—জগৎ জননী। স্বীয় সৃষ্টির রসাস্বাদনকারিনী বলিয়া দেবী লোলজিহ্বা। স্থিতিকারিণী ও জগৎ পালয়িত্রী বলিয়া দেবী বর ও অভয় মুদ্রাধারিণী। কর্মফলের বন্ধন ছিন্নকারিণী জ্ঞানদায়িনী, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের লয়কর্ত্রী-মুক্তিদাত্রী বলিয়া দেবী নরশির ও খড়্গ ধারণকারিণী। সাধক ও ভক্তজনের আশ্রয়স্থলা বলিয়া দেবীর বক্ষ নৃমুণ্ডমালায় বিভূষিত। দেবীর রূপদর্শনে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উদয় হয়। দেবীকালী যেমনই ভীমা, তেমনই ক্ষেমা; যেমনই ভয়ঙ্করী, তেমনই স্নেহময়ী; যেমনই সংগ্রামব্যাপিনী, তেমনই শান্তিস্বরূপিনি। অনন্ত রসমণ্ডিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি পরিণাম প্রবাহ কালীমূর্তিতে পরিস্ফুট দেখিয়া মহাকালও আজ দেবীর পদতলে স্তব্ধ-নির্গুণ-নির্বিকার।

তন্ত্রের সপ্ত আচার বা বিভাগ। যথা,—(১) বেদাচার, (২) বৈষ্ণবাচার, (৩) শৈবাচার, (৪) দক্ষিণাচার, (৫) বামাচার,

(৬) সিদ্ধান্তাচার ও (৭) কৌলাচার। দক্ষিণাচার আবার দুই শাখায় বিভক্ত,—বীরাচার ও পশ্বাচার। দেশভেদেও আবার তন্ত্রের সম্প্রদায় বিভাগ আছে। যেমন, গৌড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মিরী ও বিলাসী। গৌড়ীয় শাক্ত সম্প্রদায়ের আবার সাড়ে তিন শাখা।

মূর্তিভেদেও কালীর নাম ও রূপ আছে। যেমন, ভদ্রকালী, দক্ষিণাকালী, সিদ্ধেশ্বরী কালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, গুহ্যকালী, বামাকালী প্রভৃতি। আবার চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা, দ্বাদশভুজা, অষ্টাদশভুজা, সহস্রভুজা প্রভৃতি কালীমূর্তির পূজা প্রচলিত দেখা যায়। মহাকালীর আবার দশটি চরণ।

এইবার কালী উপাসনা—তথা শক্তি উপাসনার কথা বলিয়া এই নিবন্ধ শেষ করিব। সাধকের কাছে শক্তি বহুরূপে উপাসিতা হ'ন। যেমন, মাতৃরূপে, কন্যারূপে, ভগ্নীরূপে পত্নীরূপে ও দাসীরূপে। এইরূপ উপাসনা শ্রুতিবিরুদ্ধ নয়। শ্রুতিতে "স্ত্রীয়মধমুপাসীতঃ" এরূপ বাক্য পাওয়া যায়। অন্যত্র পাই,—বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব বিবিধা কীর্ত্তিতা শ্রুতিঃ। তবে দেবীকে মাতৃরূপে উপাসনা করাই ভারতের সকল দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। দেবীকে কন্যারূপে এবং কুমারীরূপে উপাসনা করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রাতঃসন্ধ্যায় গায়ত্রীদেবী কুমারীর ন্যায় মহাকালী ব্রহ্মরূপা ব্রাহ্মী। যাজ্ঞিয়া উপনিষদে দুর্গা গায়ত্রীমন্ত্রে দেবীকে কুমারী কন্যারূপে বর্ণনা করা হইতেছে,—ওঁ কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। বিন্ধ্যাচলের অংশবাসীগণ কর্তৃক দেবী কুমারী কন্যা-রূপেই পূজিতা হইতেন। পরে তিনি শিবসঙ্গিনী শিবশক্তিরূপে পরিগণিতা হ'ন। শারদীয়া দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবী পূজায় কুমারী পূজা এক বিশেষ অঙ্গ। অর্ধকালীমূর্তিতে দেবী ঢাকা জেলার মিতরা গ্রামবাসী রাঘব ভট্টাচার্য্যের পত্নীরূপে একবার

আত্মপ্রকাশ করিযাছিলেন। ব্রহ্মানন্দগিরির সাধনায় প্রীত হইয়া দেবী বর প্রদান করিতে চাহিলে দেবীকে পত্নীরূপে কামনা করিয়া ব্রহ্মানন্দগিরি বলিযাছিলেন, — "ব্রহ্মানন্দগিরিগিরিবিন্দ্রতনযাবক্ত্রামৃতং ঋচ্ছতি।" দেবী সাধকের এই কামনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া সর্তাধিনে ব্রহ্মানন্দগিরির দাসীত্ব স্বীকার করিয়া লইযাছিলেন। উপনিষদে বলা হইযাছে, "সর্বংখল্বিদং ব্রহ্মতজ্জলান্" ব্রহ্ম জগৎময, জগৎ ব্রহ্মময়, জগৎ ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেই স্থিত এবং প্রলযকালে জগৎ ব্রহ্মেই লয প্রাপ্ত হয। তন্ত্রে কালীই বিশ্ব প্রসবিনী, কালীই জগৎ পালযিত্রী এবং প্রলযকালে এই জগৎ কালীতেই লয প্রাপ্ত হয়। জাগতিক কার্য সম্পাদনে তাত্ত্বিক চিন্তাধারায় উপনিষদের ব্রহ্ম এবং তন্ত্রের কালীর একই ভূমিকা। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাধক রামপ্রসাদ এবং ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কণ্ঠে এই বাণীই নানাভাবে বারবার ধ্বনিত হইযাছে। মহাপুরুষগণের কণ্ঠে সুর মিলাইযা আমিও বলি—ব্রহ্মই কালী, কালীই ব্রহ্ম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিরোম্।

শক্তিবাদ

শ্রীভবতোষ চৌধুরী

বহুকাল হইতে ভারতীয় মুনি-ঋষি কর্তৃক অনুভূত দুইটি আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা, বৈদান্তিক-ধারা ও তান্ত্রিক-ধারা নামে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বৈদান্তিক-ধারার ভিত্তি বেদান্ত বা উপনিষদ-সমূহ এবং তান্ত্রিক-ধারার ভিত্তি তন্ত্র-শাস্ত্র-সমূহ। দুইটিই জ্ঞানভাণ্ডার। বেদান্তের সিদ্ধান্ত ব্রহ্মবাদ আর তন্ত্রের সিদ্ধান্ত শক্তিবাদ।

বেদান্তের অনুভূতি এক অপরিবর্তনীয় অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার। পরিবর্তনশীল জগৎ তাঁহারই মায়িক প্রকাশ। অর্থাৎ জগৎ এক ব্রহ্মেরই বহুল-প্রকাশ। বৈদান্তিক-ধারার উদ্দেশ্য ধ্যান বা যোগ ব্রহ্ম-সত্তাকে অনুভব করিয়া জীবনের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যাওয়া। আবার তন্ত্রের অনুভূতি—পরিবর্তনশীল জগৎ শক্তিময়; জাগতিক শক্তি-সমূহ এক আদ্যাশক্তিরই অঙ্গীভূত। তান্ত্রিক-ধারার উদ্দেশ্য, ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে শক্তি-সত্তাকে অনুভব করিয়া জীবনের তুচ্ছতা বিস্মৃত হওয়া। বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক উভয়-ধারারই ভাবনা ও উদ্দেশ্য মূলতঃ এক।

বেদান্তের ব্রহ্মবাদ বা পুরুষবাদে এবং তন্ত্রের শক্তিবাদ বা প্রকৃতিবাদে কোন বিরোধ নাই; বরং একে অন্যের পরিপূরক। যেমন, অগ্নির দাহিকা-শক্তি। অগ্নি ছাড়া দাহিকা-শক্তির অস্তিত্ব নাই। আবার দাহিকা-শক্তি আছে বলিয়া অগ্নির অগ্নিত্ব। সুতরাং শক্তিমান ও শক্তি অভিন্ন। ব্রহ্ম বা শিব শক্তিমান আর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে কালিকা সেই ব্রহ্ম বা শিবেরই শক্তি।

শুধু শর্করায় মিষ্টতা নাই। একা রসনাতেও মিষ্টতা নাই। রসনার মাধ্যমেই শর্করার মিষ্টতার অনুভূতি। মিষ্টতা আস্বাদনে রসনা ও

শর্করা উভয়ই অপরিহার্য্য। বাহ্যিক অনুষ্ঠান-সমূহ বর্জন করিয়া ধ্যান বা যোগের মাধ্যমে অখণ্ড ব্রহ্ম বা শিবের অনুভূতি এবং আত্মাশক্তিই যে ব্রহ্ম বা শিবকে আশ্রয় করিয়া জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করিয়া চলিয়াছেন তাহার অনুভূতিতে বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবহার —এক মূল-সত্যে উপনীত হইবার জন্য এই দুইটি পদ্ধতি দ্বন্দ্বাতীত, সামঞ্জস্যপূর্ণ, অপরিহার্য্য ও পরস্পর পরিপূরক।

প্রাচীন ভারতীয় তন্ত্র-বিজ্ঞান এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জড-বিজ্ঞান উভয়েই শক্তিকে স্বীকার করিয়াছে। এই শক্তি সম্পর্কে উভয়ের ভাবনায় সাদৃশ্য এবং বৈশাদৃশ্য দুইই আছে। সাদৃশ্যগুলি হইতেছে,—

এক—শক্তি আছে।

দুই—নিখিল বিশ্বে শক্তি ছাডা কিছুই নাই, প্রত্যেক বস্তুই কতকগুলি শক্তির সমবায় (conglomeration of energy)।

তিন—নিখিল বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি একই শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি।

বৈশাদৃশ্যগুলি হইতেছে,—

এক—তন্ত্র-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত শক্তি চৈতন্যময়ী জড-বিজ্ঞান শক্তির চেতনা মানে না। কিন্তু ইলেকট্রনের গতিবেগ, লম্ফন সর্বাধুনিক বিজ্ঞানকে বিস্মিত করিয়াছে। তাই সর্বাধুনিক বিজ্ঞান অনির্দেশ্যবাদ (Law of Inditerminacy) প্রচলন করিয়া ইলেকট্রনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছে। তবে ইহা অনুমান মাত্র, অনুভূতি নহে। যাহা হউক, এই অনুমিতির স্বীকৃতিতেই জড়-বিজ্ঞান তন্ত্র শাস্ত্রের "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে........" বহুপূর্বে ঘোষিত এই মহামন্ত্রের সমর্থনের প্রায় দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছে—ইহাই গৌরবের কথা।

দুই—জড়-বিজ্ঞান শক্তি মানিয়াছে; কিন্তু উহাতে কল্যাণময়ী মাতৃরূপ দেখে নাই। কিন্তু তন্ত্র-বিজ্ঞানীর অনুভূতিতে ধরা পড়িয়াছে,

আদ্যা-শক্তির দ্বারা জগৎ মাতৃস্নেহে পালিত ও 'বিধৃত।' তাই তন্ত্রে শক্তি পূজিতা, মান্যা। পক্ষান্তরে কল্যাণময়ী মাতৃরূপ দেখে নাই বলিয়া জড়-বিজ্ঞানে শক্তি ভোগ্যা। জড়-বিজ্ঞান বলে, দেহের ইন্দ্রিয়ের ভোগে শক্তির বিনিয়োগেই প্রকৃত কল্যাণ। এই অর্থেই সে কল্যাণ বুঝিয়াছে। তাই তাহার নিরলস সাধনা জীবনের সর্বস্তরে ভোগে, মত্ততায়, মারণাস্ত্র-নির্মাণে শক্তিকে যথেচ্ছ ব্যবহারের। ভারতীয় তন্ত্র-ঋষির দৃষ্টিতে দেহের ভোগ নহে, দেহীর ভোগেই প্রকৃত কল্যাণ। 'চণ্ডী'র শুম্ভ-নিশুম্ভ উপাখ্যানে শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবীকে ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার পরিণাম দেবী কর্তৃক শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধন। শক্তির আনুগত্যহীন যথেচ্ছ ব্যবহারের পরিণতি বিনাশ—ইহাই শুম্ভ-নিশুম্ভ আখ্যানের রূপক-ইঙ্গিত। জড়-বিজ্ঞানের দৌলতে দেহের খাদ্য সুলভ হইতেছে, কিন্তু আত্মার খাদ্য বিরল হইতেছে। অতএব জড়-বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মানুষ ক্রমশই মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিতেছে।

শক্তিকে যখন চৈতন্যময়ী ও কল্যাণময়ী বলিয়া পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান অনুভব করিবে তখই পাশ্চাত্যে শক্তি-পূজার প্রবর্তন হইবে। সেই দিন অনতিদূর। কারণ, দুই-এক-জন জড়-বিজ্ঞানীর মধ্যে শক্তির আনুগত্যের যে মনোভাব দেখা গিয়াছিল বর্তমানের বিশ্ব-সঙ্কট পাশ্চাত্যে তাহার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। ঋষিপ্রতিম বিশ্ব-বিশ্রুত জড়-বিজ্ঞানী আইনস্টাইন শক্তি-মদ-মত্ত জড়-বিজ্ঞানীদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন,—শক্তির অপব্যবহার পৃথিবীর পক্ষে শুভ নহে। তিনি শক্তির প্রতি আনুগত্যের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

জড়-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা পাশ্চাত্য-ধর্ম-দর্শনের ভিত নড়াইয়া দিয়াছে। আদম-ইভ, বিশ্ব-পিতার ছয়দিনে বিশ্ব-সৃষ্টি ইত্যাদি বাইবেলের সিদ্ধান্ত, ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ অনুযায়ী আজ অচল হইয়া পড়িয়াছে। তাই পাশ্চাত্যে আজ সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত

একত্র করিয়া এক নূতন দার্শনিক-দৃষ্টি-লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন। পাশ্চাত্যের এই philosophy of scientists আন্দোলন ক্রমাগত জোরদার হইতেছে।

শক্তির প্রতি আনুগত্যহীন জড়-বিজ্ঞানের দানবীয়তা আবার পাশ্চাত্যকে প্রাচীন-ভারতীয়-ধর্মদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে। অধুনা বহু বিদেশী তন্ত্র-বিজ্ঞান ও বৈদান্তিকদর্শন সমন্বিত ভারতীয় সনাতন-ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম-কৃষ্টিতে শ্রদ্ধাশীল হইতেছেন।

॥ শ্যামাসঙ্গীত ॥

ধীরেন দেবনাথ, এম, এস-সি. বি. এড্

তুই কী মাটির মূর্তি শুধু
তোর কী কোন শক্তি নেই,
শাস্তি কেন দিস্‌না তারে—
তোরই নিন্দা করছে যেই?
কেউ বলে তুই 'মাটির পুতুল',
কেউ বা বলে তোর পূজাভুল;
এদের কেন দেখাস্‌না তোর—
রুদ্র-ভয়াল রূপটি সেই?
আমি যে আর তোর অপমান
সইতে নাহি পারি গো মা,
নীরবে তুই সব সয়ে যাস্
এ কেমন তোর খেলা ও মা।
জাগ্‌রে মা তুই জাগ্‌রে এবার,
নিন্দুকেরে কর মা সংহার;
দেখিয়ে দে মা জগৎ জনে—
তোরই সৃষ্টি বিশ্ব এই।

নির্জনে নির্বাসন

তপন দেবনাথ

টুপ্ করে ঢিলটা ছুড়তেই পুকুরের জলের ওপর একটা গোল চাকার ঢেউ উঠে উঠে মিলিয়ে যায়। নারকেল গাছগুলোর ঝাঁঝরি কাটা পাতাব ফাঁক দিয়ে ঢলে পড়া সূর্যের চক্‌চকে রূপালী কয়েকটা ফলা রঞ্জনের উদোম পিঠটায় খোঁচা মারে। কঞ্চির আগা দিয়ে মাটির বুকে আঁক কাটে সে। জলের ওপর কয়েকটা আলোব টুকরো তখন তির তির করে কাঁপে।

বঞ্জন টিয়ার চোখে কতদিন চোখ রেখেছে অথচ জানতে পারেনি, সেই চোখের গভীবে একটা গাঢ় ব্যথার ঝাপসা কুয়াশা অনেক কিছু আড়াল কবে আছে।

রঞ্জনের মনে পড়ে গতকালের ঘটনা।

হ্যাঁরে শুনেছিস্, কাল টিয়ার বিয়ে।

রঞ্জন তখন মার মুখেব দিকে তাকিযে। আসলে ঠিক সেই সময়ে তার বুকের মধ্যে ঝনাৎ করে অনেকখানি লাল রক্ত উপচিয়ে উঠেছিল। সে হাত বাড়িয়ে সামনের দাওয়ার খুঁটিটি জাপটে ধরে দেখলে মা উঠোন পেরিয়ে দরজার দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

কিরে, একা একা এখানে চুপচাপ বসে আছিস্? বাড়ী যাবি না?

রঞ্জনের গোছা চুলের ওপর আল্‌তো করে মা হাতটা রাখে। রঞ্জন তখন জোড়া হু-হাঁটুর ওপর থুত্‌নিটা রেখে কালো জলটার দিকে তাকিয়ে। চারপাশে তখন থক্‌থকে কালো অন্ধকার নেমে এসেছে। কঞ্চির আগা দিয়ে মাটির ওপর লেখা 'টিয়া' নামটা আরো একবার ভালো করে দেখে সে। সে জানে, টিয়া আর কোনদিন সেই পুকুর

পাড়ে নির্জন বাবলা গাছটার তলায় আসবে না। সে ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ে পুকুরের শান্ত জলের ওপর ছোট ছোট ঢেউ তোলে। সেই ঢেউগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে তার বুকের মধ্যে ধাক্কা মারে। তার দু'চোখের কোলে টলটলে বিন্দুগুলো ভেঙ্গে নিচে পড়ার আগেই সে দু' হাঁটুর মাঝে নিজের মুখটা লুকিয়ে ফেলে।

বালিশে মাথা রেখে বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে রঞ্জন একমনে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনে। দূরে শাঁখের শব্দগুলো এখন ক্রমশ থিতিয়ে এসেছে। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে চোখ মেলে সে। নিজের বুকের আওয়াজ শুনতে থাকে। হঠাৎ কয়েকজোড়া হ্যারিকেনের আলোতে সামনেব উঠোনটা ভরে যায়। দরজায় প্রচণ্ড আঘাত। সে দরজা খুলে বাইরে আসে। সামনে মার সদ্যঘুম ভাঙ্গা মুখ, চোখে ব্যাকুল চাহনি। সামনে টিয়ার বাবাকে দেখে সে। অন্ধকারে একটি ধারালো মুখ।

টিয়া কোথায় ?

রঞ্জন জানে টিয়ার বাবার এই প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই।

'চুপ করে থেকো না, জবাব দাও।

'টিয়া আমার কাছে আসেনি, আমি জানি না ও এখন কোথায় !'

একটি ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই অদ্ভুত লাগে।

আপনারা সবাই একবার এদিকে আসুন, পিছনের পুকুরে একটা কি যেন ভাসছে !

রঞ্জন ততক্ষণে দৌড়ে গেছে পুকুরঘাটে। লাল জোরনী জড়ানো দেহটা কালো জলের ওপর ভেসে আছে। সে শেষবারের মতো টিয়াকে ছোঁয়ার জন্য জলে ঝাঁপ দেয়। দু'হাতে টিয়ার ভেজা শরীরটা তুলে আনে পুকুর ঘাটে। লাল জোরনী জড়ানো ঠাণ্ডা নিথর দেহটা ঝাপসা আলোতেও জলজল্ করে। ভেজা রজনীগন্ধার সেই

ভালোলাগা গন্ধটা নাকে আসে। সে এভাবে টিয়াকে কোনদিন ছোঁয়নি। টিয়া কথা রেখেছে।

দেখো, আমাকে কেউ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

সামনের ঘাস বিছানো নরম বিছানায় সে টিয়াকে শুইয়ে দেয়। ওর শরীর থেকে টুপ্‌টুপ্‌ করে ফোঁটা ফোঁটা জল নিচের ঘাসগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছে। আধবোজা চোখের পাতার কোল ঘেঁষে টানা কাজলের ধার বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে।

রঞ্জন এবার মাথা তুলে টিয়ার বাবার চোখের ওপর চোখ রাখে। চারপাশে সবাই তখন নিথর নিস্পন্দ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। জল থেকে একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ওর ভেজা শরীরটা ধুইয়ে দেয়।

প্রার্থনা

বলরাম নাথ

নন্দিত, অনুপম
হউক হৃদয় মম,
ওগো-প্রভু, প্রিয়তম—
তোমার ইঙ্গিতে।
স্পন্দিত হউক চিত্ত
তব মধুনামে নিত্য,
জ্বলুক জ্ঞান আদিত্য—
প্রেমের সহিতে।
নবছন্দ নিয়ে হাসি
কর্ম প্রবণতা রাশি
হৃদয়ে উঠুক ভাসি—
বরাভয় নিয়ে।
চরিত্র অমূল্য ধন
করি যেন আহরণ,
সযতনে প্রাণপণ—
মনোযোগ দিয়ে।
অন্তরের প্রেম-প্রীতি
শ্রদ্ধার সহিত নিতি
সকল মানব প্রতি—
বর্ষিত হউক।
গভীর নিষ্ঠার সাথে
জগত মঙ্গল ব্রতে
সর্বদা নিরত হতে—
প্রেরণা জাগুক।

অমাবস্যার স্মারক স্তবকে

কার্তিকচন্দ্র দেবনাথ, এম. এ.

তোমাকে ভুলে যাওয়ার শপথ নিলাম
সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে।
কেননা, সমুখে অনেক আঁধার—
অপরিচয়ের গণ্ডী যেখানে গভীর,
হৃদয়ের ভার লাঘবের
এমন নৈকট্য আর কোথায় পাব।
জলের ঢেউয়ের মত
স্মৃতির পরদা সরে যায়;
গানের কলির লতানো দেহটা
আমাকে আর আলিঙ্গনে স্তব্ধ করবে না,
দুটি অধরের সহস্র বসন্ত ঝরানো নিবিড়তা
আমার বুকের মালঞ্চে ঘুমুবেনা,
নীল নয়নের নীরব প্রস্তুতি
আমাকে ভুলিয়ে দেবে না
ফেলে আসা দিনের অসারতাকে।
হে—অখণ্ড ভালবাসা!
তুমি শুধু একবার পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে এলে
অমাবস্যার স্মারক—স্তবকে।
আমাকে গোপনতায় তুমি রিক্ত করে গেলে।
ভালবাসার মর্যাদা ভালবাসায় পূর্ণ হয়—
বঞ্চনার গুরুভার
তোমাকে ভুলে যাওয়ার চেতনায়
বুকে তুলে নিলাম।

পাত্র-পাত্রী

২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

পাত্রী (৩৫½, ১৬.৪.৪৮) : (৫'-২"), পঃ বঃ, বি. এস. সি (ম্যাথ), এম. স্ট্যাট তুলা, পি. এইচ. ডি রতা, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাটিস্‌টিসিয়ান। সুন্দরী, সুগঠনা এবং সুমুখশ্রী। রুচীশীলা, উদার মনোভাবাপন্না এবং একান্ত ঘরোয়া। উপযুক্ত উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শীঘ্র বিবাহ। বামাচরণ নাথ, 'সতীমাতা হাউস' ২০, রবার্টসন রোড, পোঃ—গরীফা, ২৪ পরগণা, পিন—৭৪৩১৬৬।

পাত্র—(২৯), (৫'-৬"), সুস্বাস্থ্য সুন্দর চেহারা বি. এস. সি, অনুত্তীর্ণা। ব্যবসায়ী মাসিক আয় ১,৫০০ টাকা। সুন্দরী সুস্বাস্থ্যবতী শিক্ষিত পাত্রী চাই। বয়স ২০-২৪ হওয়া চাই। এবং,

পাত্রী—(২৪), (৫'৫"), বি. এ., বি-এড সুগঠনা ফর্সা, সূচীশিল্প ও গৃহকর্মে নিপুনা। সুপুরুষ প্রফেসার বা অফিসার পাত্র অগ্রগণ্য, বয়স ৩০-৩২। এবং

পাত্রী—(২১), (৫'-৩"), বি. কম ফাইন্যাল ইয়ার ফর্সা, সুগঠনা সূচীশিল্প ও গৃহকর্মে নিপুনা। সুপুরুষ সরকারী চাকুরীজিবী পাত্র চাই। বয়স ২৮ বৎসর হওয়া চাই।

প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিজাত পরিবার হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীডালিম কুমার নাথ, গ্রাম+পোঃ—গোসবা, ২৪ পরগণা।

পাত্রী—এস. এফ, অনুত্তীর্ণা (২২) শ্যামবর্ণা, লাবণ্যযুক্তা সঙ্গীতজ্ঞা গৃহকর্মে নিপুণা। পাত্রীর পিতা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অফিসার। সুউপায়ী পাত্র চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। শ্রীদীনেশ চন্দ্র নাথ, ই-৪৯, রামগড় কলোনী, কলি-৪৭।

পাত্রী—পূর্ব বঙ্গীয় (২১), (৫'-৩") B. A. উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। নম্রস্বভাবা, উত্তম মুখশ্রীযুক্তা, গৃহকর্মে নিপুণা এবং মেসিনে মেয়েদের যাবতীয় সেলাই ও সূচীশিল্পে এবং অন্যান্য হাতের কাজে নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। Shri J. C. Debnath, Qrt. No.—460/VI/Type "B" P. O.—Balconagar, Dist—Bilaspur, (M.P), Pin-49-5684

পাত্রী—(২৭), (৫'-৪"), বি. এ, পার্ট ওয়ান গায়ের রং শ্যামবর্ণা গৃহকর্মে নিপুণা স্বাস্থ্য ভাল এবং সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই।

পাত্রী—(১৮), (৫'-৩"), পড়াশুনা ক্লাশ নাইন, গায়ের রং শ্যামবর্ণা। গৃহকর্মে নিপুণা। স্বাস্থ্য ভাল এবং শুশ্রী। পাত্রীর জন্য চাকুরে বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। এ

পাত্র—(২৬), ব্যবসায়ী, পড়াশুনা ক্লাশ নাইন। কলিকাতার উপর দোকান, মাসিক আয় ১৫০০। নিজস্ব দোতালা পাকা বাড়ী ইছাপুর। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীস্বপনরঞ্জন ভৌমিক, ১৭ নং উল্টাডাঙা মেন রোড, (মুচিবাজার) কলিকাতা-৬৭।

পাত্রী—(১৮), (৫'-৩'') মাধ্যমিক পাশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, নম্র স্বভাবা, সুগঠনা গৃহকর্মে ও সূচীশিল্পে নিপুণা। নজরুলগীতি ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে সঙ্গীতশ্রী ও সঙ্গীত বিশারদ। একমাত্র কন্যা। শিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীরবীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল লুব সেণ্টার, ২১-এ, সাগর দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০০৭৩। ফোন—২৭-৭২৪৭, ২৬ ৯২২০ এবং ২৬ ৮৯৫৪।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

শ্রীসুনীল কৃষ্ণ নাথ
২৫/৭, ইষ্টল্যাণ্ড
পোঃ ইছাপুর
জিলা : ২৪ পরগণা

অধ্যাপক শশধর দেবনাথ
জেইল রোড
পোঃ বিলোনীয়া
ত্রিপুরা দক্ষিণ

শ্রীস্বরাজপতি দেবনাথ
ডেপুটি ডাইরেক্টর
এনিমল হাজব্যাণ্ডারী
পোঃ অভয়নগর
ত্রিপুরা পশ্চিম

শ্রীননীগোপাল দেবনাথ, উকিল
গ্রাঃ গনকী পোঃ খোয়াই,
ত্রিপুরা পশ্চিম

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৯০

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম এ. বি. টি

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

শ্রীশ্রীশিবগীতা

দ্বিতীয়োঽধ্যায়

বৈরাগ্যোপদেশঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুবর্ণগৌরী দূর্ব্বায়া দলবচ্ছ্যামলাপি বা।
পীনোত্তুঙ্গস্তনাভোগভুগ্নসূক্ষ্মবিলগ্নিকা॥ ১০

বৃহন্নিতম্বজঘনা রক্তপাদসরোরুহা।
রাকাচন্দ্রমুখী বিম্বপ্রতিবিম্বরদচ্ছদা॥ ১১

নীলেন্দীবরনিকাশনয়নদ্বয়শোভিতা।
মত্তকোকিলসংলাপা মত্তদ্বিরদগামিনী॥ ১২

কটাক্ষৈরনুগৃহ্ণাতি মাং পঞ্চেষু শরোত্তমৈঃ।
ইতি যাং মন্যতে মূঢ় স তু পঞ্চেষুশাসিতঃ॥ ১৩

তস্যাবিবেকং বক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতো নৃপ।
ন চ স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চায়ং নপুংসকঃ॥ ১৪

অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ পূর্ণো দ্রষ্টা দেহী স জীবনঃ।
যা তন্বঙ্গী মৃদুর্বালা মলপিণ্ডাত্মিকা জড়া॥ ১৫

সা ন পশ্যতি যৎকিঞ্চিন্ন শৃণোতি ন জিঘ্রতি।
চর্ম্মমাত্রা তনুস্তস্যা বুদ্ধা ত্যজস্ব রাঘব॥ ১৬

অনুবাদঃ যে নারী স্বর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী অথবা দূর্বাদলের ন্যায় শ্যামলাঙ্গী; যে নারী পীনপয়োধরা, সূক্ষ্মবস্ত্রপরিধানা, বৃহৎ-নিতম্ব-জঘনা; যে নারীর পদতল রক্তকমলের ন্যায়; যে নারীর মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায়; যে নারী নীলপদ্মের ন্যায় নয়নযুগল দ্বারা শোভিতা; যে নারী মত্তকোকিলনাদিনী, মত্তদ্বিরদগামিনী সেই নারী কটাক্ষ বিক্ষেপ করে পঞ্চশরের শর দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করুক—যে পুরুষ কামের বশবর্ত্তী হয়ে এরূপ কামনা করে সে অতি মূঢ়মতি। ১০-১৩॥ সেই মূঢ়মতির বিবেকহীনতা কীর্তন করছি, হে রাজা, শ্রবণ করুন। স্ত্রী বলে কেউ নেই, পুরুষ বলেও কেউ নেই এবং নপুংসক বলেও কেউ নেই; কেবল অমূর্ত-পুরুষ. আত্মাই দেহ ধারণ করে সমস্ত দর্শন করেন। যাকে কৃশাঙ্গী ও কোমল-হৃদয়া বালা বলে মনে হয়, সে আসলে মলপিণ্ডময়ী জড়াত্মিকা। ১৪-১৫॥ সে নিজে কিছুই দর্শন করে না, কিছুই শ্রবণ করে না, কোন কিছু আঘ্রাণও করে না। তার দেহ চর্মময় দেহমাত্র। হে রাঘব। এই সমস্ত বিবেচনা করে আপনার ভ্রান্তি দূর করুন। ১৬॥ [ক্রমশঃ]

অনুবাদক—সু. নাথ

সম্পাদকীয়

যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা—এই চারটি কাজ, প্রাচীনযুগে, ব্রাহ্মণদের অবশ্য করণীয় ছিল। তখন 'যজন-যাজন' বলতে বোঝাতো আধ্যাত্মিক-জ্ঞানার্জন এবং সকলের প্রতি সেই আধ্যাত্মিকজ্ঞানের আলোক-অর্পণকে (পৌরাণিক-যুগে অবশ্য 'যজন-যাজন' কিছুটা সঙ্কীর্ণ 'দেবপূজা ও পৌরোহিত্য' অর্থেও ব্যবহৃত হোতো); আর 'অধ্যয়ন-অধ্যাপনা' বলতে বোঝাতো জাগতিক-জ্ঞানার্জন এবং সেই জাগতিক-জ্ঞানের বিতরণকে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক—এই উভয়-প্রকার জ্ঞানের সাধনাকেই বলা হোতো শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে উন্নত করে। তাই তখন ব্রাহ্মণ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই সময় রুদ্রজ-ব্রাহ্মণরা, শিক্ষার ক্ষেত্রে, জাগতিক-জ্ঞান-চর্চাকে অস্বীকার করতেন না, তবে তাঁরা প্রাধান্য দিতেন আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-চর্চাকেই। তাই তখন তাঁরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হতেন।

মধ্য-যুগে, রাজা বল্লালসেনের আমলে, রুদ্রজ-ব্রাহ্মণরা রাজ-রোষে পতিত হন। রাজ-অত্যাচারে, আত্মরক্ষার্থে, তাঁরা বিভিন্ন নিম্নবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ফলে দারিদ্র্য-অনাহার-অশিক্ষা তাঁদের গ্রাস করে ফেলে। তখন থেকে দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচারের বন্যা বয়ে যাওয়ায় তাঁদের প্রকৃত-পরিচয় প্রায় হারিয়ে যায়। এমনকি, তাঁদের অনেকে নিজেদের অব্রাহ্মণ ভাবতেও শুরু করেন; ফল যা হবার তাই হয়; জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষাটুকুও তাঁরা হারিয়ে ফেলেন।

আধুনিক-যুগে ব্যয়বহুল-শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়। ফলে বিত্তশালী কয়েকটি অব্রাহ্মণ-জাতিও শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা

অগ্রসর হন। কিন্তু রুদ্রজ-ব্রাহ্মণরা কিছুটা দারিদ্র্য ও কিছুটা অনীহা বশত, সামগ্রিকভাবে, ততটা অগ্রসরে হন অসমর্থ; তাঁদের একটি অংশ শিক্ষার আলো থেকে প্রায় বঞ্চিতই থেকে যান।

বর্তমানে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা কিছুটা সহজ-লভ্য হয়েছে, চালু হয়েছে দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক-শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা জাগতিক-শিক্ষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। আবার জাগতিক-শিক্ষা আধ্যাত্মিক-শিক্ষার পথকে করে প্রশস্ত। তাই রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনো যাঁরা অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাঁদের জাগাতে হবে, তাঁদের শোনাতে হবে জাগরণের দীপ্ত-বাণী - আপনারা উঠুন; আপনাদের জন্ম শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণ-কুলে; আপনাদের সন্তান-সন্ততির রক্তে রয়েছে শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক-স্পৃহা সুপ্ত অবস্থায়; তাঁদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করুন, তাঁদের ঘুমন্ত-জ্ঞান-স্পৃহার জাগরণের সুযোগ দিন, সুযোগ দিন ব্রাহ্মণ-সন্তান হিসেবে তাঁদের প্রাথমিক পবিত্রকর্তব্য সম্পাদনের। রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের অশিক্ষা-কবলিত-অংশকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করার মহাব্রত উদ্‌যাপনে 'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী'-কে নিষ্ঠার পরিচয় দিতেই হবে।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

রাজকীয় ও স্বাধীনতোত্তর ত্রিপুরা রাজ্যে শৈবনাথতত্ত্বের উপাদান

ডক্টর এন. সি. নাথ

অধ্যক্ষ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা দেখিলাম ত্রিপুরার রাজবংশ শিবগোত্রীয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ শিবের ঔরসজাত। তাহা ছাড়া এই রাজবংশের প্রাচীন কুলদেবতা চতুর্দশ দেবতা বা চৌদ্দ দেবতার বহিরাগত পুজারীগণও বামাচারী তান্ত্রিক যোগী। চতুর্দশ দেবতার মধ্যে প্রধান দেবতা শিব।

উনকোটিঃ ত্রিপুরার অন্য প্রসিদ্ধ পীঠস্থান উনকোটি। উহা উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত পর্বতোপরি অবস্থিত। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে এখানে বিরাট মেলা হয়। ইহা যে শৈবতীর্থ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অসংখ্য প্রস্তর পর্বতগাত্রে ছড়াইয়া আছে। এইগুলিই এখানের বিগ্রহ। অনেক প্রস্তরে খোদিত মূর্তিও আছে। উনকোটি সম্পর্কে কেহ কেহ সারগর্ভ নিবন্ধ রচনাও করিয়াছেন। তবে কেহই একথা বলেন নাই যে এখানে নাথধর্মের কোন কিছু আছে। কিন্তু আমাদের ধারণা ইহা নাথ সম্পর্কশূন্য নহে। বঙ্গদেশে নাথধর্মের বহুল প্রচার-প্রসারের যুগে সম্ভবতঃ এখানে গৃহত্যাগী যোগীদের বিরাট ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। গোপীচন্দ্রের কাহিনীতে পাই — বার কোটি যোগী আইল

তের কোটি চেলা।

ছয় মাসের পাই জুড়ি

আসিয়া মিলিলা॥

বঙ্গদেশে বিপুল সংখ্যায় যোগীর আগমনে রাজা গোপীচন্দ্র বিস্মিত ও

ভীত হইয়াছিলেন। হাড়ি সিদ্ধার[১] এক হুঙ্কারেই নাকি ষোলশত যোগী রাজসভায় অকস্মাৎ আবির্ভূত হন—

হুঙ্কার ছাড়িল যোগী যোগ করি সার।
ষোলশত যোগী আইল সিদ্ধা হাড়িপার॥
ললাটে চন্দন ভস্ম মাখা কলেবর
সিংহনাদ কাঁথা ঝুলি অতি ভয়ঙ্কর॥
বিস্ময় মানিল রাজা না জানে বিশেষ।
আচম্বিতে এত যোগী আইল বঙ্গদেশ॥
যোগীর চরণে রাজা কাঁপে থর থর।
পড়িল যোগীর পায় বঙ্গের ঈশ্বর॥[২]

এই সব যোগী ত্রিপুরারাজ্যের পাহাড়ে শৈবতীর্থ গড়িয়া তুলিলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। গোপীচন্দ্রের রাজ্য ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও ত্রিপুরার অদূরে ময়নামতী পাহাড় ইহার সাক্ষী স্বরূপ হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ গৌড়বঙ্গে বল্লালের অত্যাচার সুরু হইলে যোগীরা দলে দলে পলায়ন করতঃ গৌড় সংলগ্ন আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা অরণ্যের নিভৃত অঞ্চলে শিবারাধনার একটি ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতেও পারেন।

১। =জালন্ধরিপা বা জালন্ধর নাথ। চর্য্যাগীতিতে ইনি উল্লিখিত ('সাখী করিব জালন্ধারি পাএ')। সাখী=সাক্ষী। ইনি পাপবশতঃ গোপীচন্দ্রের বাটীতে হাড়ির কর্ম করিতেন।

২। গোপীচন্দ্রের গান দ্রষ্টব্য। শেষ পর্য্যন্ত গোপীচন্দ্র হাড়ি সিদ্ধার নিকট নাথ যোগ মার্গে দীক্ষিত হন এবং গুরুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। হীরা-নটীর হাবভাব প্রদর্শনে ভ্রূক্ষেপ করিয়া তিনি বলেন—'কি তুমি নেহালাও নটী তোমার পাজায় পাজায় চুল। দুই স্তন দেখি যেন তোর ধুতুরার ফুল॥ হাড়িপার চরণে মোর মন আছে বান্ধা। রাজ্য-পাট নারী-পুরী সব মিথ্যা ধান্ধা॥' নেহালাও=দেখাও।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক বা অন্য গবেষক এই ক্ষেত্রটি দেখিতে আসেন না। কেন? কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইবার আশঙ্কায়? নাথ ঐতিহ্য আবিষ্কৃত হইবার ভয়ে? তাহা হইলে নাথতত্ত্ব বিশারদগণকেই এই তীর্থের রহস্য উদঘাটনের দায়িত্ব স্কন্ধে নিতে হইবে।

ঊনকোটি নামের অর্থ কোটি হইতে এক কম। কথিত আছে এই তীর্থে ঊনকোটি সংখ্যক দেববিগ্রহ আছে। এই সংখ্যা হইতেই নাকি তীর্থের নামকরণ হইয়াছে। তবে গোপীচন্দ্রের কাহিনীতে ঊনকোটি নাথ সিদ্ধার কথা পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথের নেতৃত্বে এই যোগীরা দেশ ভ্রমণ করিতেছিলেন। একস্থানে আসিয়া তাঁহারা মাত্র একটি চাউলের ভাতে আহার সমাধা করেন—

ঝুলি বিচারিয়া নাথ[৩] এক চাউল পাইল।
এক চাউলের ভাত ঊনকোটি সিদ্ধায় খাইল॥

ইহা গোরক্ষনাথের যোগবলেই সম্ভব হইয়াছিল। কৈবল্যনাথ বা রামঠাকুরের জীবনীতে দেখা যায় মানস সরোবরের তীরবর্তী কয়েকজন যোগী রামঠাকুরকে কয়েকটী অজ্ঞাতপরিচয় শস্যের দানা দিয়া বলিয়াছিলেন যে ইহার একটি দানা ভক্ষণ করিলে মাসেক কাল আর অন্য কিছু আহার করিবার দরকার হইবে না। গোরক্ষনাথের ঝুলিতেও ঐ জাতীয় কোন চাউল ছিল কিনা কে জানে? সে কথা থাকুক; আসল কথা হইল, এই ঊনকোটি সিদ্ধার সঙ্গে ঊনকোটি তীর্থের সম্পর্ক অনুমান করা যাইতে পারে। এই যোগীরা হয়তঃ এখানে কিছুদিন আস্তানা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকে এক একটি প্রস্তরকে ইষ্ট-দেবতার বিগ্রহরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই এ স্থানের নাম ঊনকোটি। [ক্রমশঃ]

৩। = গোরক্ষনাথ।

ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান

মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য

ধীরেন দেবনাথ, এম. এস-সি, বি.এড

পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন। কেউ বৈজ্ঞানিকরূপে, কেউ রাজনীতিবিদরূপে, কেউ ধর্মপ্রচারকরূপে, আবার কেউ বা সমাজ সেবকরূপে। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। বিশ্বমানবের মঙ্গল সাধন। আর তাইতো আজ তাঁরা নিজ নিজ কর্মগুণে স্মরণীয়, বরণীয়; মরেও অমর।

সমাজসেবক সত্যনিষ্ঠ মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য এমনি একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তাঁর জন্ম হয়েছিল রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথবংশে।

রাজা বল্লাল সেনের আমলে রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-নাথেরা রাজরোষে পতিত হন এবং রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। সেই সময় থেকে দীর্ঘদিন ধরে অপপ্রচার ও কুৎসার বন্যা বয়ে যাওয়ায় রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-নাথদের প্রকৃত পরিচয় প্রায় হারিয়ে যায়। এমন কি, রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের একটি বড় অংশও আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেদের অব্রাহ্মণ বলে ভাবতে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে নাথদের মধ্যে একটি জাগরণ প্রয়াস দেখা দিলেও সেটি ছিল মূলতঃ ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অপর একটি স্বতন্ত্র জাতি (যা' ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াস। সত্যনিষ্ঠ মুক্তারাম এই প্রয়াসের ভিত্তিভূমিতে প্রকৃত সত্যের কিছুটা অপলাপ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

চেয়েছিলেন রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসেবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে। আর এই কাজে তাঁর ব্রহ্মতেজ সর্বদাই প্রকাশিত হ'ত।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের সর্বাত্মক উন্নতি-অগ্রগতির জন্য তিনি ছিলেন এক নিবেদিত প্রাণ। রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের সার্বিক কল্যাণে তাঁর জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ নাথদের কলঙ্ক-অপমান তাঁর রক্তে দিত আগুন জ্বেলে। তিনি নিন্দুককে দাঁড় করাতেন অপরাধীর কাঠগড়ায়। তাঁর বড় বড় ডিগ্রী ছিল না বটে, কিন্তু তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের কাছে নীরবে হার স্বীকার করতে হ'ত প্রোথিতযশা পণ্ডিতদেরও। অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞানের অধিকারী এই সাদাসিধে মানুষটি রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের সম্পর্কে কুৎসা রটনাকারীকে কখনই ছেড়ে কথা কইতেন না তা' তিনি যত বড়ই হোন না কেন। ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান তাঁর মত ব্রাহ্মণ পুরুষ সমাজে সত্যি বিরল। যেখানেই রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথেরা নিন্দিত হতেন সেখানেই তিনি ছুটে যেতেন সাক্ষাৎ সংহার-কর্তা রুদ্ররূপে। তাঁর যুক্তির কাছে পরাজয় মানতে হ'ত নিন্দুককে। দুঃখ প্রকাশ পূবক রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেই হ'ত সেই নিন্দুককে।

হাওড়া পণ্ডিত সমাজের কিছু পণ্ডিত-মূর্খ পণ্ডিত মুক্তারামের পণ্ডিত-সমাজে প্রবেশের বিরোধিতা করেছিলেন। এঁদের বক্তব্য ছিল—অব্রাহ্মণ বিধায় নাথদের পণ্ডিত-সমাজে প্রবেশ নিষেধ। কারণ, পণ্ডিত-সমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রবেশেরই অধিকার আছে পণ্ডিত প্রবর মুক্তারাম পণ্ডিত-মূর্খদের ঐ বক্তব্য নিজ পাণ্ডিত্য, যুক্তি ও শাস্ত্রবলে খণ্ডন পূর্বক নাথদের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে প্রতিপন্ন করতঃ উক্ত সমাজের সভ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন এবং একদা ঐ সমাজেরই সহ-সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করে পণ্ডিত-সমাজকেই করেছিলেন ধন্য। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও খ্যাতির প্রতি সম্মান

প্রদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ হাওড়া পৌরসভা তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করেন। কোন ব্যক্তির নামে তাঁর জীবদ্দশাতেই কোন রাস্তার নামকরণ একটি বিরল ঘটনা।

ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্যের অন্যতম কীর্তি হ'ল—'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা। এই সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সমগ্র রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ নাথদের মধ্যে এক মহামিলন সৃষ্টি করা। তাই তাঁকে রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ নাথদের পুনর্জাগরণ আন্দোলনের পথিকৃৎ বলতে হয়। তাঁর সংগ্রামী চেতনা ও কর্ম-কাণ্ড রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের অনুপ্রাণিত করেছে সংগ্রামী হতে। সে সংগ্রাম ছিল প্রচলিত মিথ্যা প্রবাদের বিরুদ্ধে সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। সর্বক্ষেত্রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর সংগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য। যেন স্বয়ং দেবাদিদেব তাঁর অমৃতসন্তানদের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করতে তাঁকে পাঠিয়েছেন এই মর্ত্যলোকে। সত্যি কথা বলতে কি, পরম-পিতার অনুপ্রেরণা ও শুভাশীর্বাদ না থাকলে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে একটি জাতির পুনরুত্থানের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের জন্য যা' করে গেছেন তা' স্মৃতির আকাশে নবভাস্করের ন্যায় চির ভাস্বর হয়ে জ্বলবে। তাঁর নাম রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন।

ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্যের সুদীর্ঘ জীবন ইতিহাস আমার জানার কথা নয়। কারণ, তিনি ছিলেন আমার থেকে প্রায় সত্তর বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ। তবে, পত্র-পত্রিকায়, লোকমুখে তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে তাঁকে আমি স্থান দিয়েছি দেবতার আসনে। অশিতিপর বৃদ্ধ কর্ম-যোগী এই জ্ঞান-তাপসকে দেখার সৌভাগ্য আমার একবারই হয়েছিল তাঁরই পুণ্যালয়ে বিগত

বছরের বিজয়া সম্মিলনীতে। এই মহামানবের পূত-পবিত্র শ্রীচরণ ছুঁয়ে আমি হয়েছি ধন্য, কৃতার্থ। সঞ্চয় করেছি কিছু পুণ্য।

সত্যের সংগ্রামে অপরাজিত গেরুয়া বসনধারী, দেবতুল্য, ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান এই মানুষটি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। প্রায় নিরানব্বই বছরের এক সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন শাশ্বত দেবধামে। ভারতমাতা হারিয়েছে তার এক সুযোগ্য সন্তানকে ; আর আমরা হারিয়েছি আমাদের একজন মহান পথ-প্রদর্শককে। কিন্তু—সত্যিই কী তিনি নেই? তিনি আছেন, থাকবেন চিরকাল আমাদেরই বিপ্লবী চেতনায়। তাঁর অতৃপ্ত বাসনা সেদিনই পরিতৃপ্তি লাভ করবে যেদিন রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথেরা শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে পরিগণিত হয়ে মর্যাদার আসনটি অলঙ্কৃত করতে সক্ষম হবেন। তাই রুদ্রজ ব্রাহ্মণ ভাইবোনদের কাছে আমার আকুল প্রার্থনা—আসুন, আমরা সত্যের প্রতিষ্ঠায় সত্যনিষ্ঠ মুক্তারামের মহান আদর্শকে শিরোধার্য করে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের অগ্নিশপথ নিই ; তার অসমাপ্ত কাজকে কার্যকর করে তুলি।

পরিশেষে, দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে প্রয়াত মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্যের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তি।

ধর্ম বনাম বিজ্ঞান

সুবোধকুমার নাথ, এম এ. বি. টি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাচীন-ভারতীয়-শাস্ত্রে বিদ্যাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) পরাবিদ্যা ও (২) অপরাবিদ্যা। মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ॥"

—ব্রহ্মবিদেরা বলেন, দুটি বিদ্যা জানার আছে—একটি পরাবিদ্যা; অপরটি অপরাবিদ্যা।

সাধারণতঃ অপরাবিদ্যাকে বিজ্ঞান এবং পরাবিদ্যাকে ধর্ম বলা হয়ে থাকে। ওপরে উদ্ধৃত উপনিষদের শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র সেন বলেছেন—"পরাবিদ্যা সর্বাতীত ব্রহ্মের জ্ঞান, অপরাবিদ্যা সৃষ্ট-জগতের জ্ঞান।" এখানে 'সর্বাতীত ব্রহ্ম' নিঃসন্দেহে নির্গুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন বলেই এঁকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ধরা যায় না, মাপা যায় না। তাই এখানে বিজ্ঞান অচল বলে বলা হয়ে থাকে। এই ব্রহ্ম সম্পর্কিত পরাবিদ্যাকে বলা হয়ে থাকে ধর্ম। আবার সৃষ্ট-জগৎ দৃশ্যমান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; একে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে এর মাপজোক করা চলে। তাই এই সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কিত অপরাবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে।

আবার মানুষের বহির্জগৎ হচ্ছে দৃশ্যমান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ; আর অন্তর্জগৎ হচ্ছে অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ। মানুষের এই বহির্জগৎ সম্পর্কিত বিদ্যাকে অপরাবিদ্যা অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং অন্তর্জগত সম্পর্কিত বিদ্যাকে পরাবিদ্যা অর্থাৎ ধর্ম বলা হয়ে থাকে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কারণ, যাকে দেখা যায়, ধরা-ছোঁয়া যায়, তাকে সহজে জানা যায়। তাই এই জ্ঞান নিকৃষ্ট অর্থাৎ অপরা; আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। কারণ, যা দেখা যায় না, ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাকে সহজে জানাও যায় না। তাই এই জ্ঞান উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরা।

সুতরাং এখন মোটামুটিভাবে এমন কথা নিশ্চয় বলা চলে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে অপরাবিদ্যা বা বিজ্ঞান; আর পরাবিদ্যা বা ধর্ম হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান।

মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম শ্লোকটি হচ্ছে—

"তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে ॥"

—"সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই বেদচতুষ্টয় এবং শিক্ষা (বর্ণের উচ্চারণ); কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ), ছন্দ ও জ্যোতিষবিজ্ঞান—এই ছয়টি বেদাঙ্গ। ইহারা অপরাবিদ্যা। আর যে বিদ্যার দ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মকে জানা যায় 'তাহাই' পরাবিদ্যা।"

উপনিষদের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র সেন বলেছেন—

"এখানে বেদকেও অপরাবিদ্যা বলা হইয়াছে।.........কিন্তু বেদের উপনিষদ ভাগে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ থাকা সত্ত্বেও বেদকে অপরাবিদ্যা বলা হইল কেন?.........যদি বেদশব্দে উপনিষদকেও বুঝাইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইহা দ্বারা এখানে বেদের অক্ষর-সমষ্টিকেই বুঝাইতেছে। উপনিষদে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই পরাবিদ্যা, উপনিষদের শব্দসমষ্টি অপরাবিদ্যা।"

'উপনিষদের শব্দসমষ্টি' অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; শব্দগুলো (অক্ষর-সমষ্টি অর্থাৎ লিখিতরূপ) চোখে দেখা যায়, জিভ দিয়ে উচ্চারণ করা যায়, উচ্চারিত শব্দ-ধ্বনি কান দিয়ে শোনা যায়। সুতরাং সেটা অপরাবিদ্যা। আর 'উপনিষদে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান' উপলব্ধির বিষয়, তাকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কান দিয়ে শোনা যায় না, নাক দিয়ে তার কোন গন্ধ পাওয়া যায় না, জিভ দিয়ে তার কোন স্বাদ পাওয়া যায় না, ত্বক দিয়ে তাকে স্পর্শ করা যায় না। সুতরাং সেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাই সেটা পরাবিদ্যা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—বিজ্ঞানে কি পরাবিদ্যা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন বিষয় আলোচিত হয়নি? ধর্মশাস্ত্রে কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অর্থাৎ অপরাবিদ্যা আলোচিত হয় নি?

বিজ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকিছুকে দুটিভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) পদার্থ (matter) ও (২) শক্তি (energy)। এর মধ্যে 'পদার্থ' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু শক্তি উপনিষদের ব্রহ্মের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এই অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পর্কেও বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়কে তো পরাবিদ্যা বলতেই হয়। আবার 'প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র বেদের কর্মকাণ্ড'কে তো উপনিষদই অপরাবিদ্যা বলেছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—তাহলে কি উপনিষদের 'ব্রহ্ম' আর বিজ্ঞানের 'শক্তি' একই জিনিস? সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করার ইচ্ছা রইলো। কারণ, এখানে আলোচনা করতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। [ক্রমশঃ]

শক্তিসাধনা বা মাতৃপূজা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ঋষি বলেছেন—'এই জগৎ প্রপঞ্চ মহামায়ার বিরাট মূর্ত্তি'; আবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উল্লেখ আছে—'জগৎ প্রকৃতিকেই মায়া এবং মহেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে।' জগৎ—প্রকৃতি, মায়া, শক্তি, মহামায়া প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জল, স্থল, জীবজন্তু, পাখী, বৃক্ষলতা, ফুলফল প্রভৃতি সমন্বিত কত বৈচিত্র্যময় এই জগৎ। জগতের সর্বত্র সমস্ত দ্রব্য বা প্রাণী, জড় বা চেতন, গ্রহ বা নক্ষত্র এক মহাশক্তি দ্বারা বিধৃত ও পরিচালিত। জাগতিক ব্যাপার সমূহ—এক নির্গুণ, নিরাকার, অখণ্ড ও অসীম চৈতন্যসত্তার শক্তির লীলা মাত্র। এই অখণ্ড চৈতন্যসত্তা সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা এবং সর্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের মূলে নিত্য অধিষ্ঠিত। ইনিই মহেশ্বর বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, এবং জগৎ ইহারই সগুণ বিকাশ (manifestation) বা শক্তির লীলা। পরমহংসদেব বলতেন,—'তিনিই এসব হয়েছেন।' ব্রহ্ম ও শক্তি এক এবং অভিন্ন। অগ্নি ও তাঁহার দাহিকাশক্তি যেমন পৃথক করা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তির ভেদ নাই। একটিকে ব্রহ্মের লীন (unmanifested) অবস্থা এবং আরেকটিকে তাঁহার বিকাশ (manifested) অবস্থা বলা যেতে পারে। পরমাত্মাকেই এই মহাশক্তি বিচিত্র নামে বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে দেশে কালে লীলায়িত করে বিশ্ব-সংসাররূপে প্রকাশ করছেন। কিন্তু এই জগতের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সবই পরিবর্তনশীল এবং নশ্বর। তাই জগৎ মায়া নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

এই জগতে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষ এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিবর্তনের ধারায় এবং ক্রমোন্নতির ফলে পূর্ণাবয়ব লাভ ক'রে মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ।

তার শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ, মস্তিষ্ক পূর্ণভাবে গঠিত ও বিকশিত। তার স্বাধীনভাবে চিন্তা ও ধারণা করার শক্তি এবং স্বতঃ প্রবৃত্ত কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা বর্তমান। মনুষ্যেতর অন্য কোন জীব বা প্রাণীর মধ্যে ইহার অভাব দেখা যায়। প্রস্তরে শুধু অবস্থিতি, এখানে শক্তি নিদ্রিত। বৃক্ষলতায় শুধু জীবনের বিকাশ। পশুপাখীর মধ্যে শক্তি সচল এবং সাধারণ জৈবিক ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ। শুধু মানুষেই শক্তির পূর্ণ বিকাশ; মানুষ এই শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণতা লাভ ও জীবনকে সার্থক করতে পারে। নিঃসন্দেহে মনুষ্যজন্ম সর্বোত্তম। মানুষ তার কর্মকলানুসারে বংশ, পরিবার ও পরিবেশ লাভ ক'রে জন্ম গ্রহণ করে। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মফলের গতিতে, পরিবেশের চাপে ও নিজের ইচ্ছায়, পরিবারের বা নিজস্ব আদর্শে সে স্বীয় শিক্ষা, শক্তি, স্বাস্থ্য ও সম্পদের উৎকর্ষ লাভের জন্য ধাবমান হয়। এখানে সংসার-নাটকের রচয়িত্রী প্রকৃতি বা মহাশক্তি প্রত্যেক অভিনেতাকে অর্থাৎ মানুষকে তার ভূমিকার উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্বাধীনতা দিয়েছেন। কেউ সাফল্য অর্জন করে, আবার কেউ করে না। কর্মক্ষেত্রে নিঃস্বার্থভাবে ও নিস্পৃহ হয়ে, সেবার মনোভাব নিয়ে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন ক'রে কর্মযোগী হবার সকল প্রকার সুযোগ প্রকৃতি ক'রে দিলেও অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার হয় না। মানুষ তার যৌবনের উন্মাদনায় মানবতার পূর্ণবিকাশ ও অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষের কথা বা জীবনের চরমলক্ষ্য (final goal of life) বিস্মৃত হয়। অহংকারের প্রাবল্যে মন এবং ইন্দ্রিয়গণ তাকে চালিত করে। সে স্বার্থান্ধ হয়ে নিজেকে সর্বদাই অপর থেকে পৃথক করে রাখে, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শুধু নিজেই ভোগ করতে চায়। তাই তার চেষ্টা থাকে শুধু স্বার্থেই কেন্দ্রীভূত। পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ এবং বিষয়ভোগে মগ্ন থাকার জন্য অন্তঃকরণে নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণা ও আত্মজ্ঞানের কথা

কোন সময় উদয় হলেও তা মোটেই আমল পায় না, সেটা আড়ালে ঢাকা পড়ে।

এদিকে সৃষ্টি কার্য্যের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য প্রকৃতি তাঁর মায়াস্পর্শ দ্বারা শুধু মানুষ নয়, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু দ্বারা তাঁর কাজ সমাধা করিয়ে নেন। জন্ম, বর্ধন, বিকাশ, অবক্ষয় ও বিনাশ—প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়ম নির্দিষ্ট গতিতে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কোন জীবের ইহা এড়াবার শক্তি নেই। একটা নির্দিষ্ট বয়সে যখন অবক্ষয় আরম্ভ হয় এবং মানুষ তার অজ্ঞাতসারে মরণের পথে অগ্রসর হতে থাকে, তখন জীবন নাটকের শেষ অঙ্কে মন সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তির হ্রাস, শারীরিক কর্মক্ষমতার হীনতা ও অসামর্থ্য বশতঃ সংসারের মুখ্য ভূমিকা থেকে তাকে সরে যেতে হয়। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে সৃষ্টিকার্য্যে তার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এবারে প্রকৃতি তাকে বিনাশের পথে ঠেলে দেবে এবং তার মূল উপাদানগুলিকে (constituent ingredients) নূতন অবয়ব গঠনের কাজে ব্যবহার করবে।

[ক্রমশঃ]

॥ লক্ষ্য ॥

কমল দেবনাথ

জীবন তোমার হয়ে উঠুক সার্থক,
নির্মল ফুলের মত,
যেন বাধা না পাও।
ঝড় তো আছেই,
ভয়ে যেন ছোট না হও।
পথ তো বন্ধুর,
সোজা সমতল কভু—
তাতে তুমি পেওনা ভয়,
চেওনা ফিরে।

গতি যার উল্কা সম,
পিছে তার পরে বহু
সম্মুখের লক্ষ্যও পিছে পরে রয়।
আগে যেতে হয় —
সার্থকতার পরেও যদি গতি হয় মন্থর
মন্থরতা খর্ব করে মহান বিস্ময়।

—:০:—

জীবনতো আর থাকেনা থেমে

অরুণা প্রভা দেবনাথ

স্মৃতির পালঙ্কে শুয়ে স্বপ্ন দেখছি—
ভোরের আকাশ ছেঁড়া আঁধার সূর্য
যেমন স্বপ্ন দেখে-সোনালী দিনের।

জীবনতো আর থাকেনা থেমে,
চল্‌ছে—চল্‌বে।

বাঁধ ভাঙা ঝরা পাতার স্রোতের মতো
ফুরিয়ে যাওয়া সময়ের হাত ধরে
আমিও যেন চল্‌ছি—নিঃসঙ্গ একেলা—
সাহারার মরু ভেঙে মরীচিকার পিছুপিছু
অজান্তে, একান্ত গোপনে।

তারপর!
হঠাৎ থেমে যায় আমার এ চলা।
কুয়াশায় ভেজা তেপান্তরের এক—
নির্জন পথের প্রান্তে এসে দাঁড়াই আমি
নিঃশব্দে, অবসন্ন দেহে।

নীরব আঁধার আলিঙ্গন করে আমাকে দুহাতে
সোহাগে, স্বস্নেহে,
আমিও হারিয়ে যেতে থাকি তার
পাষাণ বুকের অতলান্ত গহ্বরে
আস্তে·· আস্তে ··।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

১২৭। শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, সুভাষ এভিনিউ, পোঃ রাণাঘাট, জিলা নদীয়া।

১২৮। শ্রীশ্যামসুন্দর দেবনাথ, মালকানগিরি মেইন রোড, পোঃ মালকানগিরি, জিঃ কোরাপুট, উড়িষ্যা।

১২৯। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাথ, সাব ইন্স্পেক্টর অব স্কুল, বনকর, পোঃ বিলোনীয়া, ত্রিপুরা (দক্ষিণ)।

১৩০। শ্রীকৃষ্ণকুমার দেবনাথ, বিলোনিয়া সুপার মার্কেট, পোঃ বিলোনীয়া, ত্রিপুরা (দক্ষিণ)।

১৩১। শ্রীব্রজগোপাল দেবনাথ, গ্রাম বনকর, নেতাজী পল্লী, পোঃ বিলোনীয়া, ত্রিপুরা (দক্ষিণ)।

১৩২। শ্রীমিহির কুমার নাথ, প্রযত্নে শচীন্দ্র কুমার নাথ, গ্রাঃ বাসপাড়া কলোনী, পোঃ বিলোনীয়া, ত্রিপুরা।

১৩৩। শ্রীরমেশ নাথ, দক্ষিণ মির্জাপুর, পোঃ বিলোনীয়া, ত্রিপুরা (দক্ষিণ)।

পাত্র-পাত্রী

২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

১১। পাত্রী—(২১), (৫'-৩"), বি কম ফাইন্যাল ইয়ার, ফর্সা, সুগঠনা, সূচীশিল্প ও গৃহকর্মে নিপুনা। সুপুরুষ সরকারী চাকুরীজীবী পাত্র চাই। বয়স ২৮ বৎসর হওয়া চাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিজাত পরিবার হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীডালিমকুমার নাথ, গ্রাম+পোঃ—গোসাবা, ২৪ পরগণা।

১২। পাত্রী—পূর্ব বঙ্গীয় (২১), (৫'-৩") B. A. উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। নম্রস্বভাবা, উত্তম মুখশ্রীযুক্তা, গৃহকর্মে নিপুণা এবং মেসিনে মেয়েদের যাবতীয় সেলাই ও সূচীশিল্পে এবং অন্যান্য হাতের কাজে নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। Shri J. C. Debnath, Qrt. No.—460/VI/Type "B" P.O. –Balconagar, Dist –Bilaspur, (M.P.) Pin—495684

১৩। পাত্রী—(২৭), (৫'-৪"), বি. এ, পার্ট ওয়ান। গায়ের রং শ্যামবর্ণা, গৃহকর্মে নিপুণা, স্বাস্থ্য ভাল এবং সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীস্বপনরঞ্জন ভৌমিক, ১৭ নং উল্টাডাঙা মেন রোড, (মুচবাজার) কলিকাতা-৬৭।

১৪। পাত্রী—(২৬) বিশিষ্ট অধ্যাপক কন্যা পূর্ব নিবাস কুমিল্লা মধ্যমাকৃতি, ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, শান্তস্বভাবা গৃহকর্ম নিপুণা, সূচীশিল্পে ডিপ্লোমার অধিকারিণী এবং বি. এ পার্ট ওয়ান অনুত্তীর্ণা। শ্রীচন্দ্রমোহন ভৌমিক অধ্যাপক, আমলাপাড়া, পোঃ বদর্গী, জিঃ—২৪ পরগণা।

১৫। পাত্র—(২৭) বি-এস সি, বি-এড। বি-এস-বি পাঠরত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মাসিক আয় ১৫০০ টাকা। শিক্ষিত পরিবার। ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। ফটোসহ পত্রে যোগাযোগ করুন। শ্রীরামচন্দ্র পণ্ডিত, ১৩/২ কাশী ব্যানার্জী লেন। লক্ষ্মীতলা পাড়া পোঃ শান্তিপুর, জিলা নদীয়া।

১৬। পাত্রী (৩১) সুন্দরী সুশ্রী বি. এ. পাশ। হিন্দিতে এম. এ, টিচার ট্রেনিং পাশ, সেলাইয়ে লেডি ব্রাবোর্ন পাশ ও টাইপে অভিজ্ঞা। পূর্ববঙ্গের বনেদি পরিবার। পত্রদ্বারা যোগাযোগ করুন। সবিতা দেবনাথ, ২/৪০ বিজয়গড, কলিকাতা-৭০০০৩২।

১৭। পাত্রী—(২১/১৫৫ সেমি) পূঃ বঃ বর্তমানে দুর্গাপুর ষ্টীল প্ল্যান্টে কর্মরত পিতার একমাত্র কন্যা, ফর্সা, সুশ্রী, সুস্বাস্থ্যবতী, সঙ্গীতজ্ঞা, স্কুল ফাইন্যাল পাশ। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, ২১/৩ ভারতী রোড, দুর্গাপুর-৫, জিঃ বর্ধমান, পিনকোড—৭১৩২০৫।

১৮। নাথ পাত্র (৩৩ : ৫'-১১") BSc সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে দিল্লীতে কর্মরত বেতন ১৮০০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের বনেদী শিক্ষিত সম্রান্ত বংশজাত। সুন্দরী গ্রাজুয়েট সম্রান্তবংশীয়া সুরুচীসম্পন্না গৃহকর্ম নিপুনা স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই। সাম্প্রতিক ফটো ও জন্মকুণ্ডলীর (ছক) সহ যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

পিতা এবং পিতামহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন পদস্থ অফিসার। পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লীতে নিজস্ব বাসগৃহ। পিতার মাতুলালয় সম্রান্ত ডাক্তার বংশ এবং পাত্রের মাতুলালয় পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য জমিদার বংশ। Sri S. K Nath, 168, Tagore Park, Kingsway, Delhi, Pin 110009.

১৯। পাত্রী—(২১), S F. অকৃতকার্যা, সেলাই-এ ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুগঠনা, গৃহকর্মে নিপুণা। উপার্জনশীল পাত্র চাই। বিশেশ্বর দেবনাথ, গ্রাঃ ও পোঃ হাতিয়াড়া, ২৪-পরগণা। কলি ৫৯।

২০। পাত্র—(২৭), (৫'-৬), বি এ. অনুত্তীর্ণ, সুস্বাস্থ্য, ব্যবসায়ী। নিজস্ব তিনতলা বাডী আছে। শিক্ষিত সুন্দরী পাত্রী চাই। রমেশচন্দ্র নাথ, ই-এ/১/১, বাগুইআটি রোড, পোঃ দেশবন্ধুনগর।

২১। পাত্র—(২৪), (৫'-৪) ১২ ক্লাস উত্তীর্ণ। ব্যবসায়ী (ঔষধ সরবরাহকারী)। শিক্ষিত সুন্দরী পাত্রী চাই। শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবনাথ, পোঃ চররাহ্মনগর, জেলা-নদীয়া।

২২। পাত্রী—(২২), (৫'), বি. এ. পাশ, মধ্যম বর্ণা, সুশ্রী, সঙ্গীতজ্ঞা। বর্তমানে কলিকাতায় ব্রাহ্ম ট্রেনিং কলেজে সিনিয়র ট্রেনিং রত। আদি নিবাস বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। অধুনা হুগলী জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। শ্রীমাধবচন্দ্র দেবনাথ, ২৮/১ রামমোহন রায় সরণী (মালির বাগান), পোঃ বৈদ্যবাটী, হুগলী।

২৩। পাত্র—(৩৪), M.A. (Eng.) B.D., L.L.B। C.S.T.C-তে চাকুরীরত। ফর্সা, লম্বা, দোহারা চেহারা। শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই।

এবং

২৪। পাত্র—(২৭), দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ। ব্যবসায়ী। শিক্ষিত সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীরাজমোহন চৌধুরী, পোঃ—গ্রাম জাহাঙ্গর, জেলা—বর্ধমান।

পাত্র চাই

পাত্রী—(১৮) (৫'-৩") মাধ্যমিক পাশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। নম্রস্বভাবা, সুগঠনা গৃহকর্মে ও সূচীশিল্পে নিপুণা। নজরুলগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে সঙ্গীতশ্রী ও সঙ্গীত বিশারদ। একমাত্র কন্যা। শিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীরবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লুব সেণ্টার, ২১-এ, সাগর দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০০৭৩। ফোন—২৭-৭২৪৭, ২৬-৯২২০ এবং ২৬-৮৯৫৪।

———

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত টাকা**।

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার **স্বতন্ত্র**। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যারা এককালীন একশত টাকা দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

পৌষ ১৩৯০

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

শ্রীশ্রীশিবগীতা

দ্বিতীয়োঽধ্যায়

বৈরাগ্যোপদেশঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অগস্ত্য উবাচ

যা প্রাণাদধিকা সৈব হন্ত তে স্যাদ্‌ঘৃণাস্পদম্‌।
জায়ন্তে যদি ভূতেভ্যো দেহিনঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ ॥ ১৭

আত্মা যদাকলত্রেষু পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
কা কান্তা তত্র কঃ কান্ত সর্ব্ব এব সহোদরাঃ ॥ ১৮

নির্ম্মিতায়াং গৃহাবল্যাং তদবচ্ছিন্নতাং গতম্‌।
নভস্তস্যাং তু দগ্ধায়াং ন কাঞ্চিৎ ক্ষতিমৃচ্ছতি ॥ ১৯

তদ্বদাত্মাপি দেহেষু পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
হন্যমানেষু তেষ্বেব স স্বয়ং নৈব হন্যতে ॥ ২০

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
তা বুভৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ২১

তস্মান্ন পাতিদুঃখেন কিং খেদস্তস্তি কারণম্।
স্ব স্বরূপং বিদিত্বেদং দুঃখং ত্যক্ত্বা সুখী ভব॥ ২২

অনুবাদ ঃ—

যাকে প্রাণাধিকা বলে মনে হয়, মৃত্যুর পর, সেই রমণীদেহও ঘৃণাস্পদে পরিণত হয়; কারণ, দেহীর পাঞ্চভৌতিক-দেহ-সকল পঞ্চভূত থেকেই উৎপন্ন হয়। ১৭॥ যখন একমাত্র পরিপূর্ণ সনাতন আত্মাই সকলের দেহে বিরাজমান, তখন কে কার পত্নী, কেই বা কার পতি—সকলেই সহোদরস্বরূপ। ১৮॥ নির্মিত গৃহসকল ভস্মীভূত হয়ে বিনষ্ট হলে যেমন অবচ্ছিন্ন আকাশের (শূন্যের) কোন ক্ষতি হয় না, তেমনি দেহীর দেহসকল বিনষ্ট হলেও পরিপূর্ণ সনাতন আত্মার কোনরূপ অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই, কারণ আত্মা স্বয়ং অবিনাশী। ১৯—২০॥ হত্যাকারী হত্যা করছে এবং আহত-ব্যক্তি নিহত হচ্ছে বলে মনে হয়; কিন্তু উভয়ের আত্মা হত্যা করা বা নিহত হবার বিষয় অবগত হন না। ২১॥ হে রাজা। অস্তিত্ব নেই এমন কারণ থেকে জাত দুঃখ দ্বারা কাতর হয়ে বিলাপ করছেন কেন? আত্ম-স্বরূপ জ্ঞাত হয়ে এই দুঃখ পরিত্যাগ পূর্বক সুখী হোন। ২২॥

[ক্রমশঃ

অনুবাদক—স্থ. নাথ

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-সমাজে পুরোহিত-সমস্যা দেখা দিয়েছে। লক্ষ্মীপূজা ও সরস্বতীপূজার সময় সেই সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। তখন পুরোহিতেরা সকলেই অনেকগুলো করে পুজো করতে বাধ্য হন। তাই তাঁবা কেউই এক-একটি পূজায় বেশী সময় দিতে পারেন না। ফলে কোন পূজাই নিখুঁতভাবে হয় না। অনেক সময় আবার, পুরোহিত যখন আসেন তখন পূজার তিথি পেরিয়ে যায়। উদ্যোক্তরা নিরুপায় হয়ে পবের তিথিতেই পূজা করিয়ে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা কবেন।

রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের অভাব আরো বেশী। ফলে অনেক রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-পরিবাবকে অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পুবোহিত, নানা কারণে, রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের পূজা ঠিক মতো করতে পারেন না। তাই যে সমস্ত রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-পরিবার অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পুরোহিত দ্বারা পূজা করান তাঁদের সেই পূজা না করারই সামিল হয়।

পুরোহিত-সমস্যা সমাধানের জন্য 'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী' কলকাতার ফিয়ার্স লেনের কালীমন্দিরে পৌবোহিত্য-শিক্ষাদানের সীমিত-ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সেই সীমিত-ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাজাবে যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় সেগুলো পড়ে পূজা-পদ্ধতি আয়ত্ব করা কঠিন। দীর্ঘ অনুশীলন ছাড়া, ঐসব গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে পূজা করতে গেলে ভুল হবেই। তাই এমন গ্রন্থ প্রয়োজন যার সাহায্যে খুব সহজে নিখুঁত-পূজা করা যায়

'শৈব প্রকাশনী' এ ব্যাপারে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। ঐ প্রকাশনী সরস্বতীপূজার ওপর এমন একটা গ্রন্থ প্রকাশ করতে চলেছেন যেটা অভিনব পদ্ধতিতে লেখা। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সকলেরই উপকারে লাগবে। এই গ্রন্থের সাহায্যে পৌরোহিত্য-শিক্ষায় আগ্রহী উপনীত-ব্রাহ্মণ মাত্রেই পারবেন সরস্বতী-পূজা-পদ্ধতি সহজে আয়ত্ব করতে; পুরোহিতের অভাব ঘটলে, এই গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে উপনীত-ব্রাহ্মণরা নিজেরাই পারবেন তাঁদের বাড়ীর সরস্বতী-পূজা সহজ অথচ নিখুঁভাবে করতে; এমন কি, পুরোহিতের অভাবে, মেয়েরা এবং অব্রাহ্মণরাও পারবেন এই গ্রন্থের সাহায্যে ঘট স্থাপন করে ঘটে তাঁদের বাড়ীর সরস্বতীপূজা নিখুঁতভাবে করতে।

'শৈব প্রকাশনী'র ঐ প্রকাশনা, সরস্বতীপূজায়, পুরোহিত-সমস্যা-সমাধানে সাহায্য করবে, সন্দেহ নেই। তাই লক্ষ্মীপূজার ওপরও ঐ ধরণের একটা গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য ঐ প্রকাশনীর প্রতি আবেদন জানাই।

মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য্য

জন্ম

১২৯৩ বঙ্গাব্দ

মৃত্যু

১৩৯০ বঙ্গাব্দ

মহাপ্রয়াণে মহামতি মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রীফণীন্দ্রনাথ নাথ

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সংবাদ পাইলাম যে বিশিষ্ট সমাজসেবী মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য্য আর ইহ জগতে নাই। গত ৩১শে শ্রাবণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ বুধবার (ইং ১৭ই আগষ্ট ১৯৮৩) তিনি মরদেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৭ বৎসর।

তিনি হাওড়া জেলার মাকড়দহের নিকটবর্তী ধাড়সা গ্রামে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে দরিদ্র যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম সময় ছিল বেলা ১০টা শুক্রবার বৈশাখের পূর্ণিমা তিথি। তিনি পিতামাতার তৃতীয় সন্তান ছিলেন। পিতা ৺শ্রীকান্ত দেবনাথ ভট্টাচার্য্য বংশ পরম্পরায় পুরোহিত ছিলেন।

তাঁহার ছয় বৎসর বয়সকালে পিতা দেহরক্ষা করায় তাঁহার পাঠশালার শিক্ষায় ছেদ পড়িল। অল্পদিনের মধ্যে দেনার দায়ে বসত বাড়ি নিলাম হইয়া গেল। আত্মীয় সুবাদে বেতড় গ্রামে (চ্যাটার্জি হাট) আসিয়া তিনি আশ্রয় লইলেন। বিধবা মাতা, ভাই বোন সহ আরোও কয়েক বৎসর অতিকষ্টে কাটিল। দুই বেলা আহার জোটে না। পুরোহিতের পেশা গ্রহণ করিতে হইলে উপনয়ন সংস্কারসহ কিছু সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান থাকা দরকার। এইজন্য প্রতিবেশী সকলের সাহায্য লইয়া ১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন সংস্কার হইল এবং নিকটবর্তী সংস্কৃত টোলে ভর্তি হইলেন। ইহার পর তিনি

সুযোগ মত পুরোহিতের কার্য্য করিয়া কিছু কিছু রোজগার করিতে লাগিলেন। রাঢ়ী শ্রেণীর এক সহৃদয় ব্রাহ্মণ তাঁহার টোলে ভর্তি ও পুরোহিতের পেশার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ইহাই হইয়াছিল তাঁহার উন্নতির সোপান।

এই সময়ে ভগবানকে পাইবার জন্য প্রবল বৈরাগ্যভাব তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। একদিন তিনি ও স্থানীয় যুবক পঞ্চানন নাথ দুই বন্ধুতে শিবপুর গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া গঙ্গাজল হাতে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন এবং ভগবানকে পাইবার জন্য নির্জনে তপস্যা করিবেন। মা ৺গঙ্গাকেও আন্তরিক প্রার্থনা জানাইলেন। সেইদিনই তাঁহার বড়দিদির উপর দেবতার ভর হইল। দেবতা তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি 'ধর্ম নিরঞ্জন নারায়ণ' বলিতেছেন, তোমাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে না; তোমাকে রাজা করিয়া দিব। মুক্তারাম প্রার্থনা জানাইলেন যে তিনি রাজা হইতে চাহেন না, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতেজ লাভ করিতে চাহেন। তিনি ভগবান নারায়ণের নির্দেশে সেইদিন রাত্রিকালে নিকটবর্তী পুকুর ঘাটের বেলগাছের তলায় শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা লইয়া আসিয়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঐ শিলা তিনি নিত্য স্বযত্নে পূজা করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে নারায়ণের কৃপায় তিনি জ্ঞান ও তেজে নূতন মানুষে পরিণত হইলেন, শাস্ত্রীয় জ্ঞান-সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর পুরোহিত বলিয়া সমাজে গণ্য হইলেন। তিনি হস্তরেখা ও ঠিকুজী কোষ্ঠী বিচার এবং ভাগ্য গণনায় পারদর্শী হইলেন। বিষয় সম্পত্তিতে বিত্তবান হইলেন।

তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপ উল্লেখ করিতে হইলে এই নিবন্ধ একটি পুস্তকের আকার ধারণ করিবে। সেইজন্য সংক্ষেপে অল্প কিছু উল্লেখ করিতেছি। তৎকালীন হিন্দু-সমাজে স্বজাতির হীন অবস্থা দেখিয়া

তাঁহার মন-প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি নিজ সমাজের সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। বিভিন্ন টোল বা চতুষ্পাঠী হইতে অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ৫/৬ টি ভাসপত্র সংগ্রহ করিলেন। তাহা লইয়া বিভিন্নস্থানে সভাসমিতি করিয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অন্য সমাজের বিরুদ্ধবাদীগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে, নাথ-সম্প্রদায়ের বিন্দু-বংশের* গৃহস্থগণ দেববংশজাত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা রুদ্রজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। উপনয়ন সংস্কার আন্দোলনকে আরোও ব্যাপক করিলেন। 'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে স্থায়ীরূপ দান করিলেন। ইহাই তাঁহার সমাজ-সংস্কারক জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান; ইহার জন্য তিনি রুদ্রজ ব্রাহ্মণ জাতির হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত 'হাওড়া পণ্ডিত সমাজ' তাঁহার তেজোময় জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঐ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সদস্যপদে গ্রহণ করেন এবং পরে সহ-সভাপতি পদেও বরণ করেন। পরাধীন ভারতে ইংরাজ রাজ-কর্মচারীগণ তাঁহাকে 'Fortune Teller' বলিয়া সমাদর করিতেন। তিনি বাঙ্গালার নাথদের তপশীলজাতিভুক্তি ছোট লাট সাহেবের সাহায্যে রদ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় দমদমার ঘাটগাছি অঞ্চলের প্রধান রাস্তাটি বিখ্যাত কালীসাধক শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের নামে নগেন্দ্রনাথ রোড নামে পরিচিত। তিনি ১৯৬২ সালে রাজভবনে গিয়া প্রতিরক্ষা তহবিলে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর পক্ষে নিজ উপার্জিত ১০১ টাকা

* নাথ-সম্প্রদায়ের দুইটি বংশ—(১) বিন্দু-বংশ ও (২) নাদ-বংশ। বিন্দু-বংশ পিতা-পুত্র-ক্রমে এবং নাদ-বংশ গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় প্রসারিত হইয়াছিল। বিন্দু-বংশের গৃহস্থগণ যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ বলিয়া এবং নাদ-বংশের সন্ন্যাসিগণ যোগী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

—সম্পাদক

দান করেন। ঐ দানপর্ব অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, বিশিষ্ট গণ্যমান্য লোক ও সাংবাদিকগণের সমাবেশে তিনি তাঁহার একটি স্বরচিত দেশাত্মবোধক গান যুবজনোচিত কণ্ঠে পরিবেশন করেন। সমবেত সকলে এই তেজস্বী বৃদ্ধের উচ্চ প্রশংসা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সহিত তাঁহার আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

একবার তিনি ৺তারকেশ্বর তীর্থে গিয়াছিলেন। দেখিলেন একটি বৃদ্ধা হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে ঐ তীর্থের একজন পাণ্ডা বহু কষ্টে আনিত গঙ্গাজলকে যুগীর** জল কুকুরের প্রস্রাব বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহন্ত গিরি মহারাজের নিকট ঐ বৃদ্ধাকে লইয়া গিয়া পাণ্ডার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিলেন। মহন্ত মহারাজ সব শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাণ্ডাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন—তুমি মূর্খের ন্যায় কাজ করিয়াছ। 'যুগী', 'যোগী'-এর অপভ্রংশ। তুমি যাঁহার সেবক সেই বাবা তারকনাথও যোগী। মহাযোগী তারকনাথের জন্য যোগীর আনা পবিত্র জলকে কুকুরের প্রস্রাব বলিয়া ফেলিয়া দিয়া তুমি মহাপাপ করিয়াছ। এই বলিয়া তিনি সেই পাণ্ডাকে তীর্থস্থান হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন। একবার দৈনিক বসুমতি পত্রিকার

** নাথ-সম্প্রদায়ের বিন্দু-বংশের যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণগণ, মধ্যযুগে, বিদ্যা-বংশের সহিত একই 'যোগী' আখ্যায় আখ্যায়িত হইতেছিলেন। রাজা বল্লাল সেনের সময় রাজ-রোষে পতিত হইয়া বিন্দু-বংশের রুদ্রজ-ব্রাহ্মণগণের সামাজিক মর্যাদা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। সেই সময় হইতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচারের বন্যা বহিয়া যায়। ফলে অন্যরা তাঁহাদের তাচ্ছিল্য করিয়া 'যুগী' বলিতে থাকেন।

—সম্পাদক

সাহিত্যপত্রে নাথ সম্প্রদায় সম্পর্কে ভুলতথ্য প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি স্বশিষ্য ছুটিয়া গিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ; ফলে পরবর্তী সংখ্যায় সঠিক তথ্য ছাপা হইয়াছিল।

মুক্তারাম দেবনাথ ভট্টাচার্য্য লেনে অবস্থিত তাঁহার বাড়ী শীতলা-বাড়ী নামে বিখ্যাত। প্রতি শনি-মঙ্গলবারে সেইখানে প্রচুর যাত্রীর সমাগম হয়। তাঁহার স্ত্রীর উপর ৺মা শীতলার ভর হয়। তিনি প্রতি বৎসর সমারোহের সহিত বাড়ীতে কালীপূজা ও দুর্গাপূজা করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতে বহুবার হাওড়া পণ্ডিত সমাজের সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

তিনি জীবনে কাহারো নিকট মাথা নত করেন নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবে বহুলোক বহুভাবে উপকৃত হইয়াছে। জটিল মামলা মকদ্দমায় অনেকে তাঁহার সাহায্য লইয়া জয়ী হইয়াছে। তাঁহার মন্ত্রপুত তেলপড়া জলপড়ার গুণে অনেককে নিরাময় হইতে শুনিয়াছি। পাত্র-পাত্রীর যোটক বিচারে ও ভাগ্য গণনার জন্য বহুলোক তাঁহার নিকট আসিত।

তাঁহার পুণ্যময় আত্মার প্রতি প্রণাম জানাই।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

রাজকীয় ও স্বাধীনতোত্তর ত্রিপুরা রাজ্যে শৈবনাথতন্ত্রের উপাদান

ডক্টর এন. সি. নাথ

অধ্যক্ষ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ত্রিপুরা সুন্দরী

ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর সহরের অদূরে বিখ্যাত শাক্তপীঠ "মারবাড়ী" বা "মাতাবাড়ী"। ইহা একান্ন মহাপীঠের অন্যতম। এইস্থানে সতীর দক্ষিণ পদ পতিত হয়। যথা পীঠমালা তন্ত্রে—

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী।

—ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ পদ; দেবীর নাম ত্রিপুরা সুন্দরী। এই মন্দিরে অধিষ্ঠিতা দেবী আদিনাথ-ঘরণী জগজ্জননী ত্রিপুরা সুন্দরী নামে খ্যাত। অগণিত ছাগরক্তে মন্দির প্রাঙ্গণ এবং দেবীর চরণতল সদাই লোহিত বরণ—

একে ত নিলাজ কায়
রুধির লেগেছে গায়
কালিন্দী সলিলে যেমন
জবা ভাসিছে।

এই লোহিত-স্রোতও প্রবাহিত হয় দেওড়াই যোগীদের খড়্গাঘাতে। প্রাচীনকালেই নাথগণ* শিব বা নির্গুণ ব্রহ্ম[১] উপাসনা ব্যতীত শক্তি বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায়ও প্রবৃত্ত হন। শেষোক্ত নাথগণকে কেহ

১। শিব নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তাঁহার নির্গুণত্ব বা অনির্বচনীয়ত্বের দ্যোতক গৃহহীনতা, ধনহীনতা, বস্ত্রহীনতা প্রভৃতি। তুলনীয়—কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন। সগুণত্ব তাঁহার রূপ কল্পনায়। নির্গুণ নিরাকার।

কেহ তান্ত্রিক বা কাপালিক যোগী আখ্যা দিয়াছেন।[২] কথিত আছে মৎস্যেন্দ্রনাথই এই শক্তি সাধনার প্রথম প্রবর্তক এবং কামাখ্যার শাক্তপীঠ তাঁহারই অক্ষয় কীর্তি।[৩] তান্ত্রিক-নাথদের শক্তি সাধনার ফলেই সম্ভবতঃ হঠযোগেও শক্তিব সূক্ষ্মরূপ কল্পিত হয়। তাহা হইল কুলকুণ্ডলিনী বা শুধু কুণ্ডলিনী—

দেখ জীব মুদিয়ে নয়ন
সুষুম্নার মুখে পদ্ম লোহিত বরণ
সাড়ে তিন প্রদক্ষিণে
কুণ্ডলিনী সেই স্থানে ......

মেরুমূলে সুষুম্নানাড়ীমুখে গুহ্য ও মেঢ্র মধ্যভাগে (অর্থাৎ যোনি মণ্ডলে) মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী সার্ধ কুণ্ডলীত্রয় রচনা করতঃ শায়িতা এরূপ কল্পনা করা হয়। সাধকের যোগশক্তিতে উত্থিতা হইয়া ইনি উপর্য্যুপরি স্থাপিত স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর প্রভৃতি পদ্মসমূহ ভেদ করতঃ সহস্রার পদ্মে পরব্রহ্মস্বরূপ শিবেব সহিত সম্মিলিত হন। ইহাই দেবীর পদ্মবনে[৪] বিহার—

মা আমার এলোকেশী দিগ্‌বসনা
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে মন জান না
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দ রসে মগনা।[৫]

প্রাচীন সাধক কবির সংস্কৃতেও দেখি এই মহাশক্তি—

যোগিনাং হৃদয়াম্বুজে নৃত্যন্তী নৃত্যম্ অঞ্জসা।
আধারে সর্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুতাকৃতিঃ॥

২। গোর্খ বিজয় গ্রন্থে সুকুমার সেনের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ কৃত তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন দ্রষ্টব্য।

৪। পদ্মবন—মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সাতটী পদ্ম বা চক্র।

৫। রামপ্রসাদের গান। শাক্ত পদাবলী দ্রষ্টব্য।

—যোগিগণের (যোগমার্গী সাধকগণের হৃদয় পদ্মে বিচিত্ররূপ নৃত্য করিতেছেন ; সর্বভূতের অন্তঃস্থিত মূলাধার পদ্মে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় স্ফুরিত হইতেছেন।

এই কুণ্ডলিনীই যোগ ও তন্ত্রের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। উভয় মার্গে নাথগণের বিহরণেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

শাক্তপীঠে যোগী যাজ্ঞিকের অবস্থান তাই প্রশ্নাতীত। নাথগণ বৈষ্ণবীয় ভক্তিমার্গেও প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। উদাহরণ গৈনীনাথ, নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বর নাথ এবং আধুনিক কালে আচার্য্য রাধাগোবিন্দ নাথ। সে প্রসঙ্গ এখানে নয়।

ত্রিপুরার যোগী যাজক চণ্ডাই ও দেওড়াই গণের নাথত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইল তাহার ইতিরেখা এখানেই টানা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক। এই যোগীরা নিজেরা মুখ খোলেন না। হয়তঃ তাঁহারাও আত্মবিস্মৃত। ভোলানাথের গণ কিনা আপাততঃ পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকা যাউক। (ক্রমশঃ)

---

* নাথগণের দুইটি বংশ—(১) বিন্দু-বংশ ও (২) নাদ-বংশ। বিন্দু-বংশ পিতা-পুত্র ক্রমে এবং নাদ-বংশ গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় প্রসারিত হইয়াছিল। বিন্দু-বংশের নাথগণ গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহারা পরিচিত ছিলেন যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ নামে; আর নাদ-বংশের নাথগণ ছিলেন সন্ন্যাসী ; যোগী নামে তাঁহারা বিখ্যাত ছিলেন। শৈব-যোগ ও শাক্ত-তন্ত্র এই দ্বিবিধ সাধনার প্রবর্তন ও প্রসারে গৃহস্থ যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী যোগী উভয়েরই বিরাট অবদান রহিয়াছে। —সম্পাদক

ধর্ম বনাম বিজ্ঞান

সুবোধকুমার নাথ, এম. এ বি. টি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বলা হয়েছে, বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সংশয় বা অবিশ্বাস, বিজ্ঞান যুক্তিনির্ভর ; আর ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, সে যুক্তির ধার ধারে না। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কি তাই ? এ প্রসঙ্গে দিলীপ কুমার রায়কে লেখা একটি চিঠিতে প্রিয়দারঞ্জন রায় সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"বিজ্ঞানকে অবিশ্বাসী বলা চলে না। কেননা ধর্মের মত বিজ্ঞানের গোড়ায়ও একটা বড় রকমের বিশ্বাস আছে যার অভাব হলে বিজ্ঞান হবে অচল। সে হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এক শাশ্বত ও সনাতন নিয়মে বিশ্বাস—যাতে সম্ভব হয়েছে বিশ্বের স্থিতি এবং গতি। এই সনাতন নিয়মের অন্তরালে ও এর আশ্রয়রূপে যে এক বিশ্বব্যাপী চেতনাশক্তি (বা যাকে বিশ্বাত্মা বলা যেতে পারে)—এরূপ কিছু রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান ইহা অস্বীকার করে না। একে ব্রহ্ম, ভগবান বা ঈশ্বর যে কোন নামে উল্লেখ করা যায়। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের বিশেষ অমিল নেই বলা চলে। একের প্রথম ধারণা হচ্ছে অপরের সিদ্ধান্ত—পরীক্ষা-প্রমাণের বিচারফলে।

আপনি নিজেকে অন্ধবিশ্বাসী ধর্মপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানী বা বুদ্ধিবাদীদের উপর কটাক্ষ করেই এরূপ লিখেছেন। আপনি অন্ধবিশ্বাসী হলেন কেমন করে ? কারণ যে মূল ধারণার উপর ধর্মের ভিত্তি তাকে অন্ধবিশ্বাস কেউ বলতে পারে না। যুগযুগান্ত ধরে তার কল্পনা ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগফলে মানুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্

ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে আসছে। একেই কেন্দ্র করে মানুষের ধর্মশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতের উপনিষদ ও দর্শন এর সাক্ষী। একে কেউ অন্ধবিশ্বাস বলতে পারে না— এমন কি যাঁরা নাস্তিক বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে স্বীকার করেন না, তাঁরাও না। অনেকে হয়তো সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নাও হতে পারেন। ধর্মকে যখন আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে নিমজ্জিত করে গোঁড়ামির সৃষ্টি করা হয়, কিংবা আচার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যে তাকে বিভিন্ন করে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের বা দলাদলির সৃষ্টি হয়, অথবা তার প্রচারের জন্য উন্মত্তভাবে অমানুষিক অত্যাচারের অভিনয় ঘটে—তখনই আসে অন্ধবিশ্বাসের কথা। কারণ তখন মানুষের ঘটে বুদ্ধিভ্রংশ। আসলে বিশ্বাস বুদ্ধিবিযুক্ত হতে পারে না। বুদ্ধি বলতে আমি বিশুদ্ধবুদ্ধিকেই মনে করি—দুষ্টুবুদ্ধি বা পাপবুদ্ধি নয়। এই বিশুদ্ধবুদ্ধিকেই অনেকে বলেন ধর্মবুদ্ধি। পাটোয়ারীবুদ্ধি বা কূটবুদ্ধিও বিশুদ্ধবুদ্ধির অন্তর্গত নয়। ইংরাজীতে যাকে reason বলা হয়, তাকেই বিশুদ্ধবুদ্ধি বলা চলে intellect কে নয়।"

ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের লড়াই-এ 'ধর্ম' এবং 'বিজ্ঞান'-কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা আলাদা জিনিসরূপে ধরা হয়েছে বলেই মনে হয়; মনে হয় এই দুটি শব্দেরই সঙ্কীর্ণ-অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এবং তার ফলেই, সম্ভবত, এই বিরোধটা দানা বেঁধে উঠতে পেরেছে। এরই ইঙ্গিতে রয়েছে দিলীপকুমার রায়কে লেখা প্রিয়দারঞ্জন রায়ের একটি চিঠিতে। একস্থানে তিনি লিখেছেন—"কেন এই জন্মমৃত্যু কেন এত দুঃখকষ্ট, এনিয়ে কালে কালে অনেক মহাপুরুষ চিন্তা করে গেছেন—যার ফলে গড়ে উঠেছে মানুষের ধর্ম দর্শন সাহিত্য এবং আপনি হয়ত মানবেন না—আমি বলব বিজ্ঞান। অর্থাৎ পরা এবং অপরাবিদ্যার চর্চা।"

'ধর্ম' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হচ্ছে ধৃ + ম ; অর্থ,—যা ধারণ করে আছে। বস্তুকে যা ধারণ করে আছে তা বস্তুধর্ম, জীবনকে যা ধারণ করে আছে তা জীবনধর্ম, মানবকে যা ধারণ করে আছে তা মানবধর্ম, মনকে যা ধারণ করে আছে তা মনোধর্ম ইত্যাদি।

বস্তু জড় অর্থাৎ চেতনাশক্তিহীন। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কোন না কোনটি দ্বারা এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এটা কিছু জায়গা অধিকার করে থাকে। এর ওজন আছে। সুতরাং এখানে বলা যেতে পারে জড়ত্ব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, জায়গা দখল করে থাকা, ওজন থাকা—এগুলো বস্তুকে ধারণ করে আছে ; তাই এগুলো হচ্ছে বস্তুর ধর্ম।

আবার জীবন চেতনাশক্তিসম্পন্ন ; জীবনের আছে জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু। এই চেতনাশক্তি, জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু—এগুলো জীবনকে ধারণ করে আছে বলেই জীবনের ধর্ম।

এইভাবে দেখা যাবে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই হোক আর ইন্দ্রিয়াতীতই হোক (ইন্দ্রিয়াতীত হচ্ছে শক্তি, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, সুখদুঃখ ইত্যাদি) প্রত্যেক জিনিসেরই পরিচয় তার ধর্ম দ্বারা।

পক্ষান্তরে, 'বিজ্ঞান' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হচ্ছে, বি-জ্ঞা+অনট্। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, বিশেষ জ্ঞান। বস্তু তথা বস্তুর ধর্ম সম্পর্কে যে বিশেষ জ্ঞান তাই বস্তু বিজ্ঞান, জীবন তথা জীবনের ধর্ম সম্পর্কে যে বিশেষ জ্ঞান তাই জীবন-বিজ্ঞান, মন তথা মনের ধর্ম সম্পর্কে যে বিশেষ জ্ঞান তাই মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।　　[ক্রমশঃ]

এলোকেশে এলো
কে সে ?
যুগে যুগে কবির প্রেরণা সুন্দর চুল সেই চুলের যত্ন
নিতে জ্যাবোরাণ্ডি কেশ তৈল একান্ত
প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর সর্বত্র চুলের চিকিৎসায়
আদিকাল হতে ব্যবহার হয়ে আসছে "জ্যাবোরাণ্ডি"
—কোটি কোটি মানুষ উপকৃত
জ্যাবোরাণ্ডি
কেশ তৈল
পরীক্ষায় প্রমাণিত ব্রাজিলের জ্যাবোরাণ্ডি
ও কিছু ভারতীয় ভেষজের সংমিশ্রণে তৈরী
জ্যাবোরাণ্ডি কেশ তৈল যা—
চুল ওঠা বন্ধ করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।
মাথা ঠাণ্ডা রাখে সুনিদ্রা আনে।
অকাল পক্কতা রোধ করে।
ডাঃ এস, ডি, দেবনাথ
হোমিও ল্যাবোরেটরী
সমস্ত এ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি ও
স্টেশনারী দোকানে খোঁজ করুন
Jaborandi
HAIR OIL

শক্তিসাধনা বা মাতৃপূজা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কর্মশক্তিহীন বার্দ্ধক্যে মানুষের মনে স্বভাবতঃই নানারকম অশান্তি ও কষ্ট দেখা দেয়। সমগ্র গত জীবন পর্যালোচনা ক'রে অনেকে লক্ষ্য করেন যে মানসিক স্থৈর্য্য এবং শান্তিলাভ হয় এমন কোন কাজ তাঁরা করেন নি। নিঃস্বার্থ সেবার কার্য্যে এবং ঈশ্বর চিন্তায় চিত্তের ঔদার্য্য ও প্রসন্নতা জন্মে; কিন্তু কর্মজীবনে তাঁদের সেদিকে দৃষ্টিদেবার অবকাশ হয় নি। বিষয়াসক্তিবশতঃ তাঁরা সম্পূর্ণরূপে আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন। এরূপ অবস্থায় যাঁরা অবশিষ্ট জীবনে শান্তি লাভ করতে চান এবং আত্মার কল্যান কামনা করেন, তারা সাধ্যানুসারে সাধুসন্তের জীবনী আলোচনা ধর্মশাস্ত্র ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নামকীর্তন প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং কোন না কোন সেবামূলক কর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে প্রয়াস পান। পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকলে এবং অন্তরে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগলে কেউ বা সদ্‌গুরু লাভ করে থাকেন। তবে এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের দেশে সাধুদের আশ্রমের অভাব নেই এবং কোন কোন আশ্রমে প্রকৃত জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী সাধক আছেন। শান্তিলাভের আশায় অনেকে কোন আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সেখানকার সাধুসন্তের উপদেশ ও নির্দ্দেশ মেনে চলেন।

বৃদ্ধ বয়সে অধ্যাত্ম সাধনার পথে অগ্রসর হবার কিছু-অসুবিধা আছে। মানুষ তার বাল্য ও যৌবনের অনেক বৎসর কঠোর

পরিশ্রম দ্বারা নানা বিদ্যা অর্জন ক'রে জীবনপথে অগ্রসর হয় এবং তার সমস্ত কর্মশক্তি জীবিকা অর্জনে নিয়োগ করে। কিন্তু স্কুল কলেজে শেখা এই বিদ্যার সঙ্গে অধ্যাত্ম বিদ্যার কোন সংস্পর্শ নেই। অধ্যাত্ম বিদ্যার বিষয় আরও কঠিন এবং সূক্ষ্ম। বাল্য ও যৌবনের সুদীর্ঘদিনের সাধনা দ্বারা ইহা আয়ত্ত করতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম অধ্যাত্মসাধনাব মূল ভিত্তি। এটা রীতিমত অভ্যাস ও চেষ্টা দ্বারা লাভ হয়। এর ফলে অটুট স্বাস্থ্য, মানসিক স্থৈর্য্য ও একাগ্রতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা জন্মে। আমাদের দেশে পুরাকালে এটা প্রাথমিক শিক্ষাকাল থেকেই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মানুষ সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েই সংসার-জীবনে প্রবেশ করত। সে ঐহিক সুখলাভের চেষ্টায় রত থাকলেও আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত না।

বর্তমান যুগে আত্মজ্ঞান লাভের কোন চেষ্টা তথা সাধনা মানুষ করতে চায় না। জড়বিজ্ঞানের প্রভাবে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মানুষ জীবনকে সহনীয় ক'রে তুলতে শুধু অর্থসম্পদ ও ক্ষমতা-লাভকেই একমাত্র পথ বলে মনে করে। এইভাবে বড়লোক হতে সে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হতেও কুণ্ঠাবোধ করেনা। সে ভুলে যায় যে, পার্থিব ঐশ্বর্য্য জীবনে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ এনে দিতে পারে না। সে ভুলে যায়—মানব জীবনের মহত্তর বিকাশের জন্য আত্মজ্ঞানের আলো একান্তই প্রয়োজন। সে ভুলে যায় যে, সব মানুষে বা জীবে বা বস্তুতে, অণু পরমাণুতে সর্বত্রই পরম চৈতন্য সত্তা চির বিরাজমান। বিশাল বিশ্বের অজস্র সহস্র বৈচিত্রের মূলে এক বিরাট ঐক্য বর্তমান। মানুষ স্বীয় অনলস সাধনার দ্বারা জীবনের গভীরে এই ঐক্য অনুভব করতে পারে। এর উপলব্ধি হলে অন্তর থেকে সকল ভেদ বুদ্ধি, বিদ্বেষ, দুঃখ, অশান্তি দূর হয়ে যায়। সর্বজীবে সমদর্শন ঘটে এবং জীবন চরম সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়।

একনিষ্ঠ সাধনায় চিত্ত নির্মল ও অন্তর্মুখ হয়ে একাগ্র হয় এবং ধ্যান চেতনায় চরমসত্য ও পরম চৈতন্য সত্তার উপলব্ধি ঘটে। এই সাধনার জন্য সংসার ত্যাগের প্রয়োজন হয় না। জীবনে ব্যক্তি বিশেষ যে স্তরেই প্রতিষ্ঠিত হন না কেন, যিনি যে কর্তব্য বেছে নিয়েছেন, তার পক্ষে সেই কর্তব্যকর্মই নিরলস নিষ্কামভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠান করাই তার জীবনের মহত্তম সাধনা। জগৎ কৃ-ধাতুর অনন্তরূপ, বস্তুতঃ কর্মই জীবন। কর্মযোগেই পূর্ণতাপ্রাপ্তি। সংযত দৃঢ়ব্রত নিঃসার্থ কর্মীই প্রকৃত সাধক। তার উপরে পরম কল্যাণময় মহেশ্বরের কৃপা বর্ষিত হয়ে থাকে। কোন সুদূর অতীতে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে গুণত্রয়ের বৈষম্যহেতু অব্যক্তমূলা প্রকৃতির বক্ষে স্পন্দন জেগেছিল এবং ঘটেছিল জগন্মাতা মহামায়া আদ্যাশক্তির স্ফুরণ বা বিকাশ। সেই মহাশক্তি অনন্তরূপ নিয়ে জীব ও জগৎরূপে প্রকটিতা —বহুনামে প্রকাশিতা। এই শক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ, সমস্ত জ্ঞান ও জীবনীশক্তির মূল এবং সর্বভূতে সতত পরিব্যাপ্ত। সকল রূপ ও নামের অন্তরালে এই মহাশক্তি বিরাজমানা এবং ক্রিয়াশীলা। আমরা বিশ্ববাসী নরনারী, এমন কি চেতন অচেতন নির্বিশেষে সকলেই সেই মহাশক্তির—মা মহামায়ার সন্তান এবং পরস্পর ভাই-বোন। পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সমভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেই অন্তরে প্রেমের উন্মেষ হবে এবং চিত্তের নির্মলতা ও একাগ্রতার ফলে জগতের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির উপলব্ধি ঘটবে। এই মহাশক্তিকে জানবার চেষ্টাই প্রকৃত শক্তিসাধনা বা মাতৃপূজা।

ত্রিপুরার 'দৈনিক সংবাদ'-এ প্রকাশিত একটি পত্রের* বক্তব্য

গত ১০ই নভেম্বর "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার "লেনিনগ্রাদের যুদ্ধ কিম্বা কুরুক্ষেত্রের রণ" শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদের পঞ্চম অনুচ্ছেদের শুরুতে লেখা হয়েছে—"শাসকদল জয়ের লক্ষ্যে দেবনাথ তথা তন্তুবায় প্রধান চড়িলামবাসীর পক্ষে যে প্রার্থীকে দিয়েছেন তিনি মূলতঃ চড়িলামে প্রবাসী।" এখানে আমার বক্তব্য হলো বস্ত্রবয়ন একটি শিল্প। বর্তমান যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এ শিল্পের সাথে যুক্ত। বর্তমান অর্থ নৈতিক সংকটের যুগে জীবিকা অর্জনের জন্য এ সম্প্রদায়েরও কিছু সংখ্যক লোক হয়ত এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাই বলে সমগ্র নাথ সম্প্রদায়কে তন্তুবায় হিসেবে আখ্যায়িত করাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখতে অনুরোধ রাখছি। কারণ আমাদের শাস্ত্রে তন্তুবায হিসেবে একটি পৃথক সম্প্রদায়েব অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাদের জন্মবৃত্তান্তও পৃথক।

যথা "মনিবন্ধাম্মনি কার্য্যাং তন্তুবায়োঽপি জজ্ঞিবান/বস্ত্রদত্বা মুনশ্রেষ্ঠ তন্তুবায়-ত্বমীয়িবান্॥" (পরশুরাম সংহিতা)/অর্থাৎ মনিবন্ধের ঔরষে মনিকার কন্যার উদরে তন্তুবায়ের জন্ম হয়। এ পুত্র মুনিবরকে বস্ত্রদান করে তন্তুবাযত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

নাথ সম্প্রদাযের প্রকৃত ইতিহাস সর্বজনগ্রাহ্য বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক প্রশংসিত গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করে সবসাধারণের ভ্রান্তি অপনোদনেব জন্য নিম্নে প্রদত্ত হল।

শাস্ত্র পাঠে দেখা যায় সৃষ্টির প্রথমে আমাদের সমাজে কোন বর্ণ বিভাগ ছিলনা। সবাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গুণ ও কর্মানুসারে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র—এ চার বর্ণের সৃষ্টি হয়। সেই বর্ণ বিভাগ অনুসারে নাথ সম্প্রদায়কে শাস্ত্রে 'বিপ্র' বর্ণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যথা "যেতু রুদ্রোদ্ভবা বিপ্রা স্তপসসংযম সংযূতাঃ/ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি সংযুক্তা স্তেতু নাথা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" যোগিনী তন্ত্র, তপস্বী, সংযমী, ব্রতপরায়ন যোগৈশ্বর্য্যে সিদ্ধ রুদ্রোৎপন্ন বিপ্রদের 'নাথ' বলা হয়।

আরো পরবর্তীকালে বৈদিক সাধনপন্থায় দুটো পৃথক ধারা গড়ে ওঠে—

(১) যাগ যজ্ঞপ্রধান 'ঋষি ধারা' এবং যোগ প্রধান 'মুনিধারা' যাঁরা যাগ যজ্ঞের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন তাঁরা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এবং যাঁরা যোগ সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন তাঁরা যোগী ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণরূপে আখ্যায়িত হতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে দুটো সাধন ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। তখন থেকে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরা শুধু ব্রাহ্মণ এবং যোগী ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণরা শুধু 'যোগী' আখ্যায় ভূষিত হতে থাকেন। বর্তমান পূজা পদ্ধতির মধ্যেও দেখা যায় যে ঋষিধারার যজ্ঞ 'হোমে' এবং মুনিধারার যোগ সাধনা 'ধ্যান প্রাণায়ামাদ্দিতে' পযর্বসিত হয়েছে।

বেদে যিনি 'রুদ্র' পুরাণে তিনিই শিব। তাই রুদ্র ও শিব অভিন্ন। নাথ সম্প্রদায় রুদ্রের কুষ্টিজাত সন্তান। এ জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে এ সম্প্রদায়কে 'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে।

গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট লিখিত এবং শশীভূষণ ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত "বল্লাল চরিতম্" গ্রন্থের উত্তর খণ্ডম্ অংশের ২১ নং শ্লোকে রাজা বল্লালের পিতৃশ্রাদ্ধে দানগ্রহণে অনিচ্ছুক নাথগুরুদের "রুদ্রজ ব্রাহ্মণ"-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

"পূর্বস্মাৎ স মহারাজা রুদ্রজান্ ব্রাহ্মণাম্ প্রতি/দানত্যাগাদীত রাগঃ সপিতৃশ্রাদ্ধ বাসরে॥"

বিগত ১৯৮২ সালে পশ্চিমবাংলার হাওড়ায় অনুষ্ঠিত 'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর' দ্বাত্রিংশ সাধারণ অধিবেশনে নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীমণিলাল বৈদ্য গোস্বামী বিশিষ্ট অতিথির ভাষণে এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটন করে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি প্রদান করেন।

"অনাদিনাথ দেবস্য নেত্রবহ্নি সমুদ্ভবঃ।
রুদ্রজ ব্রাহ্মণজ্ঞেয়ঃ শিবগোত্রাভি জায়তে॥
গোরক্ষনাথ নাম্নোতি পরং যোগীশ্চ কীর্তিমান।
স্বনাম পুরুষ ধন্য দেবনাথেতি কথ্যতে॥
তস্য বংশানুক্রমেন দেবনাথ।
জন্মনা রুদ্রজা জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈ দ্বিজোচ্যতে॥"

তদুপরি এ সম্প্রদায়ের 'নাথ' পদবীটিও প্রনিধানযোগ্য। 'নাথ' শব্দের সাধারণ অর্থ প্রভু বা স্বামী। কিন্তু 'নাথ' শব্দের ব্যাকরণ গত অর্থ করলে দাঁড়ায়—"ন-অথ বিদ্যতে যস্ত স নাথঃ।" অর্থাৎ যাঁর আর কোন অথ নেই অর্থাৎ জানার কিছু বাকী নেই—যি ন সর্বজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে গেছেন তিনিই নাথ। তদুপরি রুদ্রজঃব্রাহ্মণ বংশকে "নয়নাথ চৌরাশি সিদ্ধার বংশ" বলা হয। অর্থাৎ এ বংশে নয়জন নাথ এবং চৌরাশি জন সিদ্ধ পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া 'আগম সংহিতা', সাতাতপ সংহিতা। 'চন্দ্রাদিত্য পদ্মাগম' মহাবিরাট তন্ত্র এবং 'ভোজ প্রবন্ধম্' ইত্যাদি গ্রন্থেও এ সম্প্রদাযের ব্র হ্মণত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে। শ্রীহরিপদ দেবনাথ। জেনারেল সেক্রেটারী।

---

* পত্রটি ত্রিপুরার 'দৈনিক সংবাদ' ১৯ শে নভেম্বর ১৯৮৩, ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয। পত্র লেখক শ্রীহরিপদ দেবনাথের অনুরোধে ঐ পত্রের বক্তব্য 'শৈবভারতী'তে প্রকাশ করা হ'ল।

—সম্পাদক

পাত্র-পাত্রী

২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

২৫। পাত্র—(৩০) (৫'-৮"), সুস্বাস্থ্য সুন্দর চেহারা, বি-এস-সি (অনার্স) বি-এড, দিয়াছে, প্রাঃ শিক্ষক। নিজস্ব বাড়ী, সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা বনেদি ঘরের পাত্রী কাম্য। যোগাযোগের ঠিকানা—এম, সি, দেবনাথ (শিক্ষক), পোঃ পানুহাট, ভায়া কাটোয়া, জিলা বর্ধমান, পিন—৭১৩১৩০।

২৬। পাত্রা—(১৮) (৫'-২") স্কুলফাইনাল অনুত্তীর্ণ, :সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মে নিপুণা, সেলাই কাজ জানে সুউপায়ী পাত্র চাই নিম্ন ঠিকানায় পত্রদ্বারা যোগাযোগ করুন—শ্রীকান্তিলাল দেবনাথ, C/o কৃষ্ণা টেলার, ২৬/8 ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৬।

২৭। পাত্র—সুদর্শন সুস্বাস্থের অধিকারী, সেনাবাহিনীতে (ক্লার্ক) কর্মরত। ২০ বছরের অনূর্ধ্ব মাধ্যমিক পাশ সুন্দরী সদবংশীয়া পাত্র চাই। ফটোসহ যোগাযোগ করুন। শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেঃ নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

২৮। পাত্রী—(২০) ১০ম মান, সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা, প্রকৃত সুন্দরী, উজ্জলবর্ণা, সঙ্গীতজ্ঞা, গৃহকর্ম নিপুণা, উপার্জনশীল সুপাত্র চাই। পত্রদ্বারা যোগাযোগ করুন—জগবন্ধু নাথ। ১৪/২, কে-পি ঘোষাল রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬।

২৯। পাত্রী—(২১½) (৫') বি. এ. স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী, উজ্জলশ্যামবর্ণা, শান্তস্বভাবা, সেলাই ও গৃহকর্মে নিপুণা কুমিল্লার বনেদী পরিবার। উপযুক্ত, শিক্ষিত, উপার্জনশীল পাত্র চাই। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ দেবনাথ, প্রযত্নে শ্রীশ্রীদাম কুণ্ডু ৪, ইষ্টমল রোড, দমদম কলিকাতা-৭০০০৮০।

৩০। পাত্রী—(২১) (৫'-৪") বি. এস. সি. পাশ, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, সূচীশিল্প ও গৃহকর্ম নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। মাঘ ফাল্গুনেই বিবাহ। ঠিকানা—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, বাণীপুর, বাণীপুর বিবেকানন্দ রোড, পোঃ বাণীপুর, ডিঃ উঃ ২৪ পরগণা।

৩১। পাত্রী—(২৩) (১'৫৬ মি.) বি. এ. পাঠরতা, সুশ্রী, সুন্দরী সুগঠনা, সূচীশিল্প ও গৃহকর্মে নিপুণা, সুউপায়ী পাত্র চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন—শ্রীকিশোরী মোহন নাথ, ৮৬, ব্রজমণি দেব্যা রোড, কলিকাতা-৭০০০৬১।

৩২। পাত্রী—(২০) (৫'-৩") মাধ্যমিক পাঠরতা, স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী, গৌরবর্ণা, সূচীকর্মে ও গৃহকর্মে নিপুণা, পাত্রীর পিতা সরকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মী পাঁচভ্রাতা সুশিক্ষিত। দু'জন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী কলিকাতায় নিজস্ব বসতবাড়ী। সুউপায়ী পাত্র কাম্য (সরকারী চাকুরে হইলে উত্তম) নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ প্রার্থনীয়—রোহিনী চৌধুরী, করুণাময়ী ঘাট রোড, করুণাময়ী পার্ক, পোঃ হরিদেবপুর, কলি-৮২।

৩৩। পাত্রী—(২৪) (৫'৫') বি, এ, বি. এড, সুগঠনা, সূচীশিল্পে ও গৃহকর্মে নিপুণা। শিক্ষিত সুপুরুষ পাত্র (৩০-৩২ মধ্যে) চাই। প্রফেসার কিংবা অফিসার অগ্রগণ্য।

এবং

৩৪। পাত্রী—(১৯) (৫'৩') বি. এস. সি. প্রথমবর্ষ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুগঠনা, সূচীশিল্প ও গৃহকর্মে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই (অনধিক ২৮)। উভয় পাত্রীই নম্রস্বভাবা। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীডালিম কুমার নাথ, গ্রাঃ+পোঃ গোসাবা, ২৪ পরগণা।

৩৫। পাত্রী—(২০) (৫'-১") গ্রাজুয়েট, ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম, সঙ্গীত শিক্ষার্থিনী পূর্ব নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর, উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীমতী স্মৃতী চৌধুরী, ১/৯৬ মহাজাতিনগর, পোঃ বিরাটী, কলি-৫১।

শ্রীতাপসকুমার নাথ কর্তৃক ২৩/১এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২ হইতে